# অনুবর্ত্তন

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্রালয়
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

[illegible] ও দুখানা মুর্গীর ঠ্যাং সিদ্ধ খাওয়া শেষ করিয়া হাকিলেন—কেবলরাম!

বাবুর্চি কেবলরাম হিন্দু। সাহেবের কাছে অনেক দিন আছে, সেও কায়দাদুরস্ত ভাবে সাদা উর্দ্দি পরিয়া, মাথায় সাদা পাগড়ি বাঁধিয়া তৈরী—সাহেবের বাবুর্চিগিরি করে এবং স্কুলের সময়ে রেজিষ্ট্রি-খাতাপত্র এ ক্লাস হইতে ও ক্লাসে বহিয়া লইয়া যায়, জল তোলে, ছেলেদের জল দেয়—এজন্য স্কুল হইতেই সে বেতন পাইয়া থাকে, সাহেবের খানা পাকাইবার জন্য সে কেবল সাহেবের কাছে খোরাকী পায় মাত্র।

কেবলরাম শশব্যস্ত হইয়া বলিল—হুজুর!

—মেমসাহেব কাঁহা?

—এখনো আসতেছেন না কেন, অনেকক্ষণ তো গেছেন। আলেন বলে হুজুর—ধর্ম্মতলায় ওষুধ আনতে গেছেন—

কেবলরামের বাড়ী যশোর ও খুলনার সীমানায়।

—মেমসাহেবকো খানা টেবিলমে রাখ দো—আউর তুম্ চলা যাও ইউনিভার্সিটি, পিওন বুক্‌কা অন্দর দো লেফাফা হ্যায়—

—হুজুর, ইউনিভার্সিটী এখনো খোলেনি, এগারো বাজলে তবে বাবুরা আসবেন—মেমসাহেবের খানা দিয়ে তবে গেলি চলবে না হুজুর?

—বহুত আচ্ছা, চা দো—

সকালে ভাত খাওয়ার পর চা-পান ক্লার্কওয়েলের বহুদিনের অভ্যাস।

এই সময় উঁচু গোড়ালির জুতা ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে মিস্ সিবসন্ [illegible]কিল। কৃশাঙ্গী, লম্বা মুখে পুরু করিয়া পাউডার, ঠোঁটে লিপষ্টিক ঘষা, [illegible]ওব্যাগ ঝোলানো। বয়স কম হইলেও গালে ইতিমধ্যেই মেচেতা পড়িতেছে। মুখ ফিরাইয়া চোখ ঘুরাইয়া বলিল—ডিয়ারি, ইউ হ্যাভ্ ফিনিশ্‌ড্ অল্‌রেডি?

—ইয়েস্, ডু ইউ গবল্ আপ কুইক্‌লি, ফার্ষ্ট বেল্ ইজ্ গন্, ইউ আর রাদার লেট্ ফর্ মিল্—

সরু গলায় গানের সুরে কথা বলিয়া মেমসাহেব পাশের ঘরে ঢুকিল।

ক্লার্কওয়েল উঠিয়া দাঁড়াইলেন, স্কুলের পোষাক পরিয়াই তিনি খানার টেবিলে বসিয়াছিলেন, বাহিরে চাহিয়া পর্দ্দার ফাঁক দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন ক্লাসরুমে ছেলে আসিয়াছে কি না। ঢং ঢং করিয়া স্কুল বসিবার ঘণ্টা পড়িল। ক্লার্কওয়েল শশব্যস্ত হইয়া ঘরের বাহির হইয়া নীচের গাড়ী-বারান্দায় স্কুলের ছেলেদের সমবেত প্রার্থনায় যোগ দিতে নামিয়া গেলেন।

ক্লার্কওয়েল দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ জাঁহাবাজ হেড্ মাষ্টার। ছাত্র ও মাষ্টারেরা সমান ভাবে ভয়ে কাঁপে তাঁর দাপটে—পুরো অটোক্র্যাট, কথা বলিলে নড়চড় হইবার যো নাই—হুকুমের বিরুদ্ধে কমিটিতে আপিল নাই, কমিটির মেম্বারেরা সবাই বাঙালী, সাহেবকে খাতির করিয়া চলা তাহাদের বহুদিনের অভ্যাস—স্কুলের মাষ্টারদের ডিক্রি-ডিস্‌মিসের একমাত্র মালিক তিনিই।

সুতরাং আশ্চর্য্য না যে, তাঁহার সিঁড়ি দিয়া দুপ্ দুপ্ করিয়া নামিবার সময় দু-একজন মাষ্টার, যাঁহারা হেড মাষ্টারের অলক্ষ্যে তাড়াতাড়ি হাজিরা-বই সই করিতে দোতালায় আপিস ঘরে যাইতেছিলেন, তাঁহারা একটু সঙ্কুচিত সুরে 'গুড্ মর্ণিং স্যার' বলিয়া এক পাশে রেলিং ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া হেড্ মাষ্টারকে নামিবার পথ বাধামুক্ত করিয়া দিলেন—যদিও তাহা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক ; কারণ, চওড়া সিঁড়ি উভয় পক্ষের নামিবার ও উঠিবার পক্ষে যথেষ্ট প্রশস্ত। ইহা বিনয়ের একপ্রকার রূপ, প্রয়োজনের কার্য্য নহে।

ক্লাস বসিয়া গেল। ক্লার্কওয়েল হাজিরা-বই খুলিয়া দেখিয়া হাঁকিলেন—মিঃ আলম—

সফরুদ্দিন আলম এম-এ স্কুলের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হেড মাষ্টার। বয়সে মধ্যে, আইন পাশ করিয়া আজ বছর চার পাঁচ মাষ্টারি করিতেছে, ধূর্ত্ত চোখ, চটপটে ধরণের চালচলন—লোক ভাল নয়। হেড্ মাষ্টারের দক্ষিণহস্তস্বরূপ, মাষ্টারেরা ভয় করিয়া চলে, ভালবাসে না।

আলম বলিল—ইয়েস্ স্যার—

আজ প্রেয়ারের সময় শ্রীশবাবু আর যদুবাবু অনুপস্থিত। ওদের ডাকাও—

—স্যার, যদুবাবু আর শ্রীশবাবুকে বলে বলে পারলাম না, রোজ লেট্ স্যার, আপনি একটু বলে দিন ওদের।

লাগাইতে ভাঙাইতে আলমের জুড়ি নাই বলিয়া মাষ্টারের দল তাহাকে বিশেষ সমীহ করিয়া চলে।

আলম মাষ্টারদের ঘরে গিয়া সুমিষ্ট স্বরে বলিল—যদুবাবু, শ্রীশবাবু—হেড্ মাষ্টার আপনাদের স্মরণ করেছেন—শরৎবাবু কোথায়?

যদুবাবু বয়সে প্রবীণ, চালচলন ক্ষিপ্রতাবর্জ্জিত, রোগা, মাথার চুল কাঁচা পাকায় মিশানো। তিনি ধীরে ধীরে টানিয়া টানিয়া বলিলেন—কেন আমায় অসময়ে স্মরণ—

—আপনি প্রেয়ারের সময় কোথায় ছিলেন?

—আসতে দেরি হয়ে গিয়েছিল—কেন?

—হেড্ মাষ্টার নোট্ করেছেন—

যদুবাবু উষ্মা সহকারে বলিলেন—ওঃ, তবেই আমার সব হোল! নোট্ করেছেন তো ভারিই করেছেন। গেরস্থ মানুষ, ঘড়ির কাঁটা ধরে আসা সব সময় চলে না।

মিঃ আলম চুপ করিয়া রহিল।

টিফিনের পর যদুবাবুর পুনরায় ডাক পড়িল আপিসে। ক্লার্কওয়েল বলিলেন—ওয়েল, যদুবাবু, আমার স্কুলে শুনলাম আপনার অসুবিধে হচ্ছে?

যদুবাবু আমতা আমতা করিয়া বলিলেন—কেন স্যার?

বুঝিলেন, আলমের কাছে ও-বেলা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সাহেবের কানে উঠিয়াছে।

—আপনার রোজ লেট্ হচ্ছে স্কুলে, অথচ ঘরের কাজ ঠিকমত করতে পারেন না শুনলাম—

—ঘরের কাজ? না স্যার, ঘরের কাজ ঠিক—তার জন্যে কি—

ক্লার্কওয়েল সাহেব বলিলেন—বসুন ওখানে। এখন কোন ক্লাস আছে?

—আজ্ঞে, থার্ড ক্লাসে হিষ্ট্রির ঘণ্টা—

—আচ্ছা, যাবেন এখন। আপনি আজ প্রেয়ারের সময় ছিলেন না, রোজই থাকেন না।

আমি কেন স্যার, শ্রীশ থাকে না, হীরেনবাবু থাকে না, ক্ষেত্রবাবু থাকে না।

—আমি জানি কে কে থাকে না। আপনার বলার আবশ্যক নেই। আপনি ছিলেন না কেন? লেট্ করেন কেন রোজ?

—খেতে একটু দেরী হয়ে যায় স্যার।

—বেশ, মাই গেট্ ইজ্ ওপ্ন্। আপনার অসুবিধে হোলে আপনি চলে যেতে পারেন।

যদুবাবু নিরুত্তর রহিলেন। সাহেবের আড়ালে যাহাই বলুন, সাম্‌নাসামনি কিছু বলিবার সাহস তাঁহার নাই। অন্ততঃ এতদিন কেহ দেখে নাই।

—আচ্ছা, যান ক্লাসে। কাল থেকে আমার আপিসে এসে সই করবেন আগে।

যদুবাবু ক্লাসের ঘণ্টা পড়িলে আপিসে আসিয়াই ক্ষেত্রবাবুকে সামনে দেখিতে পাইলেন। তখনও অন্য কোন শিক্ষক আপিস-ঘরে আসেন নাই।

ক্ষেত্রবাবু স্বর নীচু করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তলব হয়েছিল কেন?

যদুবাবু বলিলেন—ওঃ, অত আস্তে কথা কিসের? বলবো সোজা কথা, তার আবার অত ঢাক ঢাক গুড়গুড়—

হঠাৎ যদুবাবুকে বাক্‌শক্তিরহিত হইতে দেখিয়া ক্ষেত্রবাবু সবিস্ময়ে পিছন ফিরিয়া চাহিতেই একেবারে এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হেড্ মাষ্টার মিঃ আলমের সহিত চোখাচোখি হইয়া গেল।

আলম বলিল—ক্ষেত্রবাবু, ফোর্থ ক্লাসে একজামিনের পড়া দেখিয়ে দিয়েছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—যদুবাবু?

—কাল দেবো।

—কেন, আজই দিন না।

—কাল দিলে ক্ষতি কিছু নেই।

অল্পক্ষণ পরে হেড্ মাষ্টারের আপিসে যদুবাবুর আবার ডাক পড়িল।

হেড্ মাষ্টার বলিলেন—যদুবাবু, আপনি ফোর্থ ক্লাসে কি পড়ান?

—হিষ্ট্রি, স্যার—

—ওদের উইকৃলি পরীক্ষা হবে এই শনিবার, পড়া দেখিয়ে দিয়েছেন?

—না স্যার—কাল দেবো।

—ওরা ক'দিন সময় পাবে তৈরী হতে, তা ভেবে দেখলেন না। ছেলেদের কাজ যদি না হয়, তেমন মাষ্টার এ স্কুলে রাখাও যা, না রাখাও তাই। মাই ডোর ইজ্ ওপ্ন্—আপনার না পোষায়, আপনি চলে গেলে কেউ বাধা দেবে না।

যদুবাবু বিনীতভাবে জানাইলেন, তিনি এখনই ক্লাসে গিয়া পড়া বলিয়া দিতেছেন।

—তাই যান। পড়া দিয়ে এসে আমাকে রিপোর্ট করবেন।

—যে আজ্ঞে স্যার।

আপিসে আসিয়া যদুবাবু লম্ফঝম্ফ আরম্ভ করিলেন। অন্য কেহ সেখানে ছিল না, শুধু হেড্ পণ্ডিত ও ক্ষেত্রবাবু।

—ওই আলম, ওটা একেবারে অন্ত্যজ—লাগিয়েছে গিয়ে অমনি হেড্ মাষ্টারের কাছে। কথা পড়তে না পড়তে লাগাবে—কথা পড়তে না পড়তে লাগাবে—এমন করলে তো এ স্কুলে থাকা চলে না দেখছি! বল্লাম যে ফোর্থ ক্লাসের একজামিনের পড়া দিচ্ছি দেখিয়ে—তা না, অমনি লাগানো হয়েছে। এরকম করলে কি মানুষ টেঁকে মশাই?

বলা বাহুল্য, যদুবাবু জানিতেন, এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হেড্মাষ্টার এ ঘণ্টায় নীচের হলে এ্যাডিসনাল হিষ্ট্রির ক্লাস লইতেছেন।

ক্ষেত্রবাবু নীরব সহানুভূতি জানাইয়া চুপ করিয়া থাকাই নিরাপদ মনে করিলেন। তিনি ছাপোষা মানুষ, আজ সতেরো বছর ত্রিশ টাকা বেতনে এই

স্কুলে চাকুরী করিতেছেন। বেলেঘাটা অঞ্চলে একটিমাত্র ঘর ভাড়া লইয়া আছেন, সকালে ও সন্ধ্যায় সামান্য একটু হোমিওপ্যাথি করিয়া আর কিছু উপার্জ্জন করেন। চাকুরীটুকু গেলে এ বাজারে পথে বসিতে হইবে।

হেড্‌পণ্ডিত মশায় বৃদ্ধ লোক, তিনি ক্লার্কওয়েল সাহেবের পূর্ব্ব হইতে এ স্কুলে আছেন—তিনি আর নারাণবাবু। অনেক মাষ্টার আসিল, চলিয়া গেল, তিনি ঠিক আছেন। মেজাজ দেখাইতে গেলে চাকুরী করা চলে না। তবে তিনি ইহাও জানেন, লম্ফঝম্প করা যদুবাবুর স্বভাব, শেষ পর্য্যন্ত কোনো দিক্ হইতেই কিছু দাঁড়াইবে না।

এই সময় নারাণবাবু ঘরে ঢুকিলেন। তিনিও বৃদ্ধ, এই স্কুলেরই একটি ঘরে থাকেন—নিজে রান্না করিয়া খান। আজ পঁয়ত্রিশ বছর এ স্কুলে আছেন এবং এই ভাবেই আছেন। বৃদ্ধের নিকট কেহ কখনও তাঁহার কোনো আত্মীয়স্বজনকে আসিতে দেখে নাই। রোগা, বেঁটে চেহারার মানুষটি পাকশিটে গড়ন গায়ে আধময়লা পাঞ্জাবি, ততোধিক ময়লা ধুতি, পায়ে চটি জুতা।

নারাণবাবু পকেট হইতে একটি টিনের কৌটা বাহির করিয়া একটি বিড়ি ধরাইলেন।

ক্ষেত্রবাবু হাত বাড়াইয়া বলিলেন—দিন একটা, কাঠিটা ফেলবেন না—

নারাণবাবু বলিলেন—কি হয়েছে, আজ যদুবাবুকে হেড্ মাষ্টার ডাকিয়েছে কেন?

যদুবাবু চড়াগলায় মেজাজ দেখানোর সুরে বলিতে আরম্ভ করিলেন—সেই কথাই তো বলছি! শুধু শুধু ওই অন্ত্যজটা আমায় ডেকে নিয়ে গিয়ে—

নারাণবাবু বলিলেন—আস্তে, আস্তে—

যদুবাবু গলা আরও এক পর্দ্দা চড়াইয়া বলিলেন—কেন, কিসের ভয়? যদু মুখুয্যে ওসব গ্রাহ্যি করে না। অনেক আলম দেখে এসেছি, থার্ড ক্লাস এম-এ—তার আবার প্রতাপটা কিসের হ্যা? কেবল লাগানো ভাঙানো সব সময়! অত লাগানোর ধার ধারে কে? উনি ভাবেন, সবাই ওঁকে ভয় করে চলবে—যে চলে, সে চলুক, যদু মুখুয্যে সেরকম বংশের—

বাহিরে বুট জুতার শব্দ শোনা গেল—মিঃ আলমের পায়ে বুট আছে সবাই জানে—যদুবাবু হঠাৎ থামিয়া গেলেন। ক্ষেত্রবাবু বলিয়া উঠিলেন—যাই, খড়িটা দিন নারাণবাবু দয়া করে, ক্লাস আছে—

নারাণবাবু বলিলেন—চলো, আমিও যাই—ওরে কেবলরাম, ইণ্ডিয়ার বড় ম্যাপখানা দে তো—

কিন্তু দেখা গেল, যে ঘরে ঢুকিল, সে মিঃ আলম নয়, বইয়ের দোকানের একজন ক্যানভাসার, এক হাতে ব্যাগ ঝোলানো, অন্য হাতে কিছু নতুন স্কুল-পাঠ্য বই। ক্যানভাসারের সুপরিচিত মূর্ত্তি। ক্যানভাসারের প্রশ্নের উত্তরে তাহাকে হেড্ মাষ্টারের আপিস দেখাইয়া দিয়া যদুবাবু পুনরায় সুরু করিলেন—হ্যাঁ, আমি যা বলব এক কথা। কাউকে ভয় করে না এই যদু মুখুয্যে। বলি বাবা, এ স্কুল গড়ে তুলেছে কে? অই নারাণ বাঁড়ুয্যে আর হেড্ পণ্ডিত। সাহেব এলো তো কাল, উড়ে এসে জুড়ে বসেছে—আর ওই অন্ত্যজ—

মিঃ আলমের প্রবেশটা একটু অপ্রত্যাশিত ধরণে ঘটিল।

যদুবাবু হঠাৎ ঢোক গিলিয়া চুপ করিয়া গেলেন।

মিঃ আলমের ব্যবহার অত্যন্ত ভদ্র ও সংযত। মুখের উপর কেহ গালাগালি দিলেও মিঃ আলমের কথাবার্ত্তা বা ব্যবহারে কখনো রাগ প্রকাশ পায় না। আলম বলিল—ক্ষেত্রবাবুর একটা দরখাস্ত দেখলাম হেড্ মাষ্টারের টেবিলে, কাল আসবেন না, কি কাজ?

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—আজ্ঞে, কাল আমার ভাগ্নীর বিয়ে—

—তা একদিন কেন, দুদিন ছুটি নিন না। আমি সাহেবকে বলে দেবো এখন।

ক্ষেত্রবাবু বিনয়ে গলিয়া গিয়া বলিলেন—যে আজ্ঞে। তাই দেবেন বলে—আমার সুবিধে হয় তা হোলে—থ্যাঙ্ক্‌স্—

—নো মেন্‌শন্—

ছুটির ঘণ্টা এইবার পড়িবে। শেষের ঘণ্টাটা কি কাটিতে চায়? ক্ষেত্রবাবু

ও যদুবাবু তিন বার ঘড়ি দেখিতে পাঠাইলেন। চারিটা বাজিতে পনেরো মিনিট, আট মিনিট,—এখনও চার মিনিট।

স্কুলঘরের নীচের তলায় একটা অন্ধকূপ ঘরে থার্ড পণ্ডিত জগদীশ ভট্‌চাজ জ্যোতির্ব্বিনোদ মশায় আছেন। বাড়ী পূর্ব্ববঙ্গে, দশ বৎসর এই স্কুলে আছেন, কুড়ি টাকায় ঢুকিয়াছিলেন, এখনও তাই—গত দশ বৎসরে এক পয়সাও মাহিনা বাড়ে নাই। অবশ্য অনেক মাষ্টারেরই বাড়ে নাই—হেড্ মাষ্টার ও এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হেড্ মাষ্টার ছাড়া। হেড্ মাষ্টারের মাহিনা গত চারি বৎসরের মধ্যে দুই শত টাকা হইতে দুই শত পঁচাত্তর এবং মিঃ আলমের মাহিনা ষাট হইতে পঁচাশি উঠিয়াছে।

ভুলিয়া যাইতেছিলাম—মিস্ সিবসনের মাহিনা গত দুই বৎসরে এক শত হইতে দেড় শত দাঁড়াইয়াছে।

উপরের তিন জনের মাহিনা বছর বছর বাড়িয়া চলিয়াছে, অথচ নীচের দিকের শিক্ষকগণের বেতনের অঙ্ক গত দশ, পনেরো বিশ বৎসরেও দারুব্রহ্মবৎ অনড় ও অচল আছে কেন,—এ প্রশ্ন উত্থাপন করিবার সাহস পর্য্যন্ত কোনো হতভাগ্য শিক্ষকের নাই। সে কথা থাক্।

জগদীশ জ্যোতির্ব্বিনোদ সিক্‌স্‌থ ক্লাসে বাংলা পড়াইতেছিলেন—তিনি শেষ ঘণ্টার দীর্ঘতায় আতঙ্ক হইয়া একটি ছেলেকে ঘড়ি দেখিতে পাঠাইলেন। আপিসঘরে ঘড়ি, সিঁড়ির মুখে দাঁড়াইয়া ঘাড় বাড়াইয়া চালাক ছেলেরা ঘড়ি দেখিয়া ফিরিয়া আসে—যাহাতে হেড মাষ্টারের চোখে না পড়িতে হয়—কিন্তু ভাঙ্গা-পা খানায় পড়ে, জগদীশ জ্যোতির্ব্বিনোদের প্রেরিত হতভাগ্য ছাত্রটি একেবারে হেড্ মাষ্টারের সামনে পড়িয়া গেল—ঘড়ি দেখিতে চেষ্টা করিবার অবস্থায়।

ক্লার্কওয়েল ভীমগর্জ্জনে হাঁকিলেন—হোয়াট ইউ আর ট্রাইং টু লুক অ্যাট্? ইউ! কাম্ আপ্—

ছোট ছেলে, কাঁপিতে কাঁপিতে আপিসঘরে ঢুকিল। সেখানে মিঃ আলম বসিয়াছিল। আলম জিজ্ঞাসা করিল…কি করছিলে নন্দ?

—ঘড়ি দেখছিলাম স্যার—

—কেন? ক্লাসে কেউ নেই?

—আজ্ঞে থার্ড পণ্ডিতমশাই আছেন। তিনি ঘাড় দেখতে পাঠিয়ে দিলেন।

—আলম ও হেড্ মাষ্টার পরস্পরের দিকে চাহিলেন।

—আচ্ছা, যাও তুমি—

মিঃ আলম বলিলেন—চলবে না স্যার। কতকগুলো টিচার আছে, একেবারে অকর্ম্মণ্য—শুধু ঘড়ি দেখতে পাঠাবে ছেলেদের। কাজে মন নেই এই থার্ড পণ্ডিত একজন, যদুবাবু, হীরেনবাবু, আর শরৎবাবু—আর ওই হেড্ পণ্ডিত—

—একটা নোটিশ্ লিখে দিন মিঃ আলম, স্কুল ছুটির পরে মাষ্টারেরা সব আমার সঙ্গে দেখা না করে না যায়। ঘণ্টা দিতে বারণ করে দিন—নোটিশ্ ঘুরে আসুক—

মিঃ আলম হাঁকিল—কেবলরাম, ঘণ্টা দিও না—

একে ঘণ্টা কাটে না, তাহার উপর ক্লাসে ক্লাসে হেড্ মাষ্টারের নোটিশ্ গেল—ছুটির পর কোনো মাষ্টার চলিয়া যাইতে পারিবে না—হেড্ মাষ্টার তাঁহাদের স্মরণ করিয়াছেন।

হেড্ মাষ্টারের আপিসঘরে একে একে যদুবাবু, শরৎবাবু, নারাণবাবু প্রভৃতি আসিয়া জুটিলেন। জ্যোতির্ব্বিনোদ মশায় সকলের শেষে কম্পিত দুরু দুরু বক্ষে প্রবেশ করিলেন; কারণ, তিনি সেই ছেলেটির মুখে শুনিয়াছেন সব কথা। তাঁহার জন্যই যে এই বিচার সভার আয়োজন, তাহা তাঁহার বুঝিতে বাকী নাই।

হেড্ মাষ্টার বলিলেন—ইজ্ এভ্রিবডি হিয়ার?

মিঃ আলম উত্তর দিলেন—ক্ষেত্রবাবু আর হেড্ পণ্ডিতকে দেখছি নে।

নারাণবাবু বলিলেন—ক্লাসে রয়েছেন, আসছেন।

কথা শেষ হইতেই তাঁহারাও ঢুকিলেন।

—এই যে আসুন—আপনাদের জন্যে সাহেব অপেক্ষা করছেন।

ক্লার্কওয়েল শিক্ষকদের সভায় অতি তুচ্ছ কথা বলিবার সময়ও জজ সাহেবের মত গাম্ভীর্য্য ও আড়ম্বর প্রদর্শন করিয়া থাকেন, বজেট সভায় বজেট

পেশ করিবার সময় অর্থসচিব যত না বাগ্মিতা দেখান, তদপেক্ষা বাগ্মিতা দেখাইয়া থাকেন। তিনি বর্ত্তমানে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া টাই ধরিয়া কখনও দক্ষিণে কখনও বামে হেলিয়া গম্ভীর স্বরে আরম্ভ করিলেন—টিচার্স, আজ আপনাদের ডেকেছি কেন, এখনি বুঝবেন। আমরা এখানে কতকগুলি তরুণ আত্মার উন্নতির জন্যে দায়ী (বড় বড় কথা বলিতে ক্লার্কওয়েল সাহেব খুব ভালবাসেন), আমরা শুধু মাহিনা নিয়ে ছেলেদের ইংরাজি শেখাতে আসিনি, আমরা এসেছি দেশের ভবিষ্যৎ আশার স্থল বালকদের সত্যিকার মানুষ করে তুলতে। আমরা তাদের সময়নিষ্ঠা শেখাবো, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা শেখাবো—তবে তারা ভবিষ্যতে নাগরিক হয়ে দেশের বড় বড় কার্য্যভার হাতে নিয়ে নিজেদের জীবন সার্থক করে তুলতে পারবে, সেই সঙ্গে দেশেরও শ্রীবৃদ্ধি হবে।

দু-একজন শিক্ষক বলিলেন—ঠিক কথা, ঠিক কথা।

—এখন দেখুন, যদি আমরাই তাদের সময়নিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যানুরাগ না শিখিয়ে ফাঁকি দিতে শেখাই, যদি আমরা নিজেরা নিজেদের কর্ত্তব্য কাজে অবহেলা করি, তবে সে যে কত বড় অপরাধ, তা ধারণা করবার ক্ষমতা আমাদের মধ্যে অনেকের নেই দেখা যাচ্ছে। শিক্ষকতা শুধু পেটের ভাতের জন্যে চাকরী করা নয়, শিক্ষকতা একটা গুরুতর দায়িত্ব, এই জ্ঞান যাদের না থাকে, তারা শিক্ষক, এই মহৎ নামের উপযুক্ত নয়।

দু-চারজন শিক্ষক মুখ চাওয়াচাওয়ি করিলেন।

—আমি জানি, এখানে এমন শিক্ষক আছেন, যাঁদের মন নেই তাঁদের কাজে। তাঁদের প্রতি আমার বলবার একটিমাত্র কথা আছে। মাই গেট্ ইজ্ ওপ্‌ন্—তাঁরা দিব্যি তার মধ্যে দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে চলে যেতে পারেন, কেউ তাঁদের বাধা দেবে না।

হেড্ মাষ্টার কট্‌মট্ করিয়া যদুবাবু, থার্ড পণ্ডিত ও হেড্ পণ্ডিতের দিকে চাহিলেন।

—আজকার ঘটনাই বলি। আপনাদের মধ্যে কোন একজন শিক্ষক আজ আপিসে ঘড়ি দেখতে পাঠিয়েছিলেন একটি ছেলেকে। তিনি যে কতবড়

গুরুতর অন্যায় করেছেন, তা তিনি বুঝতে পারছেন না। এতে প্রমাণ হোল যে, কর্ত্তব্য কাজে তাঁর মন নেই, কখন ঘণ্টা শেষ হবে, সে জন্য তাঁর মন উস্‌খুস্‌ করছে—তাঁর দ্বারা সুচারুরূপে শিক্ষকের কর্ত্তব্য কখনই সম্পন্ন হতে পারে না। সুকুমারমতি বালকদের সামনে তিনি কি আদর্শ দাঁড় করাবেন? কাজে ফাঁকি দেবার আদর্শ, কর্ত্তব্যে অবহেলার আদর্শ—কি বলেন আপনারা?

সকলেই মাথা এক পাশে হেলাইয়া বলিলেন—ঠিক কথা।

এখন আমি আপনাদের একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। সে শিক্ষকের প্রতি আর ভাল ব্যবহার করা চলে কি? তাঁর দ্বারা এ স্কুলের কাজ চলে কি? বলুন আপনারা। আমি মিঃ আলমকে এই প্রশ্ন করছি। মিঃ আলম একজন কর্ত্তব্যপরায়ণ শিক্ষক বলে আমি জানি। আর একজন ভাল শিক্ষক আছেন, নারাণবাবু, তাঁর প্রতিও আমি এই প্রশ্ন কর্‌ছি।

ক্ষেত্রবাবু, যদুবাবু ও থার্ড পণ্ডিত তিন জনেরই মুখ শুকাইল। তিন জনেই ঘড়ি দেখিতে পাঠাইয়াছিলেন, তিন জনের প্রত্যেকেই ভাবিলেন তাঁহার উদ্দেশেই হেড্‌ মাষ্টারের এই বক্তৃতা।

নারাণবাবু দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—একটা কথা আছে আমার স্যার!

—কি বলুন!

—এবার তাঁকে ক্ষমা করুন, তিনি যেই হোন, আমার নাম জানবার দরকার নেই, এবার তাঁকে ক্ষমা করুন। ওয়ার্ণিং দিয়ে ছেড়ে দিন স্যার!

হেড্‌ মাষ্টারের কণ্ঠস্বর ফাঁসির হুকুম দিবার প্রাক্‌কালে দায়রাজজের মত গম্ভীর হইয়া উঠিল।

—না, নারাণবাবু—তা হয় না। আমি নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করতে পারবো না—আমি এই ইন্‌ষ্টিটিউশনের হেড্‌ মাষ্টার, আমার ডিউটি একটা আছে তো? আমি চোখ বুজে থাকতে পারিনে। আমার কর্ত্তব্য এখানে সুস্পষ্ট, হয় তো তা কঠোর, কিন্তু তা করতে হবে আমায়। আমি সেই টিচারকে সাস্‌পেণ্ড করলাম—

হঠাৎ যদুবাবু দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—স্যার, আমি ঘড়ি দেখতে

কোনো দিন পাঠাইনি—আজ পাঠিয়েছিলাম, তার একটা কারণ ছিল স্যার—আমার স্ত্রী অসুস্থ, ডাক্তার আসবে চারটের পরেই—তাই—এ বারটা আমায়—

তিনি এতক্ষণ বসিয়া বসিয়া এই কৈফিয়ৎটি তৈরী করিতেছিলেন, তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁহারই উদ্দেশে হেড্ মাষ্টার এতক্ষণ ধরিয়া বাক্যবাণ বর্ষণ করিলেন। বলা বাহুল্য, কৈফিয়ৎটির মধ্যে সত্যের বালাই ছিল না।

হেড্ মাষ্টারের চোখ কৌতুকে নাচিয়া উঠিল। তাহার একটা কারণ, যদুবাবু কোন দিনই বাগ্মী নহেন, বর্ত্তমানে ভয় পাইয়া যে কথাগুলি বলিলেন, সেগুলির ইংরাজি বারো আনা ভুল। অথচ যদুবাবু ব্যাকরণ পড়ান ক্লাসে, ইংরাজির কি কি ভুল হইল তিনি নিজেও তাহা বলিবার পরক্ষণেই বুঝিয়া লজ্জিত হইয়াছেন—কিন্তু বলিবার সময় কেমন হইয়া যায় সাহেবের সামনে—!

হেড্ মাষ্টার বলিলেন—আপনি প্রায়ই ও রকম করে থাকেন কি না, সে সব এখানে বিচার্য্য বিষয় নয়। আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা একবারও আমি ক্ষমা করিতে পারিনে—

নারাণবাবু উঠিয়া বলিলেন—এবার আমাদের অনুরোধটা রাখুন স্যার—

—আচ্ছা, আমি একজনের সম্বন্ধে সে অনুরোধ মানলাম। কারণ, তাঁর বাড়ীতে গুরুতর পারিবারিক কারণ আছে তিনি বলছেন। একজন শিক্ষক মিথ্যে কথা বলছেন, এরকম ধরে নেওয়ার কোন কারণ নেই। কিন্তু আমি থার্ড পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করি, তাঁর কি কারণ ছিল ঘন ঘন ঘড়ি দেখবার? তিনি স্কুলেই থাকেন। তাঁর কোনো তাড়াতাড়ি দেখি না। তাঁকে ক্ষমা করতে পারি না, তাঁকে আমি সাস্পেণ্ড করলাম।

থার্ড পণ্ডিত এবার দাঁড়াইয়া কাঁদো কাঁদো সুরে বাংলায় বলিলেন, ( তিনি ইংরাজি জানেন না ), সাহেব, এবার আমায় ক্ষমা করুন, আমি এমন আর কখনও করবো না।

ক্ষেত্রবাবু ভাবিলেন, খুব বাঁচিয়া গিয়াছি এ যাত্রা! আমিও যে ঘড়ি দেখতে পাঠাই, সেটা কেহ জানে না।

হেড মাষ্টার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—আমার হুকুম নড়ে না। ছেলেদের

প্রতি কর্ত্তব্যপালন আগে করতে হবে, তার পর ব্যক্তিগত দয়া দাক্ষিণ্য। সামনের বুধবারে স্কুলকমিটির মিটিং আছে, সেখানে আমি আপনার কথা ওঠাবো। কমিটির অনুমতি নিয়ে আপনার শাস্তির ব্যবস্থা হবে। আপনি কাল থেকে আর ক্লাসে যাবেন না। কত দিন আপনাকে সাস্‌পেণ্ড করা হবে, সেটা কমিটি ঠিক করবেন।

সভা ভঙ্গ হইল। হেড্ মাষ্টার গট্ গট্ করিয়া আপিস ছাড়িয়া নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। মাষ্টারেরাও একে একে সরিয়া পড়িলেন—তাঁহারা যদি কিছু বলেন, ফুটপাথে গিয়া বলিবেন।

সন্ধ্যার সময় ক্লার্কওয়েল সাহেব মোটরে খয়রাগড়ের রাজকুমারকে পড়াইতে চলিয়া গেলেন ল্যান্সডাউন রোডে। মোটা টাকার টুইশানি, তারাই মোটর পাঠাইয়া লইয়া যায়। সাহেব বাহির হইয়া যাইবার পরে মিস্ সিবসন্ ঘরে বসিয়া সেলাই করিতেছে, এমন সময় দরজার বাহিরে খুস্ খুস্ শব্দ শুনিয়া বলিল—হু? কোন্ হ্যায়?

বিনম্র সঙ্কোচে পর্দ্দা সরাইয়া থার্ড পণ্ডিত একটুখানি মুখ বাহির করিয়া উঁকি মারিয়া বলিলেন—আমি মেমসাহেব।

—ও পাণ্ডিট্, কাম্ ইন্—হোয়াট্'স্ হোয়াট্?

থার্ড পণ্ডিত হাত জোড় করিয়া কাঁদো কাঁদো স্বরে বলিলেন—সাহেব আমাকে সাস্‌পেণ্ড করেছেন।

—বেগ ইওর পার্ডন—

থার্ড পণ্ডিত 'সাস্‌পেণ্ড' কথাটার উপর জোর দিয়া কথা বলিয়া নিজের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিলেন—মি, হাম—

মিস্ সিবসন্ আস্‌লি বিলাতি, নানা দুর্ভাগ্যের মধ্যে পড়িয়া ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুলে চাকুরী লইতে বাধ্য হইয়াছে। বুদ্ধিমতী মেয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়া হাসিয়া বলিল, ওয়েল?

—ইউ মাদার—আই সন্—সাহেবকে বলুন মা—

—ইয়েস, আই প্রমিস্ টু—

হাঁ মা, বুড়ো হয়েছি—ওল্ড্ ম্যান (থার্ড পণ্ডিত নিজের মাথায় সাদা

চুলে হাত দিয়া দেখাইলেন )—না খেয়ে মরে যাবো—( মুখের কাছে হাত লইয়া গিয়া খাওয়ার অভিনয় করিয়া হাত নাড়িয়া না-খাওয়ার অভিনয় করিলেন ) ইটু নট—

মেমসাহেব হাসিয়া বলিলেন—আই আণ্ডারষ্ট্যাণ্ড পাণ্ডিট্—

—নমস্কার মাদার—

থার্ড পণ্ডিত চলিয়া আসিলেন।

যদুবাবু ছুটি হইলে মলঙ্গা লেনের ছোট বাসাটায় ফিরিয়া গেলেন। দশ টাকা মাসিক ভাড়ায় একখানি মাত্র ঘর দোতালায়—এক বাড়ীতে আরও তিনটি পরিবারের সঙ্গে বাস। যদুবাবুর স্ত্রী দুখানি রুটি ও একটু পেঁপের তরকারি আনিয়া সামনে ধরিলেন। যদুবাবু গোগ্রাসে সেগুলি গিলিয়া বলিলেন—আর একটু জল—

যদুবাবু নিঃসন্তান। ত্রিশ টাকা মাহিনায় ও দু একটি টুইশানির আয়ে স্বামী-স্ত্রীর কায়ক্লেশে চলিয়া যায়।

জলপান করিয়া যদুবাবু একটু সুস্থ হইয়া তামাক ধরাইলেন।

যদুবাবুর স্ত্রীর একসময়ে রূপসী বলিয়া খ্যাতি ছিল, এখন নানা দুঃখকষ্টে সে রূপের কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নাই তার—প্রায় সকল বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের মতই স্বামীর উপর তার টানটা বেশি। স্বামীর কাছে বসিয়া বলিল—তোমার বড় শালীর বাড়ী থেকে চিঠি এসেছে, ছেলের অন্নপ্রাশন, যাবে নাকি ?

এ যে একটু বক্রোক্তি, যদুবাবু সেটা বুঝিলেন। এটি যদুবাবুর স্ত্রীর বৈমাত্রেয় দিদি, সকলে বলে এই মেয়েটির রূপ দেখিয়া যদুবাবু নাকি একদিন মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাকে বিবাহ করিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ-পর্য্যন্ত ঘটে নাই। যদুবাবুর স্ত্রী খোঁচা দিতে ছাড়ে না এখনও।

—তুমি যাও, এখন মুর্শিদাবাদ যাই সে সময় কই ? ওরা নিতে আসবে ?

—তা জানিনে। তারা এখন বড়লোক, যদিই ধরো গরীব কুটুম্বুর অত তোয়াজ না করে। চিঠি একখানা দিয়েছে এই যথেষ্ট।

—তা হ'লে যাওয়া হবে না। ভাড়ার টাকা, তারপর ধরো নকুতো কিছু একটা দিতে হবে—সে হয় না।

—আমার কাছে কিছু আছে—তবে তুমি যদি না যাও, আমি যাবো না।

—আমি ছুটি পাবো না। আলম ব্যাটা বড্ড লাগাচ্ছে আমার নামে সাহেবের কাছে। আজ তো এক কাণ্ডতে বেধে গিয়েছিলাম আর কি, অতি কষ্টে সাম্‌লেছি। আমার হয় না। তুমি বরং যাও—

এমন সময়ে বাহির হইতে নারাণবাবুর গলা শোনা গেল—ও যদু, আছ নাকি?

—আসুন, আসুন—নারাণ দা—

নারাণবাবু ঘরে ঢুকিয়া যদুবাবুর স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—বৌঠাকরুণ, একটু চা খাওয়াতে পারো?

যদুবাবুর স্ত্রী ঘোমটার ফাঁকে যদুবাবুর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন—অর্থাৎ চা নাই, চিনি নাই, দুধ নাই। অর্থাৎ যদুবাবু বাড়ীতে চা খান না।

যদুবাবু বলিলেন—বসুন নারাণ দা, আমি একটু আসছি—

নারাণবাবু হাসিয়া বলিলেন—আসতে হবে না ভায়া—আমি সব এনেছি পকেটে এই যে, আমি খাই কি না, সব আমার মজুত আছে। তোমার এখানে আসবো বলে পকেটে করে নিয়েই এলাম—এই নাও বৌঠাকরুণ—

—তারপর দেখলেন তো কাণ্ডখানা?

—ও তো দেখেই আসছি। নতুন আর কি বল—

—আমায় কি রকম অপমানটা—

—আরে, তুমি যে ভায়া, গায়ে পেতে নিলে—ওটা আসলে থার্ড পণ্ডিতকে লক্ষ্য করে বলছিল সাহেব—

—না-না, আপনি জানেন না, আমাকেও বলছিল ওই সঙ্গে—

—কিছু না—তোমার হয়েছে—ঠাকুরঘরে কে? না, আমি তো কলা খাইনি—তুমি কেন বলতে গেলে ও কথা।

—যাক্, তা নিয়ে তর্ক করে কোনো লাভ নেই। ও যেতে দিন—

চা পান শেষ করিয়া দুজনেই উঠিলেন। টুইশানির সময় সমাগত।

যদুবাবু শাঁখারিটোলায় এক বাড়ীতে টুইশানিতে গেলেন। নীচের তলায় অন্ধকার ঘর, তিনটি ছেলে একসঙ্গে পড়ে, ভীষণ গরম ঘরের মধ্যে, কেমন একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ আসে পাশের সিউয়ার্ড ডিচ্‌ থেকে। দুটি ঘণ্টা তাহাদের পড়া বলিয়া ক্লাসের টাস্ক লিখাইয়া দিতে রাত আটটা বাজিল। আর একটা টুইশানি নিকটেই, যদু শ্রীমানীর লেনে। সেখানে একটি ছেলে—ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ে, বেশ একটু নির্ব্বোধ অথচ পড়াশুনায় মন খুব। এমন ধরণের ছেলেরাই প্রাইভেট টিউটরকে ভোগায় বেশি। এ ছেলেরা এই অঙ্ক কষাইয়া লয়, ওটার ভাবাংশ লিখাইয়া লয়—খাটাইয়া ফরমাস দিয়া যদুবাবুকে রীতিমত বিরক্ত করিয়া তোলে প্রতি দিন। ক্লার্কওয়েল সাহেবকে ফাঁকি দেওয়া চলে, কিন্তু প্রাইভেট টুইশানির ছাত্র বা ছাত্রের অভিভাবকদের ফাঁকি দেওয়া বড়ই কঠিন।

রাত পৌনে দশটার, সময় যদুবাবু উঠিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় ছেলেটি বলিল—একটু বাকি আছে স্যার! কাল ইংরাজি থেকে বাংলা রিট্রানশ্লেসন (বারো আনা শিক্ষক ও ছাত্র এই ভুল কথাটি ব্যবহার করে) রয়েছে, বলে দিয়ে যান—

যদুবাবুর মাথা তখন ঘুরিতেছে। তিনি বলিলেন—আজ না হয় থাক।

—না স্যার! বকুনি খেতে হবে, বলে দিয়ে যান।

—কই দেখি? এতটা। এ যে ঝাড়া আধ ঘণ্টা লাগবে—আচ্ছা, এসো তাড়াতাড়ি। আমি বলে যাই, তুমি লিখে নাও। নির্ব্বোধ ছাত্রকে লিখাইয়া দিতেও প্রায় আধ ঘণ্টা লাগিয়া গেল। রাত সাড়ে দশটার সময় ক্লান্ত, বিরক্ত যদুবাবু আসিয়া বাড়ী পৌঁছিলেন ও যা হয় দুটি মুখে দিয়াই শয্যা আশ্রয় করিলেন।

পরদিন স্কুলে ক্লার্কওয়েল সাহেব জ্যোতির্ব্বিনোদ মহাশয়কে ডাকাইয়া বলিলেন—পণ্ডিত, তুমি মেমসাহেবের কাছে কেন গিয়েছিলে, চাকুরী তোমার বজায় আছে আমার হুকুম, তা রদ হবে না।

জ্যোতির্ব্বিনোদ ইংরাজী বোঝেন না, কিন্তু আন্দাজ করিয়া লইলেন,

সাহেবকে মেমসাহেব কোন কথা বলিয়া থাকিবে, তাহার ফলেই এই ডাক। তিনি হাত জোড় করিয়া বলিলেন—সাহেব মা-বাপ, আপনি না রাখলে কে রাখবে? আমি এমন কাজ কখনো করবো না।

হেড্ মাষ্টারের মুখে ঈষৎ হাসির আভাস দেখিয়া জ্যোতির্ব্বিনোদের মনে আশ্বাস জাগিল।

সাহস পাইয়া তিনি হেড্ মাষ্টারের টেবিলের সামনে আগাইয়া গিয়া বলিলেন—এবার আমায় মাপ করুন—ব্রাহ্মণ—আমার অন্ন—

হেড্ মাষ্টার টেবিলের উপর কিল মারিয়া বলিলেন—ব্রাহ্মণ আমি মানি না। আমার কাছে হিন্দু মুসলমান সমান।

জ্যোতির্ব্বিনোদ চুপ করিয়া রহিলেন—ইংরাজি বুঝিয়াছিলেন বলিয়া নয়—টেবিলে কিল মারার দরুণ ভাবিলেন, সাহেব যে কারণেই হোক, চটিয়াছেন।

হেড্ মাষ্টার ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—ওয়েল?

জ্যোতির্ব্বিনোদ পুনরায় হাত জোড় করিয়া বলিলেন—আমায় মাপ করুন এবার।

—আচ্ছা, যাও এবার, ওরকম আর না হয়—তা হোলে মাপ হবে না।

জ্যোতির্ব্বিনোদ সাহেবকে নমস্কার করিয়া আপিস হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজে মিটিল না। স্কুল বসিবার পর মিঃ আলম সব শুনিয়া হেড্ মাষ্টারকে বুঝাইলেন, এ রকম করিলে এ স্কুলে ডিসিপ্লিন রাখা যাইবে না—মাষ্টারেরা স্বভাবতই ফাঁকিবাজ, আরও ফাঁকি দিবে। অতএব সার্কুলার বাহির করিয়া থার্ড পণ্ডিতকে মাপ করা হোক, কি জন্য সাস্পেণ্ড করা হইয়াছিল, তার কারণ এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্কতা অবলম্বন করিবার উপদেশ লিপিবদ্ধ করা থাক সার্কুলার-বহিতে। ইহাতে পণ্ডিত জব্দ হইয়া যাইবে।

হেড্ মাষ্টারের কর্ণদ্বয় মিঃ আলমের জিম্মায় থাকিত, সুতরাং সেই মর্ম্মেই সার্কুলার বাহির হইয়া গেল। অন্যান্য শিক্ষকেরা জ্যোতির্ব্বিনোদকে ভয়

দেখাইল, চাকুরী এবার থাকিল বটে, তবে বেশী দিনের জন্ত নয়, এই সার্কুলার, স্কুলের সেক্রেটারী বা কমিটির কোন মেম্বারের চোখে পড়িলেই চাকুরী যাইবে।

ক্ষেত্রবাবু পড়াইতেছেন, হেড্ মাষ্টার সেখানে গিয়া পিছনের বেঞ্চির একটা ছেলেকে হঠাৎ ডাক দিয়া বলিলেন—তুমি কি বুঝেছ বল।

সে কিছুই শোনে নাই—পাশের ছেলের সঙ্গে গল্পে মত্ত ছিল, তীক্ষ্ণদৃষ্টি ক্লার্কওয়েলের নজর এড়ানো সহজ কথা নয়।

হেড্ মাষ্টার ক্ষেত্রবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন—ডোণ্ট্ সিট্ অন ইওর চেয়ার লাইক এ বাহাতুর—ছেলেরা কিছু শুনছে না। উঠে উঠে দেখুন—কে কি করছে না করছে।

ক্ষেত্রবাবু ছেলেদের সামনে তিরস্কৃত হওয়ায় নিজেকে অপমানিত বিবেচনা করিলেন বটে, কিন্তু সাহেবের কাছে বিনীতকণ্ঠে অঙ্গীকার করিতে হইল যে, তিনি ভবিষ্যতে দাঁড়াইয়া ও ক্লাসে পায়চারী করিতে করিতে পড়াইবেন।

সাহেবের জের এখানেই মিটিবার কথা নয়। সে দিন স্কুলের ছুটির পর টিচারদের মিটিং আহুত হইল। সাহেবের উপদেশবাণী বর্ষিত হইল। ছেলেদের স্বার্থ বজায় রাখিয়া যিনি টিকিতে পারিবেন, এ-স্কুলে তাঁহারই শিক্ষকতা করা চলিবে—যাঁহার না পোষাইবে, তিনি চলিয়া যাইতে পারেন। —স্কুলের গেট খোলা আছে।

বেলা সাড়ে পাঁচটায় হেড্ মাষ্টারের সভা ভাঙ্গিল। মাষ্টারেরা বাহিরে আসিয়া নানাপ্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, যতুবাবু লম্ফঝম্প শুরু করিলেন।

—রোজ রোজ এই বাজে হাঙ্গামা আর সহ্য হয় না—সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল—টিউশানিতে যাবার আগে আর বাসায় যাওয়া হবে না দেখ্ছি, কবে যে আপদ্ কাটবে, নারায়ণের কাছে তুলসী দিই। আপনারা সব চুপ করে থাকেন, বলেনও না তো কোন কথা। সবাই মিলে বল্লে কি সাহেবের বাবার সাধ্যি হয় এমন করবার ?

অন্য ত্ব-একজন বলিলেন—তা আপনিও তো কিছু বল্লেন না যতুদা।

—আমি বলবো কি এম্‌নি বলবো? আমি যে দিন বলবো, সে দিন সাহেবকে ঠ্যালা বুঝিয়ে দেবো—আর ঠ্যালা বুঝিয়ে দেবো ওই অন্ত্যজটাকে —ওই কুপরামর্শ দেয়—আর সাহেবের মতে ওর মত আইডিয়াল টিচার আর হবে না। মারো খ্যাংরা—

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, সে তো বোঝাই যাচ্ছে—কিন্তু ওকে নড়ানো সোজা কথা নয়। সাহেব ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ—আর সবাই খারাপ, কেবল আগম ভাল—

হেড্ পণ্ডিত বৃদ্ধ লোক, স্মৃতিভ্রংশ ঘটায় অনেক সময় অনেকের নাম মনে করিতে পারিতেন না—আর ভাল ওই মেমসাহেব—কি ওর যেন নামটা?

—মিস্ সিবসন্—

—হ্যাঁ—ও খুব ভাল—

মাষ্টারেরা বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া পড়িলেন। ক্ষেত্রবাবু, যদুবাবু, নারায়ণবাবু ও ফণীবাবু প্রতি দিন ছুটির পরে নিকটবর্ত্তী ছোট চায়ের দোকানে চা খাইতেন—বহুদিনের যাতায়াতের ফলে পিটার লেনের মোড়ের এই চায়ের দোকানটির সঙ্গে তাঁহাদের অনেকের অনেক স্মৃতি জড়াইয়া গিয়াছে। নিকট দিয়া যাইবার সময় কেমন যেন মায়া হয়।

ক্ষেত্রবাবুর মনে পড়ে তাঁর চার বছরের ছেলেটির কথা। সে বার একুশদিন ভুগিয়া টাইফয়েড রোগে মারা গেল। কত কষ্ট ভোগ, কত চোখের জল ফেলা, কত বিনিদ্র রজনী যাপন। এই চায়ের দোকানে বসিয়া সহকর্ম্মীদের সঙ্গে কত পরামর্শ করিয়াছেন। আজ পেট ফাঁপিল, কি করিতে হইবে, আজ কথা আড়ষ্ট হইয়া আসিতেছে—কি করিলে ভাল হয়। এই চায়ের দোকানের সামনে আসিলেই খোকার শেষের দিনগুলি চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে।

নারাণবাবুর স্মৃতি স্কুলের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট। আগের হেড্ মাষ্টার ছিলেন অনুকূলবাবু। তিনি ছিলেন ঋষিকল্প পুরুষ—দুজনে মিলিয়া এই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন—খুব বন্ধুত্ব ছিল দুজনের মধ্যে। অনুকূলবাবুর অনুরোধে নারাণ চাটুয্যে রেলের চাকুরী ছাড়িয়া আসিয়া এই স্কুলে শিক্ষাব্রত গ্রহণ করেন। এই স্কুলকে কলিকাতার মধ্যে একটি নামজাদা স্কুল করিয়া তুলিতে হইবে, এ

ছিল সম্বল। একদিন-দুদিন নয়, দীর্ঘ পনেরো-ষোলো বৎসর ধরিয়া সে কত পরামর্শ, কত আশা নিরাশার দোলা, কত অর্থনাশের উদ্বেগ। একবার এমন সুদিনের উদয় হইল যে, নারাণবাবুদের স্কুল কলিকাতার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর স্কুল হইয়া গেল বুঝি। হেয়ার হিন্দুকে ডিঙাইয়া সে বার এই স্কুলের এক ছাত্র ইউনিভার্সিটিতে প্রথম স্থান অধিকার করিল। নারাণবাবু দেড় শত টাকা বেতনে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইবেন, সব ঠিক ঠাক,—এমন সময় অনুকূলবাবু মারা গেলেন। সব আশা ভরসা ফুরাইল। একরাশ দেনা ছিল স্কুলের, পাওনাদারেরা নালিশ করিল, গবর্ণমেণ্ট-নিযুক্ত অডিটার আসিয়া রিপোর্ট করিল, স্কুলের রিজার্ভ ফণ্ডের টাকা ভূতপূর্ব্ব হেড্ মাষ্টার তছরূপ করিয়াছেন, বাড়ীওয়ালা ভাড়ার দায়ে আসবাবপত্র বেচিয়া লইল। নূতন ছাত্র ভর্ত্তি হইবার আশা থাকিলে হয় তো এতটা ঘটিত না—কিন্তু ছাত্র আসিত অনুকূল-বাবুর নামে, তিনিই চলিয়া গেলেন, স্কুলে আর রহিল কে? জানুয়ারী মাসে আশানুরূপ ছাত্রের আমদানি হইল না—কাজেই পাওনাদারদের উপায়ান্তর ছিল না।......

হেড্ পণ্ডিত চা খান না—তবুও মাষ্টারদের সঙ্গে দোকানে বসিয়া গল্পগুজব করিয়া চা পানের তৃপ্তি উপভোগ করেন আজ বহু বৎসর হইতে। বলিলেন—চলুন নারাণবাবু, চা খাবেন না? আসুন যদুবাবু, ক্ষেত্রবাবু—

মাষ্টার মহাশয়দের এ দোকানে যথেষ্ট খাতির। নিকটবর্ত্তী স্কুলের মাষ্টার বলিয়াও বটে, অনেক দিনের খরিদ্দার বলিয়াও বটে! দোকানী বেঞ্চ হইতে অন্য খরিদ্দারদের সরাইয়া দেয়, মাষ্টার মহাশয়দের চায়ের প্রকৃতি কিরূপ হইবে, সে সম্বন্ধে খুঁটিনাটি প্রশ্ন করে, দুএকটি ব্যক্তিগত প্রশ্নও করে আত্মীয়তা করিবার জন্য। অনেক সময় কাছে পয়সা না থাকিলে ধারও দেয়।

যদুবাবু বলিলেন—আমাকে একটু কড়া করে চা দিও আদা দিয়ে—

নারাণবাবু বলিলেন—আমার চায়েও একটু আদা দিও তো।

সকলের সামনে চা আসিল। সঙ্গে সঙ্গে পাশে একখানি করিয়া টোষ্ট্ দিয়া গেল চায়ের পিরিচে প্রত্যেককে। দোকানীকে বলিতে হয় না, সে জানে, ইহারা কি খাইবেন,—আজকার খরিদ্দার নয়।

স্কুলের হাড়ভাঙা খাটুনির পরে এবং যে যাহার টুইশানিতে যাইবার পূর্ব্বে এখানটিতে বসিয়া আধ ঘণ্টা ধরিয়া চা খাওয়া ও গল্পগুজব প্রত্যেকের পক্ষে বড় আরামদায়ক হয়। বস্তুতঃ মনে হয় যে, সারাদিনের মধ্যে এই সময়টুকুই অত্যন্ত আনন্দের, যাঁহারা চারিটা বাজিবার পূর্ব্বে ঘড়ি দেখিতে পাঠান, তাঁহারা নিজেদের অজ্ঞাতসারে এই সময়টুকুরই প্রতীক্ষা করেন। তবে স্কুল-মাষ্টার হিসাবে ইঁহাদের দৃষ্টি সংকীর্ণ, জীবনের পরিধি সুপ্রশস্ত নয়, সুতরাং কথাবার্ত্তা প্রতি দিন একই খাত বাহিয়া চলে। সাহেব আজ অমুক ঘণ্টায় অমুকের ক্লাসে গিয়া কি মন্তব্য করিল, অমুক ছেলেটা দিন-দিন খারাপ হইয়া যাইতেছে, অমুক অঙ্কটা এ ভাবে না করিয়া অন্য ভাবে কি করিয়া ব্ল্যাকবোর্ডে করা গেল, ইত্যাদি।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—মাসটিতে ছুটিছাটা একেবারেই নেই, না নারাণবাবু?

—কই আর, সেই ছাব্বিশে কি একটা মুসলমানদের পর্ব্ব আছে, তাও যে ছুটি দেবে কি না—

—ঠিক দেবে। মিঃ আলম আদায় করে নেবে।

—নাঃ, এক আধ দিন ছুটি না হোলে আর চলে না—

যদুবাবু বলিলেন—ওহে, হাফ কাপ একটা দাও তো। আজ চা'টা বেশ লাগছে—

চার পয়সার বেশি খরচ করিবার সামর্থ্য কোনো মাষ্টারেরই নাই চায়ের দোকানে। যদুবাবুর এই কথায় দু-একজন বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। নারাণবাবু বলিলেন—কি হে যদু, দমকা খরচ করে ফেললে যে!

—খাই একটু নারাণ দা! আর ক'দিনই বা—

যদুবাবু একটু পেটুক ধরণের আছেন, এ কথা স্কুলে সবাই জানে। বাজার-হাট ভালো করিয়া করিতে পারেন না পয়সার অভাবে, সামান্য বেতনে বাড়ী-ভাড়া দিয়া থাকিতে হয়—কোথা হইতে ভালো বাজার করিবেন—তবে নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ পাইলে সেখানে দুইজনেরই খাদ্য একা উদরস্থ করেন, স্কুলে ইহা লইয়া নিজেদের মধ্যে বেশ হাসিঠাট্টা চলে।

নারাণবাবু বয়সে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবীণ, প্রবীণত্বের দরুণ অপেক্ষাকৃত বয়ঃ

কনিষ্ঠদের প্রতি স্বাভাবিক স্নেহ জন্মিয়াছে তাঁহার মনে। তিনি ভাবিলেন—আহা, খাক্—খেতে পায় না—এই তো স্কুলে সামান্ত মাইনের চাকরী—ভালবাসে খেতে—অথচ কি ছাই বা খায়।

মুখে বলিলেন—খাও আর একখানা টোষ্ট্—আমি দাম দেবো—ওহে, বাবুকে একখানা টোষ্ট্ দাও—এখানে—

যত্নবাবু হাসিয়া বলিলেন—নারাণদা আমাদের শিবতুল্য লোক। তা দাও আর একখানা খেয়ে নি—

খাওয়া শেষ করিয়া সকলে বিড়ি বাহির করিলেন। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন দেশলাই পয়সায় দুটা—তৎসত্ত্বেও কেহ দেশলাই রাখেন না পকেটে—দোকানীর নিকট হইতে চাহিয়া কাজ সারিলেন।

নারাণবাবু বলিলেন—চলো যাই—ছ-টা বাজে—

যত্নবাবু বলিলেন—বাসায় আর যাওয়া হোল না, এখন যাই গিয়ে শাঁকারিটোলা ঢুকি ছাত্রের বাড়ী—

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—আমি যাবো সেই ক্যানাল রোড, ইটিলি—আমার ছাত্রেরা আবার সেখানে উঠে গিয়েছে—

নারাণবাবুও ছেলে পড়ান, তবে বেশি দূরে নয়,—নিকটেই প্রমথ সরকারের লেনে, সরকারদের বাড়ীতেই। বাহিরের ঘরে বুড়ো যোগীন সরকার বসিয়া আছেন, নারাণবাবুকে দেখিয়া বলিলেন—আসুন, মাষ্টার মশায় আসুন। তামাক খান। বসুন—

—চুনি পান্না খেলে বাড়ী ফিরেছে?

—চুনি ফিরেছে, পান্নার দেখা নেই এখনো। হতচ্ছাড়া ছেলে মাঠে একবার গেলে তো কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। বলই পিটছে, বলই পিটছে—দুটো নাতিই সমান—বসুন, তামাক খান, আসছে।

কিন্তু ছাত্রেরা না-আসিলে চলে না। নারাণবাবুকে দুটো টুইশানি সারিয়া আবার স্কুলে ফিরিতে হইবে, নিজের হাতে রান্নাবান্না করিতে হইবে, কিছুক্ষণ সাহেবের সঙ্গে বসিয়া মোসাহেবী গল্পও করিতে হইবে।

এমন সময়ে চুনি আসিয়া ডাকিল—মাষ্টার মশায় আসুন—

চুনি তেরো বছরের বালক, সিক্স্‌থ্‌ ক্লাসে পড়ে—নারাণবাবু নিঃসন্তান, বিপত্নীক—ছেলেটিকে বড় স্নেহ করেন। চুনি দেখিতেও খুব সুন্দর ছেলে, টক্‌টকে ফর্সা রং, লাবণ্যমাখা মুখখানি, তবে স্বভাব বিশেষ মধুর নয়। কথায় কথায় রাগ, স্নেহ ভালবাসার ধার ধারে না—কেহ স্নেহ করিলে বোঝেও না, সুতরাং প্রতিদানের ক্ষমতাও নাই। বড়লোকের ছেলে, একটু গর্ব্বিতও বটে।

চুনি নিজের পড়ার ঘরে আসিয়া বলিল—আজ একগাদা অঙ্ক দিয়েছেন ক্ষেত্রবাবু, আমায় সব বলে দিতে হবে—

—হবে, বার কর্‌ খাতা বই—

আপনি কখন চলে যাবেন ?

—কেন রে ?

—আজ আধ ঘণ্টা বেশি থাকতে হবে স্যার্‌—

—থাকবো, থাকবো। তোর যদি দরকার হয়, থাকবো না কেন ? তোর কথা ঠেলতে পারিনি—

—মাষ্টার বাড়ীতে রাখা ওই জন্যেই তো। এতগুলো করে টাকা মাইনে দিতে হয় আমাদের ফি মাসে শুধু প্রাইভেট মাষ্টারদের—কাকা বলছিলেন আজ সকালে।

কথাটা নারাণবাবুর লাগিল। তিনি আত্মীয়তা করিতে গেলে কি হইবে ? চুনি সে সব বোঝে না, উড়াইয়া দেয়। পয়সা দেখায়।

ধমক দিয়া বলিলেন—তোর সে কথায় থাকার দরকার কি চুনি ? অমন কথা বলতে নেই টিচারকে—ছিঃ !

চুনি অপ্রতিভ মুখে নীচু হইয়া খাতার পাতা উল্টাইতে লাগিল। সুন্দর মুখে বিজলির আলো পড়িয়া ওকে দেববালকের মত লাবণ্যভরা অথচ মহিমময় দেখাইতেছে। ইহারা আসে কোথা হইতে—কোন্‌ স্বর্গ হইতে ! কে ইহাদের মুখ গড়ায় চাঁদের সব সুষমা ছানিয়া, ছাঁকিয়া, নিংড়াইয়া ?

নারাণবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

কোথায় যেন পড়িয়াছিলেন, কোন্‌ কবির লেখা একটি ছত্র—'যৌবনে দাও রাজটিকা'—

সত্য কথা। যৌবন পার হইয়া গিয়াছে বহুদিন, আজ আটান্ন বছর বয়স, ষাটের দুই কম। ডাক তো আসিয়াছে, গেলেই হয়। কি করিলেন সারা জীবন? স্কুল-স্কুল করিয়া সব গেল। নিজের বলিতে কিছু নাই। আজ যদি চুনির মত একটা ছেলে—

'যৌবনে দাও রাজটীকা'—সারা দুনিয়ায় সমস্ত আশাভরসা আমোদ-আহ্লাদ আজ অপেক্ষমান বশ্যতার সঙ্গে এই বালকের সম্মুখে বিনম্র ভাবে দাঁড়াইয়া, কত কর্ম্মভার-বিপুল দিবসের সঙ্গীত বাজিবে উহার জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, কত অজানা অনুভূতির বিকাশ ও কর্ম্ম-প্রেরণা।

চুনির সঙ্গে জীবন বিনিময় করা যায় না,—এই তেরো বছরের বালকের সঙ্গে?

—স্যার, ছুটির ইংরিজি কি হবে? আজ আমাদের ছুটি—এর কি ট্রান্‌স্লেশন করবো স্যার?

—আজ আমাদের ছুটি, আজ আমাদের ছুটি—কিসের মধ্যে আছে দেখি? বেশ। করো। আজ—টু ডে, আমাদের—আওয়ার, ছুটি—হলি ডে—

—টু ডে আওয়ার হলি ডে?—

—দূর, ক্রিয়া কই। ইংরিজিতে 'ভার্ব' না দিলে সেণ্টেন্স হয় কখনো? কত বার বলে দিয়েছি না?

এমন সময় ঘরে ঢুকিল পান্না, চুনির ছোট ভাই। তার বয়স এগারো কিন্তু চুনির চেয়েও সে দুষ্ট ও অবাধ্য, বাড়ীর কাহারো কথা শোনে না, কেবল নারাণবাবুকে একটু ভয় করিয়া চলে; কারণ, স্কুলে নারাণবাবুর হাতে বড় মার খায়। ইহাকে তিনি তত ভালবাসেন না।

পান্না ঘরে ঢুকিয়া অপরাধীর দৃষ্টিতে মাষ্টারের দিকে চাহিল, তারপর শেল্‌ফের কাছে গেল বই বাহির করিতে।

নারাণবাবু কড়া স্বরে বলিলেন—কোথায় ছিলে?

—খেল্‌ছিলাম স্যার।

—কটা বেজেছে হুঁস্ আছে?

পড়ার ঘরেই ঘড়ি আছে দেওয়ালে। পান্না সে দিকে চাহিয়া দেখিল, সাড়ে ছ-টা বাজিয়াছে,—সুতরাং সে বলিল—সাড়ে ছ-টা স্যার।

—হুঁ—গাধা কোথাকার। সাড়ে ছ'টা না সাড়ে সাতটা? বল ক'টা বেজেছে? ভালো করে দেখে বল্।

—সাড়ে সাত্টা—

—ঠিক হয়েছে। এই বল খেলে এলে—কাল পড়া না হোলে তোমার কি করি ছ্যাখো—

চুনি বলিল—স্যার, আজ দুপুরে বেরিয়ে গিয়েছে, এই এলো।

পান্না দাদার দিকে চাহিয়া বলিল—লাগানো হচ্ছে স্যারের কাছে? তোর ওস্তাদি আমি বার করে দেবো বলছি—

—দে না দেখি? তোর বড় সাহস।

—এই মারলাম। কি করবি তুই?

নারাণবাবু বৃদ্ধ, দুই বলিষ্ঠ বালকের মধ্যে পড়িয়া যুদ্ধ তো থামাইতে পারিলেনই না—অধিকন্তু চশমাটি চূর্ণবিচূর্ণ হইবার সম্ভাবনা প্রবল হইয়া উঠিল।

দেখিতে দেখিতে পান্না ড্রয়ারের ভিতর হইতে টর্চ্চলাইট বাহির করিয়া চুনির মাথায় এক ঘা বসাইয়া দিল। ফিনকি দিয়া রক্ত ছুটিল।

চুনি হাঁউ মাউ করিয়া কাঁদিবার ছেলে নয়—সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, নারাণবাবু হাঁ হাঁ করিয়া আসিয়া পড়িতে না পড়িতে এই কাণ্ডটি ঘটিয়া গেল।

গোলমাল শুনিয়া চুনি পান্নার মা, বিধবা পিসী ও দুই ভাই-বউ অন্তঃপুরের দিকের ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। চুনিকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহারা কোনো উত্তর না পাইয়া মাষ্টারের উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল।

—ও মা, মাষ্টার তো বসে আছে, তার চোখের সামনে ছেলেটাকে একেবারে খুন করে ফেললে গা!

অন্য একটি বধূ মন্তব্য করিল—মাষ্টারকে মানে না দিদি, ছেলেগুলো ভারি দুষ্টু—

চুনির মা বলিলেন—মাষ্টার বসে বসে আফিং খেয়ে ঝিমোয়—তা ওকে মানবে কি করে ?

নারাণবাবু মনে মনে ক্ষুব্ধ হইলেও মুখে বাড়ীর স্ত্রীলোকদের উদ্দেশ্যে কি বলিবেন ? কে তাঁহাকে আফিং খাওয়াইয়াছে, শুনিবার তাঁহার বড় কৌতূহল হইল।

চুনিকে লইয়া তাহার মা ও পিসীমা চলিয়া গেলে নারাণবাবু রাগের মাথায় পান্নাকে গোটা দুই চড় কসাইলেন, সে চুপ করিয়া রহিল। বাড়ীর মধ্যে খুব একটা গোলমাল হইল কিছুক্ষণ ধরিয়া—তাহার পর ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মাথায় চুনি এক পেয়ালা চা হাতে বাহিরের ঘরে আসিয়া হাজির হইল। সব মিটিয়া গেল, দুই ভাইয়ের সম্মিলিত উচ্চ কণ্ঠস্বরে নৈশ গগন বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

চুনির মুখের দিকে চাহিয়া নারাণবাবুর বড় মায়া হইল।

অবোধ বালক! কেন মারামারি করে, তাও জানে না, নিজেদের ভালো-মন্দ নিজেরা বোঝে না। মিছামিছি সন্ধ্যার সময় মার খাইয়া মরিল।

স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন—লেগেছে চুনি খুব ?

চুনি বলিল—আধ ইঞ্চি ডিপ্ হয়ে কেটে গিয়েছে—

—ব্যাণ্ডেজ বাঁধলে কে ?

—পিসীমা।

—উনি জানেন ?

—চমৎকার জানেন। কেন, ভাল হয়নি ?

নারাণবাবুর ইচ্ছা হইল, চুনিকে কোলে টানিয়া লইয়া আদর করেন, তাহাকে সান্ত্বনা দেন। কিন্তু লজ্জায় পারিলেন না। চুনি ঘ্যান্‌ঘেনে ধরণের ছেলে নয়—মার খাইয়া নালিশ করিতে জানে না। এই রকম 'ষ্টোইক' ধরণের ছেলে নারাণবাবু তাঁর দীর্ঘ শিক্ষক-জীবনে যতগুলি দেখিয়াছেন, এক অঙ্গুলির পর্ব্বগুলির মধ্যেই তাহাদের গণনার পরিসমাপ্তি ঘটে। চুনি

সেই অতি-অল্পসংখ্যক ছেলেদের একজন। চুনিকে এই জন্যই এত ভাল লাগে তাঁর।

এই সময় চুনির বাবা বাহির হইতে আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—মাষ্টার যে! ও কি, ওর মাথায় কি?

নারাণবাবু সব কথা বলিলেন।

চুনির বাবার হৃদ্যতা কর্পূরের মত উবিয়া গেল। তিনি বিরক্তির স্বরে বলিলেন—আপনি বসে থাকেন, আর প্রায়ই আপনার চোখের সামনে এরকম কুরুক্ষেত্র কাণ্ড ঘটে—আপনি দেখেন না?

—আজ্ঞে, দেখবো না কেন? সামান্য কথাবার্ত্তা থেকে মারামারি। আমি এসে পড়ে ছাড়িয়ে দিই, তবে—

—আপনি একটু ভাল করে দেখাশুনো করবেন বলেই তো রাখা। নইলে গ্রাজুয়েট মাষ্টার দশ টাকাতেও পাওয়া যায়। দুবেলা পড়াবে।

—আজ্ঞে, আমি দেখি। দেখি না, তা ভাববেন না।—

—আমি সব সময় দেখতে পারিনে, নানা কাজে ঘুরি—কিন্তু আপনার দ্বারা দেখছি—আপনার বয়স হয়েছে। এই সময় চুনি যদি তাহার বাবাকে বলিত —বাবা, স্যারের কোন দোষ নেই—আমারই সব দোষ—তাহা হইলে নারাণবাবুর মনের মত কাজ হইত, নারাণবাবু এই ভাবিয়া সপ্তবর্গ প্রাপ্ত হইতেন যে, চুনি তাঁহার অগাধ স্নেহের প্রতিদান দিল।

কিন্তু যা আশা করা যায়, তা হয় না।

চুনি চুপ করিয়া রহিল। বাবাকে তাহারা দুই ভাই যমের মত ভয় করে।

চুনির বাবা বলিলেন—মাষ্টার বোসো, আমি আসছি, চা খেয়েছ?

এইবার চুনি মুখ তুলিয়া বলিল—হ্যাঁ, বাবা, আমি এনে দিয়েছি—

চুনির এ কথাটা নারাণবাবুর ভাল লাগিল না। চুনি এ কথা কেন বলিতেছে, নারাণবাবু তাহা বুঝিতে পারিলেন। পাছে তাহার বাবা গিয়া আর এক কাপ চা মাষ্টারের জন্য পাঠাইয়া দেন, সে জন্য। কেন এক পেয়ালা চা বেশি দেওয়া হইবে মাষ্টারকে।

নারাণবাবু বাসায় ফিরিলেন—তখন রাত ন'টা। নিজের ছোট ঘরটার চাবি খুলিয়া রান্না চাপাইয়া দিলেন, তারপর যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণখানা লইয়া পড়িতে বসিলেন। এই সময়টাই বেশ লাগে সারাদিনের খাটুনির পরে। আজ স্কুলের এই ঘরে নারাণবাবু আছেন উনিশ বছর। বহুকাল হইল তাঁর পত্নী স্বর্গগমন করিয়াছেন, নারাণবাবু আর বিবাহ করেন নাই—পত্নীর স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য যত না হোক্, গরীব-স্কুল-মাষ্টার জীবনে খরচ চালাইতে পারিবেন না বলিয়াই বেশি।

উনিশ বৎসরের কত স্মৃতি এই ঘরের সঙ্গে জড়ান।

যখন প্রথম এই স্কুলে অনুকূলবাবু তাঁহাকে লইয়া আসেন, তখন এই ঘরে আর একজন বৃদ্ধ মাষ্টার ভুবনবাবু থাকিতেন। ভুবনবাবুর বাড়ী ছিল মুর্শিদাবাদ, ভদ্রলোক বিবাহ করেন নাই, সংসারে এক বিধবা ভগ্নী ছাড়া তাঁহার আর কেহ ছিল না। একদিন বিছানায় লোকটি মরিয়া পড়িয়া ছিল এই ঘরেই। স্কুলের খরচে ভুবনবাবুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

…নারাণবাবু ভাবেন, তাঁহার অদৃষ্টেও তাহাই নাচিতেছে। তাঁহারও কেহ নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ভাই নাই, ভগ্নী নাই—এই ঘরটি আশ্রয় করিয়া আজ বহুদিন কাটাইয়া দিলেন। এখন এমন হইয়া গিয়াছে, এই ঘর ও এই স্কুলের বাহিরে তাঁহার যেন আর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। জীবনের একমাত্র কর্ম্মক্ষেত্র এই স্কুল। স্কুলের বিভিন্ন ক্লাসে রুটিন অনুযায়ী কোন্ দিন কি পড়াইবেন, নারাণবাবু সকালে বসিয়া ঠিক করেন।

কাল থার্ড ক্লাসে ললিত ছেলেটা ইংরাজী গ্রামারের 'দি'র ব্যবহার সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে, নারাণবাবুর প্রাণে তাহাতে এমন একটা ধাক্কা লাগিয়াছে, সে বেদনা নিতান্ত বাস্তব। নারাণবাবু জানেন যে, 'দি' ব্যবহার করিতে না পারিলে থার্ড ক্লাসের ছেলে হইয়া, সে ইংরাজী ব্যাকরণ শিখিল কি? কাল নারাণবাবু তখনই নোট-বইতে লিখিয়া লইয়াছেন—"থার্ড ক্লাস, ললিতমোহন কর, ডেফিনিট্ আর্টিকেল 'দি'।"—এইটুকু মাত্র দেখিলেই তাঁহার মনে পড়িবে।

তাহার পর আজ সেই ললিতকে ঝাড়া আধ ঘণ্টা ধরিয়া জিনিষটা শিখাইয়া দিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কিছুই হইল না। ললিত কর যে 'আঁধার, সে আঁধারেই' রহিয়াছে। কি করা যায়? তাঁহার শিখাইবার প্রণালীর কোন দোষ ঘটিতেছে নিশ্চয়।

কি করিলে ললিত ছোঁড়াটা 'দি'র ব্যবহার শিখিতে পারে?

নারাণবাবু হুঁকায় তামাক খাইতে খাইতে চিন্তা করিতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল—সেভেন্থ ক্লাসের পূর্ণ চক্রবর্ত্তী, মাত্র নয় বছরের ছেলে, এত মিথ্যা কথাও বলে! কত দিন মারিয়াছেন, নিষেধ করিয়াছেন, হেড্ মাষ্টারের আপিসে লইয়া যাইবার ভয় দেখাইয়াছেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোনো ফল হয় নাই। ছেলেটার সম্বন্ধে কি অভিভাবকের নিকট একখানা চিঠি দিবেন? তাহাতেই বা কি সুফল ফলিবে? না হয় চিঠি পাইয়া ছেলের বাপ ছেলেকে ধরিয়া ঠ্যাঙাইলেন, তাহাতেই ছেলে ভাল হইয়া যাইবে বলিয়া তো মনে হয় না। কি করা যায়?

নারাণবাবুর সম্মুখে এই সব সমস্যা প্রতি দিন দু-একটা থাকেই। মাঝে মাঝে এগুলি লইয়া তিনি ক্লার্কওয়েল সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করিতে যান। সাহেব সন্ধ্যার সময় মোটরে ছেলে পড়াইতে বাহির হন, ফিরিবার অল্পক্ষণ পরেই রাত ন'টা কি সাড়ে ন'টার সময়ে নারাণবাবু সাহেবের দরজায় গিয়া কড়া নাড়িলেন।

—কে? কি, নারাণবাবু? ভেতরে এসো।

—স্যার, আপনার খাওয়া হয়েছে?

—এই এখুনি খেতে বসবো। এক পেয়ালা কফি খাবে?

—তা-তা—

—বাবুকে এক পেয়ালা কফি দাও।—বোসো। কি খবর?

—স্যার, আপনার কাছে এসেছিলাম একটা খুব জরুরী দরকার নিয়ে। একবার আপনার সঙ্গে পরামর্শ করবো।—ওই থার্ডক্লাসের ললিত কর বলে ছেলেটা 'দি'র ব্যবহার কিছুই জানে না, এত দিন পরে আবিষ্কার করলাম। কাল কত চেষ্টাও করেছি···কিন্তু শেখানো গেল না। কি করা যায় বলুন তো?

ক্লার্কওয়েল সাহেব অত্যন্ত কর্ত্তব্যপরায়ণ হেড্ মাষ্টার। এসব বিষয়ে নারাণবাবু তাঁহার শিষ্য হইবার উপযুক্ত। ক্লার্কওয়েল খাওয়া-দাওয়া ভুলিয়া গেলেন। নিজের টেবিলে গিয়া ড্রয়ার টানিয়া একখানা খাতা বাহির করিয়া নারাণবাবুকে দেখাইয়া বলিলেন—আমারও একটা লিষ্ট আছে এই ছাখো—ফার্ষ্ট ক্লাসের কত ছেলে ও জিনিষটার ব্যবহার ঠিকমত জানে না আজো। আরও কত নোট্ করেছি ছাখো। তবে একটা প্রণালীতে আমি বড় উপকার পেয়েছি—তোমাকে সেটা—এই পড়ো—

বলিয়া ক্লার্কওয়েল নিজের নোট্-বইখানা নারাণবাবুর হাতে দিলেন।

মিস্ সিবসন্ ওদিকের দরজা দিয়া ঘরে ঢুকিয়া নারাণবাবুকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল—ও, নারাণবাবু! আমাদের সঙ্গে ডিনার খাবে? হাউ সুইট্ অফ্ ইউ!

নারাণবাবু বিনীত ভাবে জানাইলেন, তিনি ডিনার খাইতে আসেন নাই।

ক্লার্কওয়েল মেমসাহেবের দিকে চাহিয়া বলিলেন—এই স্কুলে দুজন টিচার আছে, যারা টিচার নামের উপযুক্ত, নারাণবাবু আর মিঃ আলম। ইনি এসেছেন ললিতকে কি করে "দি'র ব্যবহার শেখানো যায়, তাই নিয়ে। আর ক'জন আছে আমাদের স্কুলের মধ্যে, যাঁরা এ সব নিয়ে মাথা ঘামান?

মেমসাহেব হাসিয়া বলিল—ইউ ডিজার্ভ এ স্লাইস্ অফ্ মাই হোম মেড্ কেক্—নারাণবাবু—ইউ ডু।

একটা কেকের খানিকটা কাটিয়া প্লেটে নারাণবাবুর সামনে রাখিয়া মেমসাহেব বলিল—ইট্ ইট্ এ্যাণ্ড প্রেজ ইট্—

নারাণবাবু বিনয়ে ঝাঁকিয়া দুমড়াইয়া হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিলেন—ধন্তবাদ ম্যাডাম, ধন্তবাদ, ধন্তবাদ, চমৎকার কেক্—বাঃ, বেশ—

ক্লার্কওয়েল বলিলেন—আর কে কি রকম কাজ করে নারাণবাবু? টিচারদের মধ্যে—

নারাণবাবুর একটা গুণ, কাহারো নামে লাগানো ভাঙ্গানো অভ্যাস নাই তাঁর। মিঃ আলম যে স্থলে অন্ততঃ তিন জন টিচারকে ফাঁকিবাজ বলিয়া দেখাইত, সেখানে নারাণবাবু বলিলেন—কাজ সবাই করে প্রাণপণে, আর—সবাই বেশ খাটে।

হেড্‌মাষ্টার হাসিয়া বলিলেন—ইউ আর এ্যান্ ওল্ড ম্যান নারাণবাবু। তুমি কারো দোষ ছাখো না—ওই তোমার মস্ত দোষ। আমি জানি, কে কে আমার স্কুলে ফাঁকি ছায়। আমি জানিনে ভাবো? নাম আমি করছিনে—নাম করা অনাবশ্যক—কারণ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাদের নাম তোমার কাছেও অজ্ঞাত নয়। আচ্ছা যাও—

মেমসাহেব বলিল—ভাল কেক্?

নারাণবাবু বলিলেন—চমৎকার কেক্ ম্যাডাম, অদ্ভুত কেক্।

মেমসাহেব বলিল—আমার বাপের বাড়ী শ্রপশায়ারে, শুধু সেইখানেই এই কেক্ তৈরি হয় তোমায় বলছি। তাও দুখানা গাঁয়ে, নরউড্ আর বার্কলে সেণ্ট্ জন্, পাশাপাশি গাঁ। কলকাতার দোকানে যে কেক্ বিক্রি হয় ও আমি খাইনে।

নারাণবাবু আর এক প্রস্থ বিনীত হাস্য বিস্তার করিয়া বিদায় লইলেন। ......আজ অনুকূলবাবু নাই, কিন্তু সাহেব ও মেম আসাতে নারাণবাবু খুশিই আছেন। স্কুলের কি করিয়া উন্নতি করা যায়, সে দিকে সাহেবের সর্ব্বদা চেষ্টা, তবে দোষও আছে। টাকাকড়ি সম্বন্ধে সাহেব তেমন সুবিধার লোক নয়। মাষ্টারদের মাহিনা দিতে বড় দেরি করে, নানা-রকমে কষ্ট দেয়—তার একটা কারণ, স্কুলের ক্যাশ সাহেবের কাছে থাকে, সাহেবের বেজায় খরচের হাত—খরচ করিয়া ফেলে, অবশ্য স্কুলের বাবদও খরচ করে—শেষে মাষ্টারদের মাহিনা দিতে পারে না সময়মত।

মোটের উপর কিন্তু সাহেব স্কুলের পক্ষে ভালই। বড় কড়াপ্রকৃতির বটে, শিক্ষকদের বিষয়ে অনেক সময় অন্যায় অবিচার যথেষ্ট করিয়া থাকে, যমের মত ভয় করে সব মাষ্টার—কিন্তু স্কুলের স্বার্থ ও ছেলেদের স্বার্থের দিকে নজর রাখিয়াই সে-সব করে সাহেব। অনুকূলবাবু থাকিলে ইহার অপেক্ষা বেশি কিছু করিতে পারিতেন না। নারাণবাবু তাই চান, স্কুলের উন্নতি লইয়াই কথা।

যদুবাবুর আজ মোটে বিশ্রামের অবকাশ নাই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া

খাটুনি চলিতেছে, দুজন শিক্ষক আজ আসেন নাই, তাঁহাদের ঘণ্টায় খাটিতে হইতেছে। একটা ঘণ্টার শেষে মিনিট পনেরো সময় চুরি করিয়া যদুবাবু তেতালায় শিক্ষকদের বিশ্রামকক্ষে ঢুকিলেন, উদ্দেশ্য ধূমপান করা।

গিয়া দেখিলেন—হেড্ পণ্ডিত ও ক্ষেত্রবাবু বসিয়া আছেন। তেতালার এই ঘরটি বেশ ভাল, বড় বড় জানালা চারি দিকে, চওড়া ছাদ, ছাদে দাঁড়াইলে সেণ্ট্ পলের চূড়া, জেনারেল পোষ্ট আপিসের গম্বুজ, হাইকোর্টের চূড়া, ভিক্টোরিয়া হাউস প্রভৃতি তো দেখা যায়ই—বিশাল মহাসমুদ্রের মত কলিকাতা নগরী অসংখ্য ঘরবাড়ীর ঢেউ তুলিয়া এই ক্ষুদ্র স্কুলবাড়ীকে যেন চারি ধার হইতে ঘিরিয়াছে, নীচে ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট দিয়া অগণিত জনস্রোত ও গাড়ী-ঘোড়ার ভিড়, ট্রামের ঘণ্টাধ্বনি, ফিরিওয়ালার হাঁক, বিচিত্র ও বৃহৎ জীবন-যাত্রার রহস্যে সমগ্র শহর আপনাতে আপনিহারা—থম্‌থমে দুপুরে যদুবাবু মাঝে মাঝে বিড়ি খাইতে খাইতে শিক্ষকদের ঘরের জানালা দিয়া চাহিয়া দেখেন।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—কি যদু দা, বিশ্রাম নাকি ?

—না ভাই, পরিশ্রম। একটা বিড়ি খেয়ে যাই—

—আমাকেও একটা দেবেন—

হেড্ পণ্ডিতের দিকে চাহিয়া যদুবাবু বলিলেন—কাল একটা ছুটি করিয়ে নাও না দাদা, সাহেবের কাছ থেকে ? কাল ঘণ্টাকর্ণ পুজো—

হেড্ পণ্ডিত হাসিয়া বলিলেন—হাঃ, ঘণ্টাকর্ণ পুজোর আবার ছুটি—তাই কখনো দ্যায়—

—কেন দেবে না ? তুমি বুঝিয়ে বলো—তুমিই ত ছুটির মালিক—

—না না, সে দেবে না।

—বলেই দ্যাখো না দাদা। বলো গিয়ে, হিন্দুর এটা মস্ত বড় পরব—

—ভাল, তোমাদের কথায় অনেক কিছুই বল্লুম। তোমরা শিখিয়ে দিলে যে, রামনবমী আর পুজো প্রায় সমান দরের পরব। রাস, দোল, ষষ্ঠীপুজো, মাকালপুজো—তোমরা কিছুই বাদ দিলে না। আবার ঘণ্টাকর্ণপুজোর জন্যে ছুটি চাই,—কি বলে—

—যাও যাও, বলে এস—তুমি বল্লেই হয়—

ক্ষেত্রবাবু ছাদের এক ধারে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন—ওহে, খুকীর বর কাল এসে গেছে।

যদুবাবু ও হেড্ পণ্ডিত একসঙ্গেই বলিয়া উঠিলেন, সত্যি? এসে গিয়েছে?

—ওই দেখুন না, বসে আছে।

—যাক্, বাঁচা গেল! আহা, মেয়েটা বড্ড কষ্ট পাচ্ছিল—

এই উঁচু তেতালার ছাদের ঘরে বসিয়া চারি পাশের অনেক বাড়ীর জীবনযাত্রার সঙ্গে ইহাদের প্রত্যক্ষ পরিচয়। বাড়ীর মালিকের নাম-ধাম পর্য্যন্ত জানা নাই—অথচ ক্ষেত্রবাবু জানেন, ওই হল্‌দে রংয়ের তেতলা বাড়ীটার বড় ছেলে গত কার্ত্তিক মাসে মারা গেল, বেশ কোট প্যাণ্ট পরিয়া কোথায় যেন চাকুরী করিত, বাড়ীর গিন্নীর আছাড়িবিছাড়ি মর্ম্মভেদী কান্না। টিফিনের অবকাশে এখানে বসিয়া দেখিয়া ক্ষেত্রবাবুর ও জ্যোতির্ব্বিনোদ মহাশয়ের চোখে জল আসিল।

এই যে খুকীর বর আসিল, ইহারা জানেন। ষোল-সতের বছরের সুন্দরী কিশোরী, বাড়ীর ওই জানালাটিতে আনমনে বসিয়া পথের দিকে চাহিয়া থাকিত, আপন মনে চোখের জল ফেলিত। জ্যোতির্ব্বিনোদ মহাশয় এই ঘরেই থাকেন, তিনি বলেন, রাত্রে ছাদে মেয়েটি পায়চারি করিয়া বেড়াইত, একবার কেহ কোন দিকে নাই দেখিয়া ছাদে উপুড় হইয়া প্রণাম করিয়া কি যেন মনে মনে মানত করিত, মেয়েটি যে অসুখী, সকলেই বুঝিতেন। মেয়েটি বিবাহিতা, অথচ আজ এক বৎসরের মধ্যে তাহার স্বামীকে দেখা যায় নাই—কাজেই আন্দাজ করিয়াছিলেন, স্বামীর অদর্শনই মেয়েটির মনোদুঃখের কারণ। কি জাত, কি নাম, তাহা কেহই জানেন না, অথচ এই অনাত্মীয়া, অজ্ঞাত-কুলশীলা কিশোরীর দুঃখে প্রৌঢ় শিক্ষকদের মন সহানুভূতিতে ভরিয়া ছিল, যদিও অল্পবয়স্ক দু-একজন শিক্ষক ইহাদের অসাক্ষাতে কিশোরীকে লক্ষ্য করিয়া এমন সব কথা বলিত, যাহা শোভনতার সীমা অতিক্রম করে।

মাঝে মাঝে জ্যোতির্ব্বিনোদ মহাশয় বলিতেন—আহা, কাল রাত্রে খুকী

বড্ড কেঁদেছে একা একা ছাদে। হেড্ পণ্ডিত বলিতেন—ভাই, বড় তো মুস্কিল দেখছি। কি হয়েছে ওর বরের? কোথায় গেল?

কেহই কিছু জানে না—অথচ মেয়েটির সুখদুঃখ তাঁহারা নিজের করিয়া লইয়াছেন। আজ ইহারা সত্যই খুশী—খুকীর বর আসিয়াছে। বিশেষ করিয়া হেড্ পণ্ডিত ও ক্ষেত্রবাবু।

হেড্ পণ্ডিতের মেয়ে রাধারাণী, প্রায় এই কিশোরীর সমবয়সী, আজ এক বৎসর হইল মারা গিয়াছে টাইফয়েড্ রোগে। মেয়েটির দিকে চাহিলেই নিজের মেয়ের কথা মনে পড়ে। বাপের অমন সেবা রাধারাণীর মত কেহ করিতে পারিত না—স্কুলের খাটুনির পরে বৈকালে বাড়ী ফিরিলে দেখিতেন, রাধা তাঁর জন্য হাত-পা ধোয়ার জল ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, হাত-পা ধোয়া হইলেই একটু জলখাবার আনিয়া দিবে, পাখা লইয়া বাতাস করিবে, কাছে বসিয়া কত গল্প করিবে—ঠিক যেন পাকা গিন্নী। তাহার একমাত্র দোষ ছিল—বায়োস্কোপ দেখিবার অত্যধিক নেশা।

প্রায়ই বলিত—বাবা, আজ কিন্তু—

—না মা, এই সে দিন দেখলি, আজ আবার কি!

—তুমি বাবা জানো না। কি সুন্দর ছবি হচ্ছে আমাদের এই চিত্রবাণীতে, সবাই দেখে এসে ভালো বলেছে বাবা—

—রোজ রোজ ছবি দেখতে গেলে চলে মা? ক'টাকা মাইনে পাই।

—তা হোক বাবা, মোটে তো ন' আনা পয়সা—

—ন' আনা ন' আনা—দেড় টাকা—তোর গর্ভধারিণী যাবে না?

—মা কোথাও যেতে চায় না। তুমি আর আমি—

হেড্ পণ্ডিত ভাবিতেন, মেয়েটি তাঁহাকে ফতুর করিবে, বায়োস্কোপের খরচ কত যোগাইবেন তিনি এই সামান্য ত্রিশ টাকা বেতনের মাষ্টারি করিয়া? উঃ, কি ভালই বাসিত সে ছবি দেখিতে! ছবি দেখিলে পাগল হইয়া যাইত, বাড়ী ফিরিয়া তিন দিন ধরিয়া তাহার মুখে অন্য কথা থাকিত না, ছবির কথা ছাড়া।

কোথায় আজ চলিয়া গেল? আজকাল দু-একখানা বাংলা ছবি

হইতেছে, ছবিতে নাকি কথাও কহিতেছে—এসব দেখিতে পাইল না মেয়ে। বায়োস্কোপের খরচ হইতে তাঁহাকে একেবারে মুক্তি দিয়া গিয়াছে।

যদুবাবু বলিলেন—তা যাও এবেলা দাদা—ছুটিটার জন্যে। তুমি গিয়ে বল্লেই হয়ে যাবে—

ইহাদের অনুরোধে হেড্ পণ্ডিত ভয়ে ভয়ে গিয়া হেড্ মাষ্টারের আপিসে ঢুকিয়া টেবিলের সামনে দাঁড়াইলেন।

ক্লার্কওয়েল সাহেব কি লিখিতেছিলেন, মুখ তুলিয়া বলিলেন—হোয়াট? পাণ্ডিট্! সিওরলি ইট্ ইজ নট্ এ হলিডে ইউ হ্যাভ্ কাম্ টু আস্ক ফর্?

হেড্ পণ্ডিত বলিলেন—কাল ঘণ্টাকর্ণপুজা স্যার—

সাহেব বলিলেন—হোয়াট ইজ দ্যাট? ঘণ্টা—

—ঘণ্টাকর্ণ। হিন্দুর এত বড় পর্ব্ব আর নেই—

—ও ইউ নটি ফেলো—তুমি প্রত্যেক বারই বলো এক কথা—

—না স্যার, পাঁজিতে লেখে—

—ওয়েল, আই আণ্ডারষ্ট্যাণ্ড ইট্—হবে না, কি পুজো বল্লে? ওতে ছুটি হবে না।

হেড্ পণ্ডিত বুঝিলেন, তাঁহার কাজ হইয়া গিয়াছে। সাহেব প্রত্যেক বারই ও রকম বলেন, শেষ ঘণ্টায় দেখা যাইবে, স্কুলের চাকর সার্কুলার-বই লইয়া ক্লাসে ক্লাসে ঘুরিতেছে।

হেড্ পণ্ডিত ফিরিয়া আসিলে মাষ্টারেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

ক্ষেত্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হোল দাদা?

যদুবাবু বলিলেন—কার্য্যসিদ্ধি?

—দাঁড়াও দাঁড়াও, হাঁপ জিরিয়ে নিই—সাহেব বল্লে, হবে না।

—হবে না বলেছে তো? তা হোলে ও হয়ে গিয়েছে। বাঁচা গেল দাদা, মলমাস যাচ্ছিল, তবুও ঘণ্টাকর্ণের দোহাই দিয়ে—

—এখনও অত হাসিখুসির কারণ নেই। যদি পাশের স্কুলে জিজ্ঞেস করতে পাঠায়, তবেই সব ফাঁক। আমি বলেছি হিন্দুর অত বড় পরব আর নেই। এখন যদি অন্য স্কুলে জানতে পাঠায়—

ছোকরা উমাপদবাবু বলিলেন, যদি তারাও ঘণ্টাকর্ণপুজোর ছুটি দেয় ?

হেড্ পণ্ডিত হাসিয়া বলিলেন—ঘণ্টাকর্ণপুজোর ছুটি কে দেবে, রামোঃ।

কিন্তু সাহেবের ধাত সবাই জানে। শেষ ঘণ্টা পর্য্যন্ত মাষ্টারের দল দুরু দুরু বক্ষে অপেক্ষা করিবার পরে সকলেই দেখিল, স্কুলের চাকর ছুটির সার্কুলার লইয়া ক্লাসে ক্লাসে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে।

যদুবাবুর ক্লাস সিঁড়ির পাশেই। তিনি বলিলেন, কি রে, কি ওখানে ?

চাকর একগাল হাসিয়া বলিল—কাল ছুটি আছে—সার্কুলার বেরিয়েছে—

—সত্যি নাকি ? দেখি, নিয়ে আয় এদিকে—

চোখকে বিশ্বাস করা শক্ত।

কিন্তু সত্যই বাহির হইয়াছে।

"The School will remain closed to-morrow the 9th inst. for the great Hindu festival, Ghanta Karna Puja."

কিছুক্ষণ পরে ছুটির ঘণ্টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলের দল মহাকলরব করিয়া বাহির হইয়া গেল।

যদুবাবুকে ডাকিয়া হেড্ মাষ্টার বলিলেন—আপনি আর ক্ষেত্রবাবু ফোর্থ ক্লাসের ছেলেদের মিউজিয়ম আর জু'তে বেড়াতে নিয়ে যেতে পারবেন ?

—খুব স্যার।

দেখবেন, যেন ট্রাম থেকে পড়ে না যায়—একটু সাবধানে নিয়ে যাবেন। আর এই নিন টাকা—আনুষঙ্গিক খরচ আর ছেলেদের টিফিন—ছেলেদের বেশ করে বুঝিয়ে দেবেন। সব দেখাবেন।

যদুবাবু স্কুলের সামনের বারান্দাতে গিয়া দাঁড়াইলেন। ছেলেরা দু সারিতে দাঁড়াইল হেড্ মাষ্টারের বেতের ভয়ে। ড্রিল-মাষ্টারের আদেশ অনুযায়ী তারা মার্চ্চ করিয়া চলিল। কিন্তু খুব বেশি ক্ষণের জন্য নয়—রাস্তার মোড়ে আসিয়া তাহারা আবার দাঁড়াইয়া গেল।

যদুবাবু অনেক পেছনে ছিলেন, ছেলেদের সঙ্গে সমান তালে আসিবার

বয়স তাঁহার নাই। ক্ষেত্রবাবু আর একটু আগাইয়া ছিলেন, তিনি দৌড়িয়া গিয়া বলিলেন—দাঁড়ালি কেন রে?

—আমরা ট্রামে যাবো স্যার—

—ট্রামের পয়সা কাছে আছে সব?

দু'একজন বড় ছেলে সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল—স্কুল থেকে পয়সা দেয় নি স্যার?

—কই না। আমার কাছে তো দেয় নি। যদুবাবুর কাছে আছে কি না জানি না—দাঁড়াও দেখি—

ইতিমধ্যে যদুবাবু আসিয়া ইহাদের কাছে পৌছিলেন।

—কি ব্যাপার? দাঁড়িয়েছে কেন?

—আপনার কাছে ট্রামের ভাড়া দিয়েছেন হেড্ মাষ্টার?

—হ্যাঁ। কিন্তু সে চৌরঙ্গীর মোড় থেকে—এখানে চড়লে পয়সায় কুলুবে না। আপনি ওদের নিয়ে যান, আমি আর হাঁটতে পারছি নে। ট্রামে যাই।

—তবে আমিও ট্রামে যাই। ওরা হেঁটে যাক—

সেই ব্যবস্থাই হইল। যদুবাবু ও ক্ষেত্রবাবু ট্রামে চৌরঙ্গীর মোড় পর্য্যন্ত আসিয়া ছেলেদের জন্য অপেক্ষা করিলেন। ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—আমি কিন্তু কালীঘাট যাচ্ছি আমার বন্ধুর বাড়ী, আমি জুতে যাবো না।

ক্ষেত্রবাবু কালীঘাটের ট্রামে উঠিয়া পড়িলেন—যদুবাবু দলবল সমেত উঠিলেন। খিদিরপুরের ট্রাম হইতে নামিয়া ছেলেরা হৈ হৈ করিয়া জু'র দিকে ছুটিল। যদুবাবু জু অনেক বার দেখিয়াছেন, তিনি কি ছেলেদের দলে মিশিয়া হৈ হৈ করিবেন এখন? একটা গাছের তলায় বসিলেন, পড়িয়া দেখিলেন—গাছের নাম 'পুত্রন্‌জীর রক্সবার্জি'—জীবপুত্রিকা বৃক্ষ। এই বৃক্ষের ফলের বীজ মৃতবৎসা নারীর গলায় পরাইয়া দিলে ছেলে হইয়া মরে না। তাঁহার স্ত্রীও মৃতবৎসা। এখন ফল লইয়া গেলে কেমন হয়? বয়স অনেক হইয়া গিয়াছে। বোধ হয় সুবিধা হইবে না।......কি চমৎকার ওই ছেলেটা প্রজ্ঞাব্রত, যেমন নাম, তেমনি দেখিতে। ছেলে যদি হইতে হয়, প্রজ্ঞাব্রতের মত।

একটি ছেলের দল সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল, তাঁহাকে দেখিয়া বলিল—স্যার, আমাদের একটু দেখাবেন ?

—কি দেখাবো ?

—স্যার, অনেক পাখী জানোয়ারের নাম লেখা আছে, বুঝতে পারছি নে—একটু আসুন না স্যার—

—হ্যাঁ, আমার এখন উঠবার শক্তি নেই। তোরা নিজেরা গিয়ে দেখ্ গে যা। প্রজ্ঞাব্রত কোথায় রে ?

—অন্য দিকে গিয়েছে স্যার। দেখছি নে—যাই তবে স্যার—

যদুবাবু আপন মনে বসিয়া বসিয়া হিসাব করিলেন। সাহেব ছেলেদের টিফিনের জন্য পাঁচ টাকা দিয়াছে—ছেলে মোট ত্রিশ জন, দু-টুক্‌রা রুটি আর একটু মাখন দিলেই ছেলেপিছু—টাকা দেড় দুই খরচ। বাকি টাকা পকেটস্থ করা যাইবে। নগদ আড়াই টাকা লাভ।

ফিরিবার পথে ছেলের দল অনেকে সরিয়া পড়িল এদিক্ ওদিক্। কেহ গেল ময়দানে হকি খেলা দেখিতে, কেহ কাছাকাছি অঞ্চলে কোনো মাসী-পিসীর বাড়ী গিয়া উঠিল, যদুবাবু মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিলেন দেড় টাকার মধ্যে বাকি ছেলেদের রুটি মাখন ভাল করিয়াই চলিবে। নিউ মার্কেট হইতে নিজেই তিনখানা বড় রুটি ও কিছু মাখন কিনিলেন—মিউজিয়ম হইতে বাহির হইয়া মাঠে বসাইয়া ছেলেদের খাওয়াইয়া দিলেন।

ছেলেরা পাছে আবার ট্রামের পয়সা চাহিয়া বসে, এই ছিল যদুবাবুর ভয়। কিন্তু ছেলেরা বৈকাল বেলা মুক্তির আনন্দে কে কোথায় চলিয়া গেল। ছেলেরা অত হিসাব বোঝে না, হেড্ মাষ্টার ট্রামের পয়সা দিয়াছিলেন কি না, সে কৈফিয়ৎ কেহ লইল না। যদুবাবু একা বাসার দিকে চলিতে চলিতে সতৃষ্ণ নয়নে ধর্ম্মতলার মোড়ে গ্লোব রেষ্টুরেণ্টের দিকে চাহিলেন। চপ মামলেট ভাজার সুরুচি-ঘ্রাণ ফুটপাথের দক্ষিণ হাওয়াকে মাতাইয়াছে। পকেটে নগদ আড়াই টাকা উপরি পাওনা—বাড়ীর একঘেয়ে সেই ডাঁটা-চচ্চড়ি আর কুমড়ো ভাজা খাইতে খাইতে যৌবন চলিয়া গেল—যদি পেটে

ভাল করিয়া না খাইলাম, তবে চাকুরী করা কি জন্ত? চক্ষু বুজিলে সব অন্ধকার। ছেলে নাই, পিলে নাই, কার জন্ত খাটিয়া মরা!

রেষ্টুরেণ্টে ঢুকিয়া দুখানা ফাউল কাটলেট, দুখানা চপ, এক প্লেট কোর্ম্মা, দুখানা ঢাকাই পরেটা অর্ডার দিয়া যদুবাবু মহাখুশির সহিত আপন মনে উদরসাৎ করিতেছেন, এমন সময় ফুটপাথ দিয়া প্রজ্ঞাব্রতকে যাইতে দেখিয়া ডাকিলেন—ও প্রজ্ঞা, ওরে শোন্ শোন্—

প্রজ্ঞাব্রত হকিখেলা দেখিয়া বাড়ী যাইতেছিল, উঁকি মারিয়া বলিল—স্যার, আপনি এখানে?

—শোন্ শোন্, বোস। খাবি?

—না স্যার, আপনি খান—

—কেন, বোস না। আয়—এই বয়, দুখানা চপ্ আর দুখানা কাটলেট দাও তো—

প্রজ্ঞাব্রত দু-একবার মৃদু প্রতিবাদ করিয়া খাইতে বসিল। যদুবাবু তাহাকে জোর করিয়া এটা ওটা আরও খাওয়াইলেন। যাইবার সময়ে তাহাকে বলিলেন, একটা সিগারেট কিনে আন তো—এই নে পয়সা—

সিগারেট ধরানো হইলে দুজনে কিছুক্ষণ ধর্ম্মতলা ধরিয়া চলিলেন।

একটা গ্যাস পোষ্টের নীচে আসিয়া যদুবাবু বলিলেন—হ্যাঁ রে, তুই চাঁদা দিয়েছিলি?

—কিসের স্যার?

—এই আজ জু'তে আসবার জন্যে।

—হ্যাঁ স্যার, চার আনা।

যদুবাবু একটা সিকি বাহির করিয়া প্রজ্ঞাব্রতের হাতে দিয়া বলিলেন,—এই নে, নিয়ে যা—কাউকে বলিস নে—

প্রজ্ঞাব্রত বিস্মিত হইয়া বলিল—ও কি স্যার? জু দেখলাম, ট্রামে গেলাম, রুটি মাখন খাওয়ালেন তখন—

—তুই নিয়ে যা না। তোর অত কথার দরকার কি? কাউকে বলবি নে—

—না স্যার, আমি নেবো না—

—নে বলছি ফাজলামো করিস নে—নিয়ে নে—

প্রজ্ঞাব্রত আর দ্বিরুক্তি না করিয়া হাত পাতিয়া সিকিটি লইল।

—আমার এই গলি স্যার, যাই আমি—

—চল না, আমায় একটু এগিয়ে দিবি। বেশ লাগে তোর সঙ্গে যেতে—

প্রজ্ঞাব্রত অনিচ্ছার সহিত আরও কিছু দূরে গিয়া ওয়েলিংটন স্ট্রীটের মোড়ে আসিয়া বলিল—যান স্যার, আমি আর যাবো না—

পরদিন যদুবাবু হেড্‌মাষ্টারের কাছে আট টাকা দশ আনার এক বিল দাখিল করিয়া বিনীতভাবে জানাইলেন—দশ আনা বেশি খরচ হইয়া গিয়াছে,—ট্রামভাড়া, ছেলেদের খাওয়ানো, আনুষঙ্গিক খরচ।

হেড্‌ মাষ্টার বলিলেন—ওয়েল, এই নাও দশ আনা—

ছেলেরা কিন্তু ক্লাসে বলাবলি করিতে লাগিল, যদুবাবু তাহাদের কিছুই খাওয়ান নাই। হেড্‌ মাষ্টার কত টাকা যদুবাবুর হাতে দিয়াছিলেন, কেহ কেহ তাহাও অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা করিতে ছাড়িল না।

প্রজ্ঞাব্রত সকলকে বলিল, যদুবাবু গ্লোব রেষ্টুরেণ্টে বসিয়া মনের সাধে চপ কাটলেট খাইতেছিলেন, সে পথ দিয়া যাইবার সময় দেখিয়াছে। তাহাকে যে খাওয়াইয়াছেন, সে কথা প্রকাশ করিল না।

যদুবাবু ফোর্থ ক্লাসে তৃতীয় ঘণ্টায় পড়াইতে গিয়া দেখিলেন, ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা আছে—গ্লোব রেষ্টুরেণ্ট, চপ এক আনা, মুর্গির কাটলেট দশ পয়সা! জু হইতে ফিরিবার পথে সকলে খাইয়া যান!

যদুবাবু দেখিয়াও দেখিলেন না। টিফিনের ঘণ্টায় প্রজ্ঞাব্রতকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন—ও সব কে লিখেছে বোর্ডে? তুই কিছু বলেছিস্?

সে বলিল—না স্যার, আমি কাউকে বলিনি।

—আর কেউ দেখেছিল আমাকে, বল্লে কেউ?

—তাও স্যার আমি জানি নে—

মিঃ আলমের চোখে লেখাটি পড়িল টিফিনের পরের ঘণ্টায়। মিঃ আলম কূটবুদ্ধিসম্পন্ন লোক, জিজ্ঞাসা করিল—এসব কি?

ছেলেরা পরস্পর গা টেপাটিপি করিল। দু-একজন বইয়ের আড়ালে মুখ লুকাইয়া হাসিল।

—কি বল্ না। মণিটার!

একজন রোগা লম্বা ছেলে উঠিয়া বলিল—কি স্যার?

—এ কে লিখেছে?

—দেখিনি স্যার।

—হুঁ। কাল তোরা জু'তে গিয়েছিলি কার সঙ্গে?

—যদুবাবু ও ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে গিয়েছিলাম, তবে ক্ষেত্রবাবু কালীঘাট চলে গেলেন—যদুবাবু ছিলেন।

মিঃ আলম জেরা করিয়া সংগ্রহ করিলেন—তাহারা কি খাইয়াছিল, কত দূর ট্রামে গিয়াছিল ইত্যাদি। হেড্ মাষ্টারকে আসিয়া বলিলেন—কাল ক'টাকা দিয়েছিলেন স্যার যদুবাবুকে? ছেলেরা তো দু-টুকরো রুটি আর মাখন খেয়েছে, যাবার সময় একবারই ট্রামে গিয়েছিল, আর এসেছিল মিউজিয়াম পর্য্যন্ত। আর কোন খরচ হয় নি।

—তিন টাকা ট্রামভাড়া আর পাঁচ টাকা টিফিন—যদুবাবু আট টাকা দশ আনার বিল দিয়েছে—

—স্যার, আপনি অনুসন্ধানের ভার যদি আমার ওপর দেন, আমি প্রমাণ করবো—যদুবাবু স্কুলের টাকা চুরি করেছেন। উনি নিজে ফিরিবার পথে চপ কাট্‌লেট খেয়েছেন দোকানে বসে, ফোর্থ ক্লাসের প্রজ্ঞাব্রত দেখেছে। সে আপনার কাছে সব বলতে রাজি হয়েছে। ডেকে নিয়ে আসি তাকে যদি বলেন। যদুবাবু শিক্ষকের উপযুক্ত কাজ করেন নি, ছেলেদের খাওয়ান নি, অথচ স্কুলে বাড়তি বিল দিয়েছেন—এ একটা গুরুতর অপরাধ, আমার ধারণা, উনি এ রকম আরও কয়েক বার করেছেন—জু'তে ছেলেদের নিয়ে যাবার সময় তাই উনি সকলের আগে পা বাড়ান—ব্ল্যাকবোর্ডে ছেলেরা যা-তা লিখেছে ওঁর নামে—

হেড্ মাষ্টার হাসিয়া বলিলেন—লেট্ গো মিঃ আলম। এ বিষয়ে আর কিছু উত্থাপন করবেন না। হাজার হোলেও আমাদেরই একজন টিচার,

সহকর্ম্মী—ছেড়ে দিন ও কথা। আই ভোণ্ট্ গ্রাজ দি পুওর ফেলো এ কাটলেট অর টু—

গ্রীষ্মের ছুটির আর দেরি নাই। অন্য সব স্কুলে মর্ণিং-স্কুল আরম্ভ হইয়া গিয়াছে—কিন্তু এ স্কুলে হেড্ মাষ্টারের কাছে বহু দরবার করা সত্বেও আজও মর্ণিং-স্কুল হয় নাই। হেড্ মাষ্টারের ধারণা, মর্ণিং-স্কুল হইলে লেখাপড়া ভাল হয় না ছেলেদের। ক্লাসে ক্লাসে পাখা আছে, মর্ণিং-স্কুলের কি দরকার ?

ডেপুটেশনের উপর ডেপুটেশন হেড্ মাষ্টারের আপিসে গিয়া ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিল। অবশেষে সকলে মিঃ আলমকে গিয়া ধরিল। হেড্পণ্ডিত বলিলেন—যান মিঃ আলম, বুঝিয়ে বলুন একবারটি—

আলমের দ্বারা স্কুলের ক্ষতিজনক কোনো কার্য্য হওয়া সম্ভব নয়, সে জানাইল।

অবশেষে অন্য সব মাষ্টার জট পাকাইয়া হেডমাষ্টারের আপিসে গেল। ক্লার্কওয়েল একগুঁয়ে প্রকৃতির মানুষ, যাহা ধরিয়াছেন, তাহাই—নড়চড় হইবার যো নাই। কারো কোন কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। বরং ফল হইল, যে সব মাষ্টার দরবার করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের উপর নানারকম বেশি খাটুনির চাপ পড়িল।

ছুটির পর প্রায়ই স্কুল হইতে মাষ্টারদের চলিয়া যাইবার উপায় ছিল না। প্রশ্নপত্র লিথো করিতে হইবে, ক্লাসের ট্রানস্লেশন দেখিয়া ভুল ভ্রান্তি শুদ্ধ করিয়া তাহা হেড্মাষ্টারের টেবিলে পেশ করিতে হইবে। হেড্মাষ্টার দেখিবেন, ঠিকমত খাতা দেখা হইয়াছে কি না।

আজ হুকুম হইল, প্রত্যেক শিক্ষক প্রতি দিন প্রত্যেক ক্লাসে কি পড়াইবেন, তাহা নোট্ করিবেন, সে নোট্ আবার সাহেবের কাছে দাখিল করিতে হইবে।

হেড্মাষ্টার বলিলেন—স্কুলে পাখা আছে, মর্ণিং-স্কুল কি জন্যে ? যে সব মাষ্টারের না পোষাবে, তিনি চলে যেতে পারেন। মাই গেট্ ইজ ওপ্ন্—

গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া মাষ্টারেরা আর দিনচারেক স্কুল করিলেন। তার পর একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে হঠাৎ সার্কুলার বাহির হইল, কাল হইতেই মর্ণিং-স্কুল। ক্লার্কওয়েলের সব কাজই ওই রকম—পরের কথায় বা বুদ্ধিতে তিনি কিছুই কাজ করিবেন না—নিজের খেয়ালমত চলিবেন।

মর্ণিং-স্কুল বসিবে ছ'টায়। দূরে যে সব মাষ্টার থাকেন, তাঁহারা শেষ রাত্রে উঠিয়া রওনা না হইলে আর ছ'টায় আসিয়া হাজিরা দিতে পারেন না—তাহার উপর সাড়ে দশটায় ছুটির পর রোজ বেলা সাড়ে এগারোটা পর্য্যন্ত শিক্ষকদের লইয়া পরামর্শ-সভা বসিবে।

সভার কার্য্যপ্রণালী নিম্নোক্তরূপ :—

১। সেভেন্থ ক্লাসে কি করিয়া হাতের লেখার উন্নতি করা যায়?

২। থার্ড ক্লাসের ছেলেরা শ্রুতিলিখনে কাঁচা—কি ভাবে তাহারা শ্রুতি-লিখনে উন্নতি করিতে পারে?

৩। একজন টিচার কাল ক্লাসে বাজে গল্প করিয়াছিলেন—তাঁহার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা যায়?

হেড্‌মাষ্টার প্রথমে বলিলেন, আচ্ছা, সেভেন্থ ক্লাসের হাতে লেখা সম্বন্ধে কার কি মত?

ক্ষুৎ-পিপাসায় পীড়িত টিচারের দল মনের বিরক্তি চাপিয়া চাকুরীর খাতিরে মুখে কৃত্রিম উৎসাহ ও গভীর চিন্তার ভাব আনিয়া একে একে আলোচনায় যোগ দিল।

কাহারও ফাঁকি দিবার উপায় নাই, কেহ চুপ করিয়া উদাসীন হইয়া বসিয়া থাকিবে, তাহার যো কি? হেড্‌মাষ্টার অমনি বলিবেন—যদুবাবু, হোয়াই ইউ আর সাইলেণ্ট্?

সর্ব্বশেষে মিঃ আলমের দিকে চাহিয়া হাসিমুখে সাহেব বলিবেন—নাউ এ্যাট্ লাষ্ট লেট আস্ হিয়ার মিঃ আলম—

মিঃ আলম গম্ভীর মুখে উঠিবে। যেন 'প্রাইম মিনিষ্টার' কোনো গুরুতর বিল আলোচনা করিবার জন্ত ট্রেজারি বেঞ্চ হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মিঃ আলমের হাতে তিন পাতা লেখা কাগজ, সেভেন্থ ক্লাসের হাতের লেখা

ভাল করা সম্বন্ধে এক গুরুগম্ভীর নিবন্ধ। তাহার মধ্যে কত উদাহরণ, কত কত প্রস্তাব, কত মহাজন-বাণী উদ্ধৃত।

মিঃ আলম মাথা দুলাইয়া সতেজ উচ্চারণের সহিত গোটা নিবন্ধটা পড়িয়া গেলেন—"অন্ দি বেটারমেণ্ট্ অফ্ হ্যাণ্ডরাইটিং অফ্ সেভেন্থ ক্লাস বয়েজ"—ঝাড়া দশ মিনিট লাগিল।

টিচারদের সভা চুপ। হেড্মাষ্টার বলিলেন—মিঃ আলম একজন আদর্শ শিক্ষক। এ কথা আমি কতদিন বলেছি। মানুষের মত মানুষ একজন—কারো কিছু বলবার আছে মিঃ আলমের প্রবন্ধ সম্বন্ধে? নারাণবাবু?

বৃদ্ধ নারাণবাবু একটা কি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন।

—ওয়েল, যদুবাবু?

যদুবাবু বিনীত ভাবে জানাইলেন, তাঁহার কিছু বলিবার নাই। মিঃ আলমের প্রবন্ধের পর আর বলিবার কি থাকিতে পারে?

—ওয়েল, ক্ষেত্রবাবু?

—না স্যার—আমার কিছু বলবার নেই।

এক পর্ব্ব শেষ হইল। বেলা সাড়ে এগারটা বাজে, জ্যৈষ্ঠের রৌদ্রে রাস্তার পিচ গলিয়া গিয়াছে, অনেকে চিন্তা করিতেছেন, বাড়ী ফিরিয়া আর স্নানের জল পাওয়া যাইবে না। চৌবাচ্চায় দু-ইঞ্চি জলও থাকে না এত বেলায়। কিছু বলিবার যো নাই, সাহেব বলিবেন—মাই গেট্ ইজ ওপ্ন্—

ঠিক বারোটার সময় 'টিচার্স মিটিং' সাঙ্গ হইল।

বাহিরে পা দিয়াই যদুবাবু বলিলেন, ব্যাটা কি খোশামুদে। দেখলে তো একবার? আবার এক প্রবন্ধ লিখে এনেছে! কাজের আঁট কত?

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—একেবারে "লর্ড বেকন্—অন দি বেটারমেণ্ট অফ্ হ্যাণ্ডরাইটিং অফ্ সেভেন্থ ক্লাস বয়েজ"—হামবাগ্ কোথাকার!

যদুবাবু বলিলেন—আর এক খোশামুদে ওই নারাণবাবু—তোর কোনো কুলে কেউ নেই, সন্নিসি হয়ে যা। দরকার কি তোর খোশামুদির?

নীচের ক্লাসের একজন টিচার মেসে থাকিতেন। তিনি সামান্য মাহিনা পান, মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে সাহস পান না। তিনি কতকটা আপন মনেই

বলিলেন—কোন দিন নাইতে পারিনে—আজ মর্ণিং-স্কুল হয়ে পাঁচ দিন নাইনি—

যত্নবাবু বলিলেন—এই বলে কে! কই, তুমি তো মুখ ফুটে কথাটা বলতে পারলে না ভায়া সাহেবকে—

—আপনারা সিনিয়র টিচার রয়েছেন, কিছু বলতে পারেন না—আমি চুনো-পুঁটি—আমার সাহস কি?

—ওই তো দোষ ভায়া। ওতেই তো পেয়ে বসে। প্রোটেষ্ট্ করতে হয়—মেনে নিলেই বিপদ্—

—আপনারা প্রোটেষ্ট্ করুন গিয়ে দাদা—আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

গ্রীষ্মের ছুটি পর্য্যন্ত প্রায়ই এই রকম চলিল। গ্রীষ্মের ছুটি আসিয়া পড়িবার দেরি নাই—ছেলেরা সে দিন গান গাহিবে, আবৃত্তি করিবে। দু-একজন শিক্ষক তাহাদের তালিম দিবার ভার লইয়া স্কুলের কাজ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন।

হঠাৎ শোনা গেল, গ্রীষ্মের বন্ধের পূর্ব্বে মাষ্টারদের মাহিনা দেওয়া হইবে না। দু'মাসের বেতন একসময়ে একসঙ্গে পাওয়ার কথা। মোটেই পয়সা দেওয়া হইবে না শুনিয়া মাষ্টারদের মুখ শুকাইয়া গেল। হেড্মাষ্টারের কাছে দরবার সুরু হইল। হেড্মাষ্টার বলিলেন—আমি বা মিস্ সিবসন্ এক পয়সা নেবো না—কেউ কিছু নিচ্ছি না। মাইনে আদায় যা হয়েছিল, কর্পোরেশনের টেক্স আর বাড়ীভাড়াতে গেল।

দু-একজন শিক্ষক একটু ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন—আমরা তবে খাবো কি?

—আমি জানি না। আপনাদের না পোষায়, মাই গেট্ ইজ ওপ্‌ন্—

গ্রীষ্মের ছুটিতে প্রত্যেক মাষ্টারের উপর দু'তিনটি প্রবন্ধ লিখিয়া আনিবার ভার পড়িল। ছাত্রদের প্রতি কর্ত্তব্য, বিভিন্ন বিষয় পড়াইবার প্রণালী প্রভৃতি সম্বন্ধে। মাষ্টারদের দল মুখে কিছু বলিতে পারিলেন না। মনে মনে কেহ চটিলেন, কেহ ক্ষুব্ধ হইলেন।

যত্নবাবু বলিলেন—ওঃ, ভাত দেবার কেউ নয়, কিল মারবার গোঁসাই! মাইনের সঙ্গে খোঁজ নেই, প্রবন্ধ লিখে নিয়ে এসো—দায় পড়েছে—

ক্ষেত্রবাবু অনেক দিন পরে গ্রামের বাড়ীতে আসিলেন, সঙ্গে স্ত্রী নিভাননী ও দুই তিনটি ছেলে মেয়ে।

আজ প্রায় দু'বছর পৈতৃক ভিটাতে আসেন নাই। চারি ধারে জঙ্গল, বাড়ীঘরে গাছ গজাইয়াছে। জমিজমা, আমকাঁটালের বাগান যাহা আছে, বারো ভূতে জুটিয়া খাইতেছে। গ্রামের নাম আস্‌সিংড়ি—কয়েক ঘর গোয়ালার ব্রাহ্মণ এ গ্রামে বেশ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন গৃহস্থ, ধান, পুকুর, জমিজমা যথেষ্ট তাহাদের। অন্য কোনো ভাল ব্রাহ্মণ গ্রামে নাই, কায়স্থ আছে, কিছু গোয়ালা, জেলে, ছুতার, কর্ম্মকার এবং ষাট-সত্তর ঘর মুসলমান, এই লইয়া গ্রাম।

গ্রামে জঙ্গল খুব, বড় বড় আম কাঁটালের বাগান। ক্ষেত্রবাবুর পৈতৃক বাড়ী কোঠা, বড় বড় চার পাঁচখানা ঘর, কিন্তু মেরামত অভাবে ছাদ দিয়া জল পড়ে। বাড়ীর উঠানে বড় বড় কাঁটালগাছে অনেক কাঁটাল ফলিয়াছে, নারিকেলগাছে ডাবের কাঁদি ঝুলিতেছে—বাড়ীর সামনে পুকুর, সেখানে কর্ত্তাদের আমলে বড় বড় মাছ জাল দিয়া ধরা হইত—আজ কিছু নাই। শরিক এক জ্যাঠ্‌তুতো ভাই এতদিন সব খাইতেছিল, আজ বছর দুই হইল, সে উঠিয়া গিয়া শ্বশুরবাড়ী বাস করিতেছে।

সকালে উঠিয়া ক্ষেত্রবাবু গ্রামের প্রজাদের ডাকাইলেন। সকলে আসিয়া প্রণাম করিল এবং এতদিন পরে তিনি গ্রামে আসিয়াছেন, ইহাতে যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করিল।—বাপ পিতামহের ভিটা ছাড়িয়া বাহিরে না গেলে কি অন্ন হয় না? বাবু এখানে থাকুন, তাহারা ধানের জমি করিয়া দিবে, চলিবার সব ব্যবস্থা করিয়া দিবে। ক্ষেত্রবাবুও ভাবিলেন, সাহেবের তাঁবে থাকিয়া দিনরাত্রি দাসত্ব করার চেয়ে এ কত ভাল। 'টিচার্স মিটিং' নাই, দু-ঘণ্টা করিয়া প্রতি দিন খাতা করেক্ট করিবার হাঙ্গামা নাই, মিঃ আলমের ধূর্ত্ত চক্ষুর চাহনিতে আর ভয় খাইতে হইবে না—এই তো কত চমৎকার নাকে মুখে গুঁজিয়া স্কুলে দৌড়িবার তাড়া থাকিবে না।

নিতাননী হাসিয়া বলিল—দুধ এখানকার কি চমৎকার গো! ইটিলিতে এমন দুধ কিন্তু দেয় না গোয়ালা—

ক্ষেত্রবাবু বলেন—কোথেকে সেখানকার গোয়ালারা ভাল দুধ দেবে? তা দিতে পারে কখনো।

দিনকতক ভাল দুধের পায়েস, পিঠে খাওয়া হইল। বাড়ীতে সত্য-নারায়ণের সিন্নি দেওয়া হইল একদিন। ইতিমধ্যে আম কাঁটাল পাকিয়া উঠিল—ছেলে মেয়েরা প্রাণ পুরিয়া আম খাইল।

গ্রামের দক্ষিণে জোলের মাঠ, অনেক খেজুর পাকিয়াছে গাছে গাছে, ক্ষেত্রবাবু ছেলেমেয়েদের হাত ধরিয়া মাঠে গিয়া খেজুর কুড়াইয়া বাল্যের আনন্দ আবার উপভোগ করেন—যখন এ গ্রাম ছাড়া আর কোথাও বৃহত্তর দুনিয়ার স্থান ছিল না, এই গ্রামের আম, আমড়া, কুল, বেল খাইয়া একদিন মানুষ হইয়া উঠিয়াছিলেন, যখন এ গ্রামের মাটি ছিল পৃথিবীর জীবনের একমাত্র নোঙর, ক্ষুদ্রের মধ্যেও সে পরিধি ছিল অসীম—সে সব দিনের কথা মনে হয়।

তারপর তিনি বি-এ পাশ করিলেন, এখানে আর থাকা চলিল না, বিদেশে চাকুরী লইতে হইল। কর্ত্তারাও সব পরলোকে চলিয়া গেলেন—গ্রামের সঙ্গে সংযোগ-সূত্র ছিন্ন হইল। সন্ধ্যায় শেয়ালের ডাকে পিতৃপুরুষের ভিটে মুখরিত হইতে লাগিল। মধ্যে বার দুই এখানে আসিয়াছিলেন—সেও বছর পাঁচ-ছয় আগেকার কথা, আর আসা ঘটে নাই—পনেরো টাকা ভাড়ায় কলিকাতার গলিতে একখানা ঘর ভাড়া করিয়া থাকা, বারান্দায় ছোট্ট এতটুকু রান্নাঘর, ধোঁয়া দিলে বাড়ীতে টেকা দায়। এমন দুধ, টাটকা তরকারী চোখে দেখা যায় না। ক্ষেত্রবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবেন, কি হইলে আবার আসিয়া গ্রামে বাস করিতে পারেন। পুরানো দিনের সুখ আবার ফিরিয়া আসে যদি, ক্ষেত্রবাবু তাঁর জীবনের অনেকখানিই যে কোনো দেবতাকে দানপত্র করিয়া দিতে রাজি আছেন। ক্ষেত্রবাবু গ্রামের প্রজাদের সঙ্গে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। গ্রামে থাকিলে তাঁহার সংসার চলিবার বন্দোবস্ত

হয় কি না। সকলেই উৎসাহ দিল, ধানের জমি যাহা আছে, তাহাতে বছরের ভাতের টানাটানি হইবে না। ক্ষেত্রবাবু গ্রামেই থাকুন।

একদিন নিভাননী বলিল—আর ক'দিন আছে তোমার গো?

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—কেন?

—না, তাই বলছি—

দিন উনিশ কাটিয়াছে সবে, এখনও প্রায় এক মাস। সত্য কথা যদি স্বীকার করিতে হয়, ছুটিটা একটু বেশিই হইয়া গিয়াছে। এতদিন ছুটি না দিলেও চলিত।

নিভাননীর দিন আর কাটে না। এখানে সে কথা বলিবার মানুষ খুঁজিয়া পায় না, ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই ভড়-গিন্নী আর তার মেয়ে সরলা। আর আছে কয়েকটি গোয়ালার মেয়ে। কোনো আমোদ নাই, আহ্লাদ নাই—বন-জঙ্গলের মধ্যে দিন আর কাটিতে চায় না। তাহার উপর উনি নাকি এখানে থাকিবার ব্যবস্থা করিতেছেন, এখানে মানুষ বারো মাস থাকিলে পাগল, নয় ত ভূত হইয়া যায়। বাড়ীর পিছনে বাঁশবাগানের নীচেই মিনিট কয়েকের পথ দূরে শীর্ণকায় চুর্নী নদী, টলটলে কাচের মত জল—রোজ এই বাগানের ভিতর দিয়া স্নানে যাইবার সময় নিভাননীর ভয়। উঁচু উঁচু আমগাছে পরগাছা ঝুলিতেছে, কালপেঁচার গম্ভীর স্বরে দিন-দুপুরেও বুকের মধ্যে কেমন করে। স্নান করিতে নামিয়া কিন্তু মনে বেশ আনন্দ হয়, এত জল এবং এমন কাকের চোখের মত জল কলিকাতায় কল্পনাও করা যায় না।

বাঁশের চালা পুড়াইয়া উনুনে রান্না—কয়লা নাই, বাড়ীতে জল নাই, নিভাননীর এসব অভ্যাস নাই। কলিকাতায় রান্নাঘরের মধ্যেই কলের জলের পাইপ। এখানে মানুষ থাকে না। সময় যেখানে কাটিতে চাহে না, সে জায়গা আর যাহাই হউক, ভদ্রলোকের বাসের উপযুক্ত নয়।

ছেলেমেয়েদের এ জায়গা ভাল লাগে না। বড় ছেলে পাঁচু কেবল বলে—মা, কলকাতায় কবে যাওয়া হবে।

তাহাদের বাড়ীর সামনে ছোট্ট পার্কটাতে প্রতি বৈকালে টুনু, হাবু, রণজিৎ, হীরু, মদন সিং বলিয়া একটা শিখের ছেলে, সুরেশ, ভানু কত

ছেলে আসিয়া জোটে। পাঁচুর সঙ্গে ওদের সকলের খুব ভাব। পার্কে দোলনা টাঙানো আছে। গড়াইয়া পড়িবার লোহার ভোঙা খাটানো আছে. রোজ রোজ সেখানে কত কি খেলা, কত আমোদ-আহ্লাদ।

রণজিতের বাড়ী কাছেই প্রসাদ বড়াল লেনে। পাঁচুর সঙ্গে রণজিতের খুব বন্ধুত্ব—প্রায়ই তার বন্ধুর বাড়ী পাঁচু যাইত, রণজিতের মা খাইতে দিতেন, তারপরে রণজিতের বোন সুসি আর হিমির সঙ্গে তাহারা চুজনে বসিয়া ক্যারাম খেলিত। সুসির অদ্ভুত টিপ, সরু সরু ফর্সা আঙুল দিয়া ষ্ট্রাইকার ছটকাইয়া সামনের তক্তায় রিবাউণ্ড করাইয়া কেমন অদ্ভুত কৌশলে সে গুটি ফেলিত—পাঁচু সুসির গুণে মুগ্ধ। অমন অদ্ভুত মেয়ে সে যদি আর কোথাও দেখিয়া থাকে!

হারিয়া গেলে সুসি হাসিয়া বলে—পারলে না পাঁচু, এইবার লাল-খানা ফেলেও হেরে গেলে!

লাল ফেলিলে কি হইবে, পয়েণ্ট হইল কই? বোর্ডে যখন সাতখানা গুটি মজুত, তখন ওদিকে সুসির হাতের গুণে ষ্ট্রাইকার অসম্ভব সম্ভব করিয়া তুলিতেছে পাঁচুর বিস্মিত ও মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে। দেখিতে দেখিতে বোর্ড ফাঁকা, প্রতিপক্ষ সব গুটি পকেটে ফেলিয়াছে।

কি মজার খেলা! কি মজার দিন!

এখানে ভাল লাগে না। কি আছে এখানে? কুমোর-পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া গেঁয়ো খেলা যত সব। কথা সব বাঙালে ধরণের, এখানে আর কিছু দিন থাকিলে পাঁচু বাঙাল হইয়া উঠিবে।

নিভাননী বলে—আজ পঁচিশ দিন হোল—না?

ক্ষেত্রবাবু হাসিয়া বলেন—দিন গুণছো না কি?

—ভাল লাগছে না আর, সত্যি—

—তা বটে। আমারও তেমন ভাল লাগছে না—বসে বসে আর দিনে ঘুমিয়ে শরীর নষ্ট হোল!—একটা কথা বলবার লোক নেই—আছে ওই নন্দী মশায় আর জগহরি ঘোষ, ওরা ধান চালের দর নিয়ে কথাবার্ত্তা বলে কেবল। কাঁহাতক ওদের সঙ্গে বসে গল্প করি?

—আর ক'দিন আছে তোমার?

—তা এখনও আঠারো উনিশ দিন—কি তারও বেশি।

নিভাননী বলিল—ছেলেমেয়েদেরও আর ভাল লাগছে না—কানু আমায় বলছে, মা, আমরা কলকাতা যাবো কবে?

ক্ষেত্রবাবুও নিজের মনের ভাব দেখিয়া নিজেই অবাক্ হইলেন। যে ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুলের নাম শুনিলে গায়ের মধ্যে জ্বালা ধরে, চাকুরীর সময় যাহাকে কারাগার বলিয়া বোধ হইত—সেই স্কুলের কথা এখন যখন মনে হয়, তখন যেন সে প্রশান্ত মহাসাগরের নারিকেল দ্বীপপুঞ্জ ঘেরা পাগো-পাগো দ্বীপ, চিরবসন্ত যেখানে বিরাজমান, পক্ষি-কাকলীতে যাহার শ্যাম তীরভূমি মুখর—ইংরাজি টকি ছবিতে যাহা দেখিয়াছেন কত বার। সেই সিঁড়ির ঘর, তেতালার ছাদে মাষ্টারদের সেই বিশ্রামকক্ষ, হেড্‌মাষ্টারের আপিসের ঘণ্টাধ্বনি, মথুরা চাকরের সার্কুলার-বই লইয়া ছুটাছুটি করিবার সেই সুপরিচিত দৃশ্য—এসব কল্পনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। না, আর ভাল লাগে না, স্কুল খুলিলেই বাঁচা যায়।

নারাণবাবুর অবস্থা ইহা অপেক্ষাও খারাপ।

নারাণবাবু স্কুলের ঘরটিতে বারো মাস আছেন, কোথাও যাইবার স্থান নাই—সেই ঘর আশ্রয় করিয়া বহুদিন থাকিবার ফলে যখন টুইশানি সারিয়া নিজের ঘরটিতে ফেরেন, তখন সমস্ত মন প্রাণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া ওঠে—বাড়ী এসে বাঁচা গেল! কত কালের পিতৃপিতামহের বাসভূমি যেন সাহেবের বাথরুমের পূর্ব্বদিকের সেই এক জানালা এক দরজাওয়ালা কুঠুরিটা।

এ ছুটিতে নারাণবাবু গিয়াছিলেন তাঁহার এক দূর-সম্পর্কের ভাগ্নীর বাড়ী বরিশালে। চিরকাল কলিকাতায় কাটাইয়াছেন, বরিশালের পল্লীগ্রামে কিছু দিন থাকিয়াই তিনি হাঁপাইয়া উঠিলেন। গরীব স্কুল-মাষ্টার হইলেও নাগরিক মনোবৃত্তি তাঁর মজ্জাগত—সত্যিকার শহুরে মানুষ। এখানে সকালে উঠিয়া কেহ চা খায় না, লেখাপড়াজানা মানুষ নাই—এক বাওার মোক্তার আছে, পঞ্চানন লাহিড়ী—বয়সে নারাণবাবুর সমান, গ্রামে সেই একমাত্র

লেখাপড়াজানা লোক—হইলে হইবে কি, লোকটার কথাবার্ত্তায় বরিশালের টান তিনি ক্ষমা করিতে প্রস্তুত ছিলেন—কিন্তু সে গোঁড়া বৈষ্ণব, ধর্ম্মবাতিক-গ্রস্ত বৈষ্ণব।

তাহার কাছে গিয়া বসিতে হয়, উপায় নাই। সন্ধ্যাবেলাটা কোথায় কাটানো যায় আর।

অমনি সে আরম্ভ করিবে—গোপিনীদের ভাব সম্বন্ধে উদ্ধব দাস কি বলিতেছেন—এটা বলিয়া লই—

নারাণবাবুকে বাধ্য হইয়া শুনিতে বসিতে হয়। তিনি ধার্ম্মিক লোক নন, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের দার্শনিক অংশ ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে না তাঁর। লেস্‌লি ষ্টিফেন এবং মিলের ছাত্র তিনি। পঞ্চানন মোক্তার কথা বলিতে বলিতে যখন দু-হাত তুলিয়া 'আহা, আহা' বলে, তখন নারাণবাবু ভাবেন—এই একটা নিতান্ত অজ-মূর্খের পাল্লায় পড়ে প্রাণটা গেল দেখছি!

মনে হয় শরৎ সান্যালের কথা।

শরৎ সান্যাল অবসরপ্রাপ্ত এঞ্জিনিয়ার, নারাণবাবুর বহুদিনের বন্ধু—পাশের গলিতে এক সময় বড় বাড়ী ছিল, ছেলেরা রেস খেলিয়া বাড়ী উড়াইয়া দিয়াছে, এখন দুর্গাচরণ ডাক্তার রোডে ছোট ভাড়াটে বাড়ীতে বাস করেন, ছুটিছাটার দিনে সন্ধ্যার দিকে ধোপদোরস্ত পাঞ্জাবী গায়ে, ছড়ি হাতে প্রায়ই নারাণবাবুর ঘরে আসিয়া বসেন ও নানাবিধ উচু ধরণের কথাবার্ত্তা বলেন।

উচু ধরণের কথা নারাণবাবু পছন্দ করেন, গোপীভাবের কথা নয়।

কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা, ওয়াশিংটন-চুক্তির ভিতরের রহস্য, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলরের বক্তৃতা, [illegible] সংক্রান্ত কথা প্রভৃতি ধরণের আলোচনাকেই নারাণবাবু উচ্চ বিষয় বলিয়া থাকেন। বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত লোকে রাসলীলার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা লইয়া মাথা ঘামায় না।

পঞ্চাননবাবু নিজে ইংরাজি-শিক্ষিত নহেন, সে কালের ছাত্রবৃত্তি পাশ মোক্তার, সুতরাং ইংরাজি শিক্ষার উপর হাড়ে চটা। পশ্চিম হইতে যাহা কিছু আসিয়াছে, সব খারাপ, এদেশে যাহা ছিল, সব ভাল। কৃষ্ণদাস

কবিরাজের (পঞ্চানন মোক্তার বলেন কবিরাজ গোস্বামী) চৈতন্য-চরিতামৃত তাঁহার মতে বাংলা সাহিত্যের শেষ ভাল গ্রন্থ।

পঞ্চানন মোক্তার গদ্‌গদ কণ্ঠে বলেন—কি সব ইংরাজি বলেন আপনারা বুঝি না—কিন্তু কবিরাজ গোস্বামীর পর আর বই হয় না। বাংলায় আর বই নাই—লেখা হয় নাই তার পরে—

এরকম লোকের সঙ্গে লেশ্‌লি ষ্টিফেন ও মিলের ছাত্র নারাণবাবু কি তর্ক করিবেন।

জীবনে তিনি একজন খাঁটি দার্শনিক দেখিয়াছিলেন—অনুকূলবাবু। নিজের জন্য কখনো কিছু করেন নাই, স্কুল গড়িয়া তুলিবেন মনের মত করিয়া, ভাল শিক্ষা দিবেন তাঁহার স্কুলে, কলিকাতার মধ্যে একটি আদর্শ বিদ্যালয়ে পরিণত করিবেন স্কুলকে। ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার যত কল্পনা, যত আলোচনা—কত বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়াছেন স্কুলের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া।

অমন সাধুপুরুষ জন্মায় না।

এই সব তিলক-কণ্ঠিধারী গোপীভাবে বিভোর লোকের মেরুদণ্ডহীন ব্যক্তিত্বের তুলনায় অনুকূলবাবু একটা পুরা মানুষ। আর এই সাহেবটাও মন্দ নয়, অনুকূলবাবুর মত এও স্কুল বলিয়া পাগল। স্কুলের স্বার্থ, ছাত্রদের স্বার্থ সবচেয়ে বড় ওর কাছে। তবে অনুকূলবাবু ছিলেন খাঁটি ষ্টোইক্—আর সাহেব এপিকিউরিয়ান্—এই যা তফাৎ।

যা হোক নারাণবাবুর ভাল লাগে না, পঞ্চানন মোক্তারকে না, বরিশালের এ পাড়াগাঁ না। পঞ্চানন ছাড়া গ্রামে আরও অনেক মানুষ আছে বটে, কিন্তু তাহাদের সঙ্গে নারাণবাবুর বয়সে খাপ খায় না, নারাণবাবু ভাবেন, তারা ছেলে-ছোকরা, তাদের সঙ্গে কি মিশিবেন। তা ছাড়া যাচিয়া তিনি কাহারো সঙ্গে দেখা করিতে যাইবেন না। [illegible] লোক, একটু দাম্ভিক ধরণেরও আছেন।

একদিন গ্রামের বাঁশবনে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে খুব বর্ষা নামিয়া বাঁশঝাড়ের রং কালো দেখাইতেছে। চারি দিক্ মেঘে ঘিরিয়াছে গ্রামখানিকে, টানা-সারের ঘন জঙ্গলে বৃষ্টির ধারার শব্দ। গ্রামে এক জায়গায় গান-বাজনার

মজলিস হইবে, খুব আগ্রহ লইয়া নারাণবাবু সেখানে গিয়া দেখিলেন—পঞ্চানন মোক্তার; দীনবন্ধু সেকরা গলায় ত্রিকণ্ঠি তুলসীর মালা ঝুলাইয়া মজলিস জুড়িয়া বসিয়া। আরও অনেক উঁহাদের শিষ্য-প্রশিষ্যরা বসিয়া আছে—কিছুক্ষণ পরে কীর্ত্তন সুরু হইল, নারাণবাবু চলিয়া আসিলেন—কীর্ত্তন তাঁহার ভাল লাগে না।

কীর্ত্তন কেন তাঁহার ভাল লাগে না, ইহা লইয়া পঞ্চানন মোক্তারের সঙ্গে তর্ক করিয়া একদিন তিনি হার মানিয়াছেন। পঞ্চানন মোক্তার বলে, কীর্ত্তন বাংলার নিজস্ব জিনিষ, সঙ্গীতে বাংলার প্রধান দান—এমন মধুর রসের জিনিষ যে উপভোগ করিতে না শিখিল, তার শ্রবণেন্দ্রিয়ই মিথ্যা।

নারাণবাবু বলেন, তিনি বোঝেন না, তাঁর ভাল লাগে না—মিটিয়া গেল। যে ভাল অত তর্ক করিয়া বুঝাইতে হয়, তার মধ্যে তিনি নাই। 'বাংলাদেশের দান, বাংলাদেশের দান' বলিয়া চেঁচাইলে কি হইবে—বাংলাদেশ, বাংলাদেশ —তিনি নিজে, নিজে। ইহার চেয়ে কথা আছে? মিটিয়া গেল।

সে দিন সেখান হইতে বাহির হইয়া পল্লীগ্রামের উপর বিতৃষ্ণা হইয়া গেল নারাণবাবুর। কি বিশ্রী জায়গা এ সব, বৃষ্টির পরে বাঁশবনের চেহারা দেখিলে মনে হয়—কোথায় যেন পড়িয়া আছেন। এমন জায়গায় কি মানুষ থাকে! কলিকাতার ফুটপাতে কোথাও এতটুকু ধূলাকাদা নাই—কি বিশাল জনস্রোত ছুটিয়াছে নিজের নিজের কাজে, সুইচ টিপিলেই আলো—কল টিপিলেই জল। সন্ধ্যার সময় যখন চারি দিকে বাড়ীতে আলো জ্বলিয়া ওঠে, 'বঙ্গবাণী'-প্রেসে ফ্ল্যাট মেসিনের শব্দ হয়, ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট দিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া ট্রাম চলে, তখন এক অদ্ভুত রহস্যের ভাবে মন পূর্ণ হইয়া যায়; মনে হয়, চিরজীবন এ কর্ম্মব্যস্ত জনস্রোতের মধ্যে কাটাইলেও ক্লান্তি আসে না, প্রাণ নবীন হয়, এতটুকু সময়ের জন্য অবসাদ আসে না মনে।

এখান হইতে চলিয়া যাইতেন, কিন্তু ভাগ্নী যাইতে দেয় না, জোর করিয়াও যাইতে মন সরে না।

জ্যোতির্বিনোদ মহাশয়ও বাড়ী গিয়া খুব শান্তিতে নাই। তাঁহার বাড়ী

নোয়াখালি জেলায়। তিনি বৎসরে এই একবার বাড়ী আসেন, বাড়ীতে স্ত্রীপুত্র সবাই আছে। দু'তিন ভাই, খুব বড় পরিবার—এমন কিছু বেশি মাহিনা পান না, যাহাতে স্ত্রীপুত্র লইয়া কলিকাতায় থাকিতে পারেন। বাড়ীতে আসিয়াই জ্যোতির্ব্বিনোদ এবার এক মোকদ্দমায় পড়িয়া গেলেন, জমিজমা সংক্রান্ত শরিকী মোকদ্দমা। তাহার পর হইল বড় ছেলেটির টাইফয়েড, সে সতেরো দিন ভুগিয়া এবং পয়সা খরচ করাইয়া ঠেলিয়া উঠিল তো স্ত্রী পা পিছ্লাইয়া হাঁটু ভাঙিয়া শয্যাগত হইয়া পড়িল।

এই রকম নানা মুস্কিলে জ্যোতির্ব্বিনোদ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। এদিকে কলিকাতায় থাকিলে লোকের হাত দেখিয়া, ঠিকুজী কুষ্ঠী তৈরী করিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জনও হয়—এখানে সে উপার্জ্জন নাই—শুধু খরচ আর খরচ।

কলিকাতায় একরকম থাকেন ভাল, একা ঘরে একা থাকেন, কোনো গোলমাল নাই। সাহেবের দাপট সহ্য করিয়া থাকিতে পারিলে আর কোনো হাঙ্গামা নাই। নিজে যা খুশি,দুটি রান্না করিলেন, অভাব অভিযোগ হইলে নারাণবাবুর কাছে টাকাটা সিকিটা ধার করিয়া দিন চলিয়া যায়। বাড়ীর এত ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হয় না। যে চিরকাল একা কাটাইয়া আসিয়াছে—তাহার পক্ষে এসব বড় বোঝা বলিয়া মনে হয়।

ছুটি ফুরাইলে যেন বাঁচা যায়।

যদুবাবু ছিলেন কলিকাতায়, একটা মাত্র টুইশানি সন্ধ্যার সময়—অন্য অন্য টুইশানির ছাত্র কলিকাতার বাহিরে গিয়াছে। দিবানিদ্রা হইতে উঠিয়া বেলা পাঁচটার সময় চা খাইয়া তিনি টুইশানিতে যান। সময় কাটাইবার ওই একমাত্র উপায়। পথে এক কবিরাজ বন্ধুর ওখানে বসিয়া কিছু ক্ষণ গল্পগুজব করেন। স্কুল-মাষ্টারদের জগৎ সংকীর্ণ, বৃহত্তর কলিকাতা শহরে চেনেন কেবল টুইশানির ছাত্র ও তাহাদের অভিভাবকদের, কিংবা স্কুল-কমিটির দু-একজন উকিল কিংবা ডাক্তারকে। তাঁহাদের বাড়ীতেও মাঝে মাঝে যদুবাবু গিয়া থাকেন, কমিটির মেম্বারদের তোয়াজ করা ভাল—কি জানি কখন কি ঘটে।

একঘেয়ে ভাবে সময় আর কাটিতে চায় না, দিবানিদ্রার অভ্যাস ক্রমশঃ

পাকা হইয়া আসিতেছে। স্কুলবাড়ীর সামনে দিয়া আসিবার সময় চাহিয়া দেখেন, সাহেবের ঘরে আলো জ্বলিতেছে কি না। সাহেব দার্জ্জিলিং বেড়াইতে গিয়াছে মেম সিবসন্‌কে লইয়া—ছুটি ফুরাইবার আগের দিন বোধ হয় ফিরিবে।

অবশেষে দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশ ফুরাইল।

সব মাষ্টার একত্র হইলেন।

যদুবাবু বলিলেন—এই যে জ্যোতির্ব্বিনোদ মশায়, নমস্কার! বেশ ভাল ছিলেন? কবে এলেন?

হেড্‌পণ্ডিত যদুবাবুর সঙ্গে কোলাকুলি করিয়া বলিলেন—ভাল যদু? এখানেই ছিলে?

সকলে মিলিয়া বৃদ্ধ নারাণবাবুর পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিলেন। নারাণবাবুর স্বাস্থ্য ভাল হইয়া গিয়াছে। যেখানে গিয়াছিলেন, সেখানে দুধ ঘি, মাছ মাংস সস্তা, খাওয়া দাওয়া এখানকার চেয়ে ভাল অনেক, এখানে হাত পুড়াইয়া ভাতে-ভাত রাঁধিয়া খাইয়া থাকিতে হয়। এ বয়সে সেবাযত্ন পাওয়া আবশ্যক—সকলে এসব কথা বলিয়া নারাণবাবুকে আপ্যায়িত করিল।

মাষ্টারদের মধ্যে পরস্পর প্রীতি ও আত্মীয়তার বন্ধন স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়াছে দীর্ঘদিন পরস্পর অদর্শনের পর—হিংসা বা মনোমালিন্যের চিহ্নও নাই। এমন কি, মিঃ আলমকে দেখিয়াও যেন সকলে খুশি হইল।

হেড্‌মাষ্টার বলিলেন—ওয়েল-কাম জেণ্টল্‌মেন—আশা করি, আপনারা সব ভাল ছিলেন। এবার হাফ ইয়ারলি পরীক্ষা সামনে, সকলে তৈরি হোন, প্রশ্নপত্র তৈরি করুন। আজই সার্কুলার বার হবে।

আলম নিজের দেশ হইতে হেড্‌ মাষ্টারের জন্য প্রায় দু-ডজন মুর্গির ডিম একটা টিনের কৌটা ভরিয়া আনিয়াছে। সিবসন্‌ ডিম পাইয়া খুব খুশি।

—ও, মিঃ আলম, ইট ইজ সো গুড্‌ অফ ইউ!…সাচ্‌ নাইস্‌ এগ্‌স্‌ এ্যাণ্ড সো ফ্রেশ্‌।

কিন্তু পরক্ষণেই সাহেব ও মেম দু'জনকেই আশ্চর্য্য করিয়া মিঃ আলম কাগজ-জড়ানো কি একটা বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিল।

মেম বলিল—কি ওটা ?

সাহেব বলিয়া উঠিলেন—গুড হেভ্‌ন্স্‌! সিওরলি ডাট্‌ ইজ নট্‌ এ শোলডার অফ্‌ মাটন্‌ ?

মিঃ আলম মৃদু হাসিয়া বলিল—ইয়েস স্তার, ইট্‌ ইজ্‌ স্তার! এ লিট্‌ল শোল্‌ডার অফ্‌ মাটন —ক্রম মাই হোম স্তার—

বিস্মিত ও আনন্দিত মিস্‌ সিবসন্‌ বলিল—থ্যাঙ্ক্‌স্‌ অ-ফুলি মিঃ আলম্‌ !

যদুবাবু টিচারদের ঘরে আড়ালে বলিলেন—ঢের ঢের খোশামুদে দেখেছি বাবা, কিন্তু এ দেখছি সকলের ওপর টেক্কা দিলে—আবার বাড়ী থেকে বয়ে ভেড়ার দাপ্‌না এনেছে—

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—বাড়ী থেকে না ছাই ! আপনিও যেমন, ওর বাড়ীতে একেবারে দলে দলে ভেড়া চরছে। ক্ষেপেছেন আপনি ? ওসব চাল দেখানো আমরা বুঝি নে ? মিউনিসিপ্যাল মার্কেট থেকে কিনে এনেছে মশাই।

ছেলেরা ক্লাসে ক্লাসে প্রণাম করিল মাষ্টারদের। আজ বেশি পড়াশুনা নাই, সকাল সকাল ছুটি হইয়া গেলে সকলে মিলিয়া পুরানো চায়ের দোকানে চা পান করিতে গেলেন। দোকানী তাঁহাদের দেখিয়া লাফাইয়া উঠিল—আসুন বাবুরা, আসুন—ভাল ছিলেন সব ? আজ স্কুল খুললো বুঝি ? ওরে, বাবুদের চা দে। আবার সেই পুরানো ঘরে বসিয়া বহুদিন পরে পুরানো সঙ্গীদের সঙ্গে চা পান। সকলেরই খুব ভাল লাগে।

যদুবাবু বলেন—নারাণ দা, গল্প করুন সে দেশের।

—আরে রামো—সে আবার দেশ ! মোটে মন টেকে না। দুধ ঘি খেতে পেলেই কি হোল ! মানুষের মন নিয়ে হোল ব্যাপার—মন যেখানে টেকে না, সে দেশ আবার দেশ !

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—যা বলেছেন দাদা। গেলাম পৈতৃক বাড়ীতে, ভাবলাম, অনেক দিন পরে এলাম, বেশ থাকবো। কিন্তু মশাই, দুদিন যেতে না যেতে দেখি আর সেখানে মন টিকছে না।

—কলকাতার মতন জায়গা আর কোথাও নেই রে ভাই !

—খুব সত্যি কথা।

—মানুষের মুখ যেখানে দেখা যায়, দুটো বন্ধুর সঙ্গে গল্প করে সুখ যেখানে, খাই না-খাই, সেখানে পড়ে থাকি।

নারাণবাবু অনেকদিন পরে চুনিদের বাড়ী পড়াইতে গেলেন।

চুনিরা দেওঘর না কোথায় গিয়াছিল, বেশ মোটাসোটা হইয়া ফিরিয়াছে। অনেকদিন পরে চুনির সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াতে নারাণবাবু বড় আনন্দ পাইলেন।

চুনি আসিয়া প্রণাম করিল। নারাণবাবু প্রথম দিনটা তাহাকে পড়াইলেন না, বরিশালে যে গ্রামে গিয়াছিলেন, সে গ্রামের গল্প করিলেন, পঞ্চানন মোক্তারের কথা বলিলেন—চুনি তাঁহার কাছে দেওঘরের গল্প করিল।

নারাণবাবু বলিলেন—পান্না কোথায় রে?

—সে স্যার, মাসীমার বাড়ী গিয়েছে কালীঘাটে, কাল আসবে। মাসীমার বড় ছেলের পৈতে কি না—

—তুই যাসনি যে?

—স্যার, আজ প্রথম দিনটা আপনি আসবেন, রাত্রে যাবো।

উত্তর শুনিয়া নারাণবাবু আহ্লাদে আটখানা হইয়া গেলেন। নিজের ছেলেপিলে নাই, পরের ছেলেকে মানুষ করা, তাহাদের নিজের সন্তানের মত দেখিয়া অপত্যস্নেহের ক্ষুধা নিবারণ করা যাহাদের অদৃষ্টলিপি—তাহাদের এরকম উত্তরে খুশি হইবার কথা।

চুনি বলিল—চা খাবেন স্যার? আমি—

নারাণবাবু ভাবেন—নিজের নাই, তাই কি, আমার ছেলেমেয়ে এই ওয়েলেস্‌লি অঞ্চলে সর্ব্বত্র ছড়ানো—আমার ভাবনা কি? একটা করে টাকা যদি দেয় প্রত্যেকে, বুড়ো বয়সে আমার ভাবনা কি?

—স্যার, আজ পড়বো না।

—বেশ, গল্প শোন—এই বরিশালের গাঁয়ে—

—না স্যার, একটা ভূতের গল্প করুন—

—ভূত-টুত সব মিথ্যে। ও সব নিয়ে মাথা ঘামায়নে ছেলেবেলা থেকে

—কিন্তু স্যার, কুণ্ডাতে একটা বাড়ী আছে—

—কোথায়?

—ফুণ্ডা—দেওঘরের কাছে স্যার। সেখানে একটা বাড়ীতে ভূতের উপদ্রব ব'লে কেউ ভাড়া নেয় না। সত্যি, আমরা জানি স্যার।

নারাণবাবু আর এক সমস্যায় পড়িলেন। মিথ্যা ভয় এই বালকের মন হইতে কি করিয়া তাড়ানো যায়? নানা কুসংস্কার বালকদের মনে শিকড় গাড়িবার সুযোগ পায় শুধু অভিভাবকের দোষে—তিনি শিক্ষক, তাঁর কর্ত্তব্য, বালকদের মন হইতে সে সমস্ত কুসংস্কার উচ্ছেদ করা।

নারাণবাবু নিজের নোট-বইয়ে লিখিয়া লইলেন। সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করা আবশ্যক, এ বিষয়ে কি করা যায়।

চুনির মা আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বলিলেন—বলি ও দিদি, মাষ্টারকে বলো না—ছেলে যে মোটে বই হাতে করতে চায় না। দেওঘরে গিয়ে কেবল বেড়িয়ে আর খেলে বেড়াবে—তার কি করবেন উনি?

নারাণবাবু বলিলেন—বৌমা, চুনি ছেলেমানুষ, একদিনে দুদিনে ও স্বভাব ওর যাবে না। আমি ওকে বিশেষ স্নেহ করি, সে দিকে আমার যথেষ্ট নজর আছে—আপনি ভাববেন না—

চুনির মা বলিলেন—ও দিদি, বলো যে, পরীক্ষা সামনে আসছে, চুনিকে দু'বেলা পড়াতে হবে। এক মাস দেড় মাস তো বসিয়ে মাইনে দিয়েছি—এখন মাষ্টার যেন দুবেলা আসে—

নারাণবাবু মেয়েমানুষের কাছে কি প্রতিবাদ করিবেন? ন্যায্য পড়াইয়া তাই এখানে মাহিনা আদায় করিতে গায়ের রক্ত জল হইয়া যায়—ছুটির মাসে বসাইয়া কে তাঁহাকে মাহিনা দিল? ছুটির আগের মাসের মাহিনা এখনও বাকী।

মুখে বলিলেন—বৌমা, সকালে আজকাল সময় বেশি পাওয়া যায় না। আমারও নিজের একটু কাজ আছে। আচ্ছা, তা বরং দেখবো—

—দেখাদেখি চলবে না বলে দাও দিদি। আসতেই হবে—না পারেন, আমরা অন্য মাষ্টার দেখবো—ওই তো সে দিন পাশের মেসের ছেলে তিনটে পাশের পড়া পড়ছে—বলছিল, আমায় দশ টাকা দেবেন, দুবেলা পড়াবো—

এই সময় চুনি মাকে ধমক দিয়া বলিল—যাও না এখান থেকে, তোমার আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিকৃনেস কাটতে হবে না—

নারাণবাবু বলিলেন—ছিঃ, মাকে অমন কথা বলতে আছে ?

মনে মনে কিন্তু খুশি হইলেন।

চুনি বলিল—স্যার, আপনি মার কথা শুনবেন না। দুবেলা আপনি পড়ালেও আমি পড়বো না—আমার দুবেলা পড়তে ইচ্ছে করে না—

নারাণবাবুর আনন্দ অনেকখানি উবিয়া গেল। তাঁহার অসুবিধা দেখিয়া তাহা হইলে চুনি কথা বলে নাই, সে দেখিয়াছে নিজের সুবিধা। পাছে নারাণবাবু স্বীকার করিলে দুবেলা পড়িতে হয়, তাই সে মাকে ধমক দিয়াছে হয় তো।

বাড়ীতে ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহার ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুটি তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

—কি নারাণবাবু, কবে ফিরলেন ?

—আজ দিন তিনেক। ভাল সব ? বসুন, বসুন শরৎবাবু—

মনের মতন সঙ্গী পাইয়াছেন তিনি। উঃ—কোথায় বরিশালের অজ-পাড়াগাঁয়ের পঞ্চানন মোক্তার, আর কোথায় তাঁহার এই বন্ধু শরৎ সান্যাল।

দুজনে যেমন একত্র হইয়াছেন, অমনি উঁচু বিষয়ের আলোচনা সুরু। এই জন্যই কলিকাতা এত ভাল লাগে। এ সব লইয়া কথা বলিবার লোক কি বাংলাদেশের অজ-পাড়াগাঁয়ে মিলিবে ?

নারাণবাবুর বন্ধু বলিলেন—ভাল কথা দাদা,—আপনাকে দেখাবো বলে রেখে দিয়েছি।

—কি ?

—রিডার্স ডাইজেষ্ট-এ একটা আর্টিকল্ বেরিয়েছে বর্ত্তমান চায়নার ব্যাপার নিয়ে। কাল এনে দেখাবো—

—আচ্ছা, কাল আনবেন। কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ-বাণী স্মরণ আছে তো ওয়াশিংটন চুক্তি সম্বন্ধে ?

—আপনার ও কথা টেকে না। রামানন্দবাবুর মন্তব্য পড়ে দেখবেন মাসের মডার্ণ রিভিউ-এ।

—আলবৎ ঠেকে। আমি কারো কথা মানিনে—

এ কথাটা নারাণবাবু বলিলেন একটা খাঁটি ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল আলোচনা জমাইয়া তুলিবার জন্ত। তর্ক না হইলে আলোচনা জমে না।

কলিকাতা না হইলে এমন মনের খোরাক কোথায় জোটে?

দুই বন্ধুতে মিলিয়া মনের খেদ মিটাইয়া রাত এগারোটা পর্য্যন্ত ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল আলোচনা চলিল। দুই জনেই সমান তার্কিক। কোনো কথারই মীমাংসা হইল না।—তা না হউক। মীমাংসার জন্ত কেহ তর্ক করে না। তর্কের খাতিরেই তর্ক করিতে হয়। আফিমের নেশার মত তর্কের নেশাও একবার পাইয়া বসিলে আর ছাড়িতে চায় না।

নারাণবাবু বলিলেন—আজ একটু যোগবাশিষ্ঠ পড়া হোল না—

—তা বেশ ত, পড়ুন না। আরও রাত হোক—

অনেক রাত্রে নারাণবাবুর বন্ধু রায়বাহাদুর শরৎ সান্তাল বিদায় গ্রহণ করিলে নারাণবাবু রান্না চড়াইলেন। মনে এত আনন্দ, ও-বেলার বাসি পুঁটী মাছ ভাজা ছিল, তাই দিয়া ঝোল চড়াইলেন আর ভাত—আর কিছু না। মনের আনন্দই মানুষকে তাজা রাখে, খাইয়া মানুষ বাঁচে না শুধু।

খাওয়া শেষ হইলে সাহেবের ঘরের দিকে উঁকি মারিয়া দেখিলেন, সাহেবের টেবিলে আলো জ্বলিতেছে, অত রাত্রে সাহেব লেখাপড়া করিতেছেন নাকি? নারাণবাবুর ইচ্ছা হইল, ঘরে ঢুকিয়া দেখেন—সাহেব কি পড়িতেছেন।

সাহেব বলিলেন—কাম ইন্—

নারাণবাবু বিনীত হাস্তের সহিত ঘরে ঢুকিলেন।

—ইয়েস্?

—না, এমনি দেখতে এলাম—আপনি কি পড়ছেন।

—আমি আপিসের কাজ করছিলাম। বোসো।

—স্তার, কলকাতার মত জায়গা নেই।

—আমাদের মত লোক অন্ত জায়গায় গিয়ে থাকতে পারে না। আমার এক ভাই চায়নাতে আছে, মিশনারি। ক্যাণ্টন থেকে নদীপথে যেতে হয়—

অনেক দূরে। আগে সে ব্রিটিশ গানবোটে মেডিক্যাল অফিসার ছিল, এখন মিশনারি হয়েছে। সে কিন্তু চীনদেশের একটা অজ-পাড়াগাঁয়ে মিশনে থাকে। আমি একবার গিয়াছিলাম সেখানে—গিয়ে আমার মন হাঁপিয়ে উঠলো।

—আমিও স্যার, বরিশালে গিয়েছিলাম ছুটিতে, আমারও মন টেঁকে না।

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, স্কুলটাকে আরও ভাল করতে হবে স্যার—

—আমিও তাই ভাবছি। একটা বিজ্ঞাপন দেবো কাগজে, আরও ছেলে হোক—

দুজনে বসিয়া স্কুলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হইল।

নারাণবাবু বিদায় লইয়া শয়নের জন্য গেলেন।

•

শ্রাবণ মাসের দিকে স্কুলের কাজ ভয়ানক বাড়িল।

এই সময় একজন নতুন মাষ্টার স্কুলে নেওয়া হইল—বেশি বয়স নয়, ত্রিশের মধ্যে। লোকটি কবিতা লেখে, বড় বড় কথা লেখে, অবস্থাও বোধ হয় ভাল। কারণ, সাধারণ স্কুল-মাষ্টারদের অপেক্ষা ভাল সাজগোজ করিয়া স্কুলে আসে, বেশির ভাগ আপন মনে বসিয়া থাকে, কাহারও সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে না। ফট্ ফট্ করিয়া ইংরাজি বলে যখন তখন। নাম, রামেন্দুভূষণ দত্তগুপ্ত—বাড়ী নৈহাটীর কাছে কি একটা জায়গায়।

যদুবাবু চায়ের দোকানে বলিলেন—ওহে, এ নবাবটি কে এল হে? নর-লোকের সঙ্গে বাক্যালাপ করে না যে—

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—করার উপযুক্ত মনে করলেই করবে—

নারাণবাবু চুপ করিয়া ছিলেন। যদুবাবু বলিলেন—কি দাদা! চুপ করে আছেন যে?

—কি বলি বলো? কি রকম লোক, কিছু জানি নে তা।

—কি রকম বলে মনে হয়? বেজায় গুমুরে।

—তা হোতে পারে। তবে ছেলেমানুষ, শাইও হোতে পারে—

—শাই না ছাই কারো সঙ্গে কথা বলে না, টিচার্স-রুমে একলাটি বসে কি যেন ভাবে—

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—লোকটা কবি—তাই বোধ হয় আপন মনে ভাবে—যদুবাবু কাহারও প্রশংসা সহ্য করিতে পারেন না, তিনি বলিলেন—হ্যাঃ, কবি একেবারে রবি ঠাকুর! ডেঁপো কোথাকার—

সে দিন টিফিনের পর কিছুক্ষণ ক্লাসে নূতন শিক্ষক নাই। দশ মিনিট কাটিয়া গেল, তখনও তাঁহার দেখা নাই।

হেড মাষ্টার কটমট দৃষ্টিতে ক্লাসের শূন্য চেয়ারের দিকে চাহিয়া বলিলেন—কার ক্লাস?

মনিটার দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—নিউ টিচার স্যার—

হেড্ মাষ্টার চলিয়া গেলেন।

অল্পক্ষণ পরে নতুন মাষ্টার আসিয়া বসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মথুরা চাকর আসিয়া একটা স্লিপ দিল তাঁর হাতে, হেড্ মাষ্টার আপিসে ডাকিয়াছেন।

নতুন মাষ্টার উঠিয়া আপিসে গেলেন।

—আমাকে ডেকেছেন স্যার?

—হ্যাঁ। আপনি ক্লাসে ছিলেন না?

—আমি ক্লাস থেকেই আসছি—

—দশ মিনিট পর্য্যন্ত আপনি ক্লাসে ছিলেন না—

—আমি দুঃখিত। চা খেতে গিয়ে একটু দেরি হয়ে গেল—

—কোথায় চা খেতে গিয়েছিলেন? আমায় না বলে বাইরে যাবেন না।

—কেন স্যার?

হেড্ মাষ্টার ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া নতুন মাষ্টারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—আমার স্কুলের এই নিয়ম—

নতুন মাষ্টার কিছু না বলিয়া ক্লাসে গিয়া পড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার হেড্ মাষ্টারের আপিসে আসিয়া বলিলেন—স্যার, একটা কথা—

—কি?

—আমি স্কুলের একজন টিচার, ছাত্র নই—হেড্ মাষ্টারের কাছে অনুমতি নিয়ে স্কুলের ফটকের বাইরে যেতে হয় ছাত্রদের, টিচারদের নয়। আমার দেরি হয়েছিল ফিরতে, সে জন্তে আমি দুঃখিত। কিন্তু আপনাকে না বলে যাওয়ার জন্তে আপনি অনুযোগ করলেন—এটা ঠিক করেছেন বলে মনে করি না।

হেড্ মাষ্টারের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে নতুন টিচার গট্‌গট্ করিয়া ক্লাসে চলিয়া গেলেন। দোর্দণ্ডপ্রতাপ ক্লার্কওয়েল ত অবাক্, তাঁহার অধীনস্থ কোন মাষ্টার যে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া একথা বলিতে পারে, তাহা তাঁহার কল্পনার অতীত। তিনি তখনই মিঃ আলমকে ডাকিলেন।

—ইয়েস্ স্যার ?

—নতুন টিচার বেশ ভাল পড়ায় ?

—জানি না স্যার। বলেন তো দৃষ্টি রাখি।

—রাখো।

—কি রকম একটু অসামাজিক ধরণের—

—শুনলাম নাকি কবি। বাংলার কবিতা পড়ো তোমরা,—পড়েছ কি রকম কবিতা লেখে ?

মিঃ আলম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাত কড়িকাঠের দিকে উঠাইয়া থিয়েটারি ভঙ্গি করিলেন।

তারপর সুর নীচু করিয়া বলিলেন—কিসের কবি ! বাংলা দেশে সবাই কবিতা লেখে আজকাল। কবি !

—তুমি বাংলা কবিতা পড়ো মিঃ আলম ?

—পড়ি বৈ কি স্যার।

আলমের একথা সত্য নয়, বাংলা সাহিত্যের কোনো খবর কোনো দিনও তিনি রাখেন না।

মিঃ আলমের সঙ্গে একদিন নতুন মাষ্টারের ঠোকাঠুকি বাধিল।

ব্যাপারটা খুব সামান্ত বিষয় অবলম্বন করিয়া। ক্লাসে কি একটা পরীক্ষার কাগজ নতুন মাষ্টার নম্বর দিয়া ছেলেদের নিকট ফেরৎ দিয়াছেন। মিঃ আলম

সে ক্লাসে পড়াইতে গিয়া সামনেই বেঞ্চির উপর একটি ছেলের পরীক্ষার খাতা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কিসের খাতা রে ?

ছেলেটি বলিল—এবারকার উইক্‌লি এক্সারসাইজের খাতা স্তার,—নতুন টিচার দেখে ফেরৎ দিয়েছেন—

—কি সাবজেক্ট ?

—হিষ্ট্রি—

—দেখি খাতাখানা।

মিঃ আলম খাতাখানা লইয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া বলিলেন—নম্বর দেওয়া সুবিধে হয়নি।

—কেন স্তার ?

—এর নাম কি মার্ক দেওয়া ! এ আনাড়ির মার্ক দেওয়া। এই খাতায় তুমি ষাট নম্বর কখনো পাও না—আমার হাতে চল্লিশের বেশি নম্বর উঠতো না।

নতুন টিচারের কাছে ছেলেরা কথাটা অন্য ভাবে ঘুরাইয়া বলিল।

—স্তার, আপনার হাতে বড় নম্বর ওঠে—

—কেন রে ?

—স্তার, ওই সতীশকে ষাট দিয়েছেন, ও চল্লিশের বেশি পায় না।

—কে বলেছে তোকে ?

—মিঃ আলম বলে গেলেন স্তার।

—কি বল্লেন ?

—বল্লেন, এ আনাড়ির মার্ক দেওয়া হয়েছে।

নতুন টিচার তখনই গিয়া হেড্‌মাষ্টারের আপিসে মিঃ আলমকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন। হেড মাষ্টার নাই, ক্লাসে পড়াইতে গিয়াছেন। বলিলেন—আপনার সঙ্গে একটা কথা—এক মিনিট—

—কি বলুন—

আপনি কি ফোর্থ ক্লাসে আমার খাতা দেখা সম্বন্ধে কিছু বলেছিলেন ?

—কেন বলুন তো ?

—না, তাই বলছি। ছেলেরা বলছিল, আপনি খাতা দেখে বলেছেন যে, খাতা দেখা হয়নি।

হ্যাঁ—তা—না সে কথা ঠিক না—তবে হ্যাঁ, একটু বেশি নম্বর বলেই আমার মনে হল কিনা—

—খুব ভাল কথা। আপনি অভিজ্ঞ টিচার, আমার ভুল ধরবার সম্পূর্ণ অধিকারী। আমায় দয়া করে যদি খাতা দেখাটা সম্বন্ধে একটু বলে-টলে দেন—আমার অনেক ভুল সংশোধন হতে পারে। আমরা আনাড়ি কিনা আবার এ বিষয়ে!

আলমের মুখ লাল হইয়া উঠিল। বলিলেন, তা আমার যা মনে হয়েছে, তাই বলেছি। আপনার নম্বর দেওয়াটা একটু বেশি বলেই মনে হয়েছিল—

—আমি মোটেই তার প্রতিবাদ করছি না। আমি কেবল বলতে চাই, ক্লাসে ছেলেদের সামনে মন্তব্য না করে আমাকে আড়ালে ডেকে বল্লেই ভাল হোত।

ন্যায্য কথা। এ কথার উপর কোনো কথা চলে না। মিঃ আলমের চুপ করিয়া থাকা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে হেড্‌মাষ্টারকে একা পাইয়া মিঃ আলম সাতখানা করিয়া তাঁহার কাছে লাগাইলেন।

—নতুন টিচারকে খাতা দেখতে দেবেন না স্যার—

—নতুন টিচারকে? কেন মিঃ আলম?

—উনি খাতা মনোযোগ দিয়ে দেখেন না।

—দেখেছিলে নাকি কোনো খাতা?

—হ্যাঁ স্যার। ফোর্থ ক্লাসের সতীশকে উনি ষাট নম্বর দিয়েছেন যে খাতায়, তাতে চল্লিশের বেশি নম্বর ওঠে না। ভুল কাটেনগুলি সব জায়গায়।

এই কথাটার মধ্যে মুস্কিল আছে। সব ভুল নিখুঁতভাবে কাটিয়া কোনো মাষ্টারই খাতা দেখেন না—স্বয়ং মিঃ আলমও না। এখানে মিঃ আলম নতুন টিচারের উপর বেশ এক চাল চালিলেন। হেড্‌ মাষ্টার খাতা চাহিয়া পাঠাইয়া সত্যই দেখিলেন, প্রত্যেক পাতায় এক আধটা ভুল রহিয়া গিয়াছে, যাহা কাটা হয় নাই। নতুন মাষ্টারের ডাক পড়িল ছুটির পর।

হেড্‌মাষ্টার বলিলেন—ফোর্থ ক্লাসের হিষ্ট্রির খাতা দেখেছিলেন আপনি?

—হ্যাঁ স্যার—

—খাতা ভাল করে দেখেননি তো। সব ভুলে লাল দাগ দেননি—

—বেশির ভাগ দিয়েছি স্যার। দু একটা ছুটে গিয়েছে হয় তো—

—না, আমার স্কুলে ওভাবে কাজ করলে চলবে না। খাতা সব আপনি ফিরিয়ে নিয়ে যান। আবার দেখতে হবে।

—যে আজ্ঞে স্যার।

পরদিন নতুন মাষ্টার সার্কুলার-বই দেখিয়া বাহির করিলেন—মিঃ আলম ফার্ষ্ট ক্লাসের ইংরাজি গ্রামার ও রচনার খাতা দেখিয়াছেন। তিনখানি খাতা চাহিয়া লইয়া দেখিতে দেখিতে বাহির করিলেন, মিঃ আলম গড়ে প্রত্যেক পাতায় অন্ততঃ তিনটি করিয়া ভুলের নীচে লাল দাগ দেন নাই।

নতুন টিচার খাতা কয়খানি হাতে করিয়া হেড্‌ মাষ্টারের কাছে না গিয়া মিঃ আলমের কাছে গেলেন। খাতা দেখাইয়া বলিলেন—আপনার খাতা দেখা যদি আদর্শ হিসেবে নিতে হয়, তা হোলে প্রত্যেক পাতায় আমার তিনটি ভুলে লাল দাগ না দিয়ে রাখা উচিত ছিল—দেখুন খাতা ক'খানা—

মিঃ আলম উল্টাইয়া খাতাগুলি দেখিল। যুক্তি অকাট্য। গড়ে তিনটি করিয়া ভুলে লাল দাগ দেওয়া হয় নাই—খাঁটি কথা।

মিঃ আলমের মুখ লাল হইয়া উঠিল অপমানে, কিন্তু কোনো কথা বলিলেন না।

নতুন টিচার বলিলেন—আপনি বলেন কিনা হেড্‌মাষ্টারের কাছে আমার বড্ড ভুল থাকে খাতায়—তাই দেখালুম—ভুল সকলেরই থাকে। ওগুলো ওভারলুক করতে হয়। সব-কথায় হেড্‌মাষ্টারের কাছে—

মিঃ আলম রাগিয়া বলিলেন—আপনি কি করে জানলেন, আমি হেড মাষ্টারের কাছে বলেছি?

—মনের অগোচর পাপ নেই। আপনি জানেন, আপনি বলেছেন কিনা।

বলিয়াই নতুন টিচার বেশ কায়দার সহিত ঘর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

এ ব্যাপার কি করিয়া যে অন্য টিচারেরা জানিতে পারিল, টিচারদের বসিবার ঘরে টিফিনের সময় এ কথা লইয়া বেশ গুলজার হইল। মিঃ আলমের অপমানে সকলেই খুশি।

যদুবাবু বলিলেন—বেশ হয়েছে অন্ত্যজটার। থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিয়েছে নতুন টিচার—কি ওর নাম, রামেন্দুবাবু বুঝি?

নারাণবাবু সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর একটা গুণ, পরের কথায় বড় একটা থাকেন না। বলিলেন—বাদ দাও ভায়া ও কথা—

যদুবাবু বলিলেন—বাদ দেবো কেন? আপনি তো দাদা, দেবতুল্য লোক—তা বলে দুষ্টু লোকও তো আছে পৃথিবীতে। তাদের শাস্তি হওয়াই ভালো—

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—জানেন দাদা, একটা কথা বলি। ওই মিঃ আলমটা সবার নামে হেড্ মাষ্টারের কাছে লাগিয়ে বেড়ায়—এ কথা আপনি অস্বীকার করতে পারেন? অমন হিংসুক লোক আর দুটি দেখিনি, এই আপনাকে বলে দিচ্ছি।

জ্যোতির্ব্বিনোদ নীচু ক্লাসের পণ্ডিত—বড় বড় ক্লাসে যাঁরা পড়ান, তাঁদের সমীহ করিয়া চলেন—তিনি কারো বিরুদ্ধে কোনো সমালোচনা হইলে বিশেষ যোগ দেন না। তিনি বলেন, আমি চুনোপুঁটি, আপনারা সকলেই রুই-কাৎলা। আমার কোনো কথায় থাকা সাজে না।

তিনিও আজ বলিলেন—একটা ভাল বলতে হয় রামেন্দুবাবুকে—তিনি ওই খাতা নিয়ে হেড্ মাষ্টারের কাছে না গিয়ে মিঃ আলমের কাছে গিয়েছেন—

যদুবাবু কাহারো ভাল দেখিতে পারেন না, তিনি বলিলেন—আরে, সেটা কিছু নয় হে ভায়া। হেড্ মাষ্টারের কাছে যেতে সাহস কি হয় সবারই?

নারাণবাবু বলিলেন—তা নয়। অতখানি যে করতে পারে, সাহেবের কাছে যাওয়ার সাহস তার খুবই আছে। লোকটি ভদ্রলোক।

যদুবাবু বলিলেন—তবে একটু গুমুরে। যাক্, সব গুণ মানুষের থাকে না—এ কাজটা করে যা শিক্ষা দিয়েছে আলমকে—ভারি খুশি হয়েছি—হা-হা, কি বলো ক্ষেত্র-ভায়া?

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—স্পিরিট আছে ভদ্রলোকের।

—ডেকে নিয়ে এসো না? ওই তো ওদিকের ছাদে বসে থাকে একলাটি টিফিনে। টিচারদের ঘরে কোনো দিন তো আসে না।

নারাণবাবু বলিলেন—বসে বসে বই পড়ে লাইব্রেরী থেকে নিয়ে। সে দিন বঙ্কিমের বই পড়ছিল—পকেটে একদিন শেলির কবিতা ছিল—তোমরা ওকে গুমুরে ভাবো, ও তা নয়। কবি কি না—একটু আনমনে ভাবতে ভালবাসে।

—যাও না ক্ষেত্র-ভায়া, ডেকে নিয়ে এসো না?—

—আমি পারবো না দাদা। কিছু যদি বলে বসে—তার চেয়ে চলুন, আজ চায়ের দোকানের আড্ডায় নিয়ে যাওয়া যাক ওকে। আলাপ-সালাপ করা যাক—

ছুটির পরে গেটের বাহিরে মাষ্টারের দল নতুন-মাষ্টারের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন; কারণ, এ ঘনিষ্ঠতা হেড্ মাষ্টার বা মিঃ আলমের চোখের আড়ালে হওয়াই ভাল।··· মিঃ আলম বা হেড্ মাষ্টারের নেকনজরে যে ব্যক্তি নাই, তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে যাওয়ার বিপদ্ আছে।

নতুন টিচার চোখে চশমা লাগাইয়া ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে নব্য কবির ষ্টাইলে আকাশপানে মুখ করিয়া যেই গেটের বাহিরে পা দিয়াছেন—অমনি যদুবাবু এদিক্-ওদিক্ চাহিয়া বলিলেন—এই-যে শুনছেন, রামেন্দুবাবু,—

রামেন্দুবাবু হঠাৎ যেন চমকিয়া উঠিয়া পিছনে ফিরিয়া বিস্ময়ের সঙ্গে বলিলেন—আমাকে বলছেন?

যেন তিনি ইহা প্রত্যাশা করেন নাই—তাঁহাকে কেহ ডাকিবে।

যদুবাবু বলিলেন—আমরাই ডাকছি, আসুন একটু চা খেয়ে আসি—

—ও।—আচ্ছা—তা চলুন।

সকলেই খুব আগ্রহান্বিত—নতুন টিচারের সঙ্গে এত দিন আলাপ ভাল করিয়া হয়ই নাই—অনেকের সঙ্গে একটা কথাও হয় নাই। আজ ভাল করিয়া আলাপ করা যাইবে। লোকটার অদ্ভুত কার্য্যে তাহার সম্বন্ধে

মাষ্টারদের কৌতূহলের অন্ত নাই। আলমকে যে অপমান করিয়া ছাড়িয়াছে —সে সকলের বন্ধু।

চায়ের দোকানে গিয়া প্রতি দিনের মত মজলিস জমিল। স্কুল মাষ্টারদের অবশ্য যতটা হওয়া সম্ভব—ইহার বেশি ইহাদের ক্ষমতা নাই। নতুন টিচারকে খাতির করিয়া দুখানা টোষ্ট দেওয়া হইল—বাকি সবাই একখানা করিয়া টোষ্ট লইলেন। পরস্পর একটা মানসিক বোঝাপড়া হইল যে, নতুন টিচারের খাবারের বিলটা সকলে মিলিয়া চাঁদা করিয়া দিবেন।

নারাণবাবু আলাপের ভূমিকাস্বরূপ প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন—মশায়ের বাড়ী কোথায়?

—আমার বাড়ী ছিল গিয়ে নদে জেলায় সুবর্ণপুর। এখন কলকাতায় আছি অনেক দিন—

—কলকাতায় কোথায় থাকেন?

—মেসে।

—ও!

যদুবাবু একটু ঘনিষ্ঠতা করার জন্য বলিলেন—অনেক দিন কলকাতায় আর কি আছো ভায়া, তোমার বয়েসটা কি আর এমন? আমাদের চেয়ে কত ছোট—

নতুন টিচার এ ঘনিষ্ঠতায় বিশেষ ধরা দিলেন না। খুব ভদ্রতার সঙ্গে বিনীতভাবে জানাইলেন, তাঁর বয়স খুব কম নয়, প্রায় চৌত্রিশ পার হইতে চলিল। 'দাদা' কথাটার ব্যবহার একবারও করিলেন না। বেশ একটু ভদ্র ও বিনীত ব্যবধান বজায় রাখিয়া চলিলেন কথাবার্ত্তায় ও চালচলনে।

একথা ওকথার পর যদুবাবু হঠাৎ বলিলেন—আজ আমরা খুব খুশি হয়েছি, বেশ শিক্ষা দিয়েছেন (মাখামাখি করিবার সাহস তাঁহার উবিয়া গিয়াছিল) ওই ব্যাটাকে—

নতুন টিচার ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—কার কথা বলছেন!

—আরে ওই যে ওই আলমটাকে—ও ব্যাটা হেড্ মাষ্টারের কাছে প্রত্যেক বিষয়ে লাগাবে—আমাদের উত্তন-কুত্তন করে মেরেছে মশাই—উঃ, ও

একেবারে অন্ত্যজ—ওর যা অপমান করেছেন আজ। দেখুন তো, আপনার নামে কি না লাগাতে—

নতুন টিচারের মুখ কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি বিরস কণ্ঠে বলিলেন—ও আলোচনা নাই বা করলেন এখন। মিঃ আলমের ভুল হতে পারে। ভুল সবারই হয়। আমি তাঁর ভুল পয়েণ্ট আউট করেছি মাত্র। আদারওয়াইজ হি ইজ এ ভেরি গুড্ টিচার—ভেরি আর্নেষ্ট এ্যাণ্ড সিন্‌সিয়ার টিচার—যাক্ ও সব কথা।

কঠিন ভদ্র সুরের গাম্ভীর্য্যে চায়ের দোকানের হালকা আবহাওয়া যেন থম্ থম্ করিয়া উঠিল।

যদুবাবু আর মাখামাখি করিবার সাহস পাইলেন না। অন্য কথা উঠিল। নতুন টিচার বিশেষ কোনো কথা বলিলেন না—মজলিস জমিল না, যতটা আশা করা গিয়াছিল।

চায়ের মজলিস শেষ হইলে নতুন টিচার বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। সকলের পয়সা তিনি নিজেই দিয়া গেলেন।

যদুবাবু বলিলেন—গভীর জলের মাছ।—দেখলে তো?

ক্ষেত্রবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—হুঁ।

—বেশ চালবাজ।

—তা একটু আছে বই কি—

নারাণবাবু বলিলেন—তোমরা কারুর ভাল দেখ না—ওই তোমাদের দোষ। এ চালবাজ, ও গভীর জলের মাছ—এই সব তোমাদের কথা।

জ্যোতির্ব্বিনোদ বলিলেন—না না, ভদ্রলোক ভালই। আমি তো দেখছি বেশ উদার লোক।

যদুবাবু বলিলেন—ওই তো ভায়া! ওই জন্যেই তো বলছি গভীর জলের মাছ। আমাদের পয়সাটি পর্য্যন্ত নিজে দিয়ে গেল—যেন কত ভদ্রতা। অথচ—

নারাণবাবু বলিলেন—অথচ কি? তুমি সব জিনিসের মধ্যে একটা 'অথচ' না বের করে ছাড়বে না ভায়া।

—অথচ মনের কথাটা প্রকাশ তো করলে না?

—অথচ নয়, অর্থাৎ তোমার মত পেটপাৎলা নয়।

—আপনি তো দাদা আমার সবই দোষ দেখেন—

—রাগ কোরো না ভায়া। আমি তো ও ছোকরার কোন দোষই দেখলুম না। বসে বসে মিঃ আলমের নামে কুৎসা গাইলেই কি ভাল লোক হোত?

নারাণবাবুকে সকলেই তাঁর বয়সের জন্য একটু সমীহ করিয়া চলে। যদুবাবু ইহা লইয়া নারাণবাবুর সঙ্গে আর তর্ক করিলেন না।

মোটের উপর সে দিন চায়ের মজলিস হইতে বাহির হইয়া সকলেই সন্তোষ লইয়া বাড়ী ফিরিলেন।

মাসের শেষে ছেলেদের প্রোগ্রেস রিপোর্ট ইত্যাদি লেখার ভিড় পড়িয়া গেল। হেড্ মাষ্টারের কড়া হুকুম আছে, মাসের শেষ দিন কোনো টিচার ছুটির পর বাড়ী যাইতে পারিবে না—বসিয়া বসিয়া সব প্রোগ্রেস রিপোর্ট লিখিয়া হেড্ মাষ্টারের সই করাইয়া ভিন্ন ক্লাসের মার্কের খাতায় ছেলেদের মার্ক জমা করিয়া, ক্লাসের হাজিরা-বহিতে ছেলেদের গড়-হাজিরা বাহির করিয়া তবে যাইতে পাইবে।

এই সব কেরাণীর কাজ সাঙ্গ করিয়া বাড়ী ফিরিতে রাত সাড়েসাতটা বাজিয়া যায়।

স্কুলের প্রথানুযায়ী মাষ্টারদের এদিন জলখাবার দেওয়া হয় স্কুলের খরচে। যদুবাবু ছুটির পর সাহেবের কাছে জল-খাবারের টাকা আনিতে গেলেন—বরাবর তিনিই যান ও কোনো দোকান হইতে খাবার কিনিয়া আনেন।

বরাদ্দ আছে সাড়ে পাঁচ টাকা। সাহেব যদুবাবুর হাতে সাতটি টাকা দিয়া বলিলেন—আজ ভাল করে খাও সকলে—লাড্ডু, রসগোল্লা বেশি করে নিয়ে এসো।

যদুবাবু প্রথমে একটি রেষ্টুরেণ্টে গিয়া দু পেয়ালা চা খাইলেন, তারপর ছ'টাকার খাবার কিনিলেন এক দোকান হইতে। বাকী একটি টাকা তাঁহার

উপরি পাওনা। অন্ত অন্ত বার আট আনা পয়সা উপরি পাওনা হয়—অর্থাৎ পাঁচ টাকার খাবার কিনিয়া আট আনা পকেটস্থ করেন।

স্কুলে আসিতে প্রায় সন্ধ্যা হইল।

মাষ্টারেরা অধীর আগ্রহে জলখাবারের প্রত্যাশায় বসিয়া আছেন। একজন বলিলেন—এত দেরী কেন যদুবাবু?

—আরে, গরম গরম ভাজিয়ে আনছি। আমার কাছে বাবা ফাঁকি দিতে পারবে না কোনো দোকানদার। বসে থেকে তৈরী করিয়ে ষোল আনা দাঁড়ি ধরে ওজন করিয়ে তবে—

অন্যান্য মাষ্টারদের অগাধ বিশ্বাস যদুবাবুর উপরে। সকলেই বলেন, যদুবাবুর মত কিনতে কাটতে কেউ পারে না—পাকা লোক একেবারে যাকে বলে।

টিচারদের ঘরে বেঞ্চির উপর ছোট ছোট পাতা পাতিয়া খাবার পরিবেশন করা হইল। যদুবাবু এখানে খাইবেন না—তিনি বাড়ী লইয়া যাইবেন। জ্যোতির্ব্বিনোদ মশায় ঘিয়ে ভাজা জিনিষ খাইবেন না, তিনি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ, তাঁর জন্য শুধু সন্দেশ রসগোল্লা আনা হইয়াছে। নতুন টিচার বেঞ্চির এক পাশে খাইতে বসিয়াছিলেন। তাঁর সঙ্গে বড় সাধারণতঃ কারো মেশামেশি নাই। তিনি নিঃশব্দে ঘাড় গুঁজিয়া খাইতেছিলেন—যদুবাবু সামনে গিয়া বলিলেন—আর দু'একখানা লুচি দেবো?

—না না, আর দেবেন না।

—একটা রসগোল্লা?

অন্যান্য টিচার সকলেই বিভিন্ন বেঞ্চি হইতে নতুন টিচারকে খাওয়ার জন্য, দু-একটা অতিরিক্ত মিষ্টি লওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।

মিঃ আলম ভোজসভায় প্রতি বার উপস্থিত থাকেন—কিন্তু স্বীয় পদের আভিজাত্য বজায় রাখিবার জন্য সাধারণ-মাষ্টারদের সঙ্গে খাইতে বসেন না। মাষ্টারেরা বরং খোশামোদ করিয়া প্রতি বার ভোজসভাতেই তাঁহাকে খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করিত—মিঃ আলম হাসিমুখে প্রত্যাখ্যান করিতেন।

আজ তাঁহার প্রাপ্য সেই আপ্যায়ন নতুন টিচারের উপর গিয়া পড়িতে

দেখিয়া মিঃ আলম মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইলেন, বিস্মিত হইলেন, নতুন টিচারের উপর হিংসায় মন পরিপুর্ণ হইল।

নতুন টিচার বলিলেন—মিঃ আলম, আপনি খেলেন না? আসুন—

মিঃ আলম গম্ভীরমুখে উত্তর দিলেন—না, আপনারা খান। আমি এখন খাইনে—

নতুন টিচার আর কোন কথা বলিলেন না।

মাসে এই কয়দিন করিয়া স্কুলের খরচে খাওয়া—এমন বেশি কিছু খাওয়া নয়, হয় তো—খান পাঁচ ছয় লুচি, দুটি রসগোল্লা, একটু তরকারী, এক মুঠো দে। এই খাওয়াটুকুর জন্য মাষ্টারেরা মাসের শেষ দিনটির প্রতীক্ষায় থাকেন,—সে দিন সারা দিনটা খাটিবার পর সন্ধ্যায় সকলে বসিয়া একটু খাওয়া দাওয়া—

পরদিন মিঃ আলম হেড্‌মাষ্টারকে গিয়া বলিলেন—স্যার, একটা কথা। মাসের শেষে মাষ্টারদের পিছনে পাঁচ টাকা ছ টাকা মিথ্যে খরচ, ও বন্ধ করে দেওয়াই ভালো। ধরুন, কমিটি থেকে আপত্তি তুলতে পারে। মাষ্টারদের ডিউটি তারা করবে, তার জন্যে খাওয়ানো কেন স্কুলের খরচে? আমি তো ভাল বুঝছিনে স্যার।

কমিটির নামে হেড্‌মাষ্টার একটু ভয় পাইয়া গেলেন। তবুও বলিলেন—তা খায় খাকগে। খাটতেও হয় তো।

মিঃ আলম জানিত, কমিটির নামে সাহেব একটু ভয় পায়। সে গিয়া কমিটির একজন মেম্বারকে কথাটা লাগাইল। কমিটির মিটিংএ অমূল্যবাবু সাহেবকে প্রশ্ন করিলেন—আচ্ছা, শুনলাম আপনি টিচারদের জলখাবার খেতে দেন মাসের শেষে—সে কার পয়সায়?

—স্কুলের খরচে।

—কেন?

—মাষ্টারদের খাটুনি বেশি হয়—প্রোগ্রেস্ রিপোর্ট লেখা, রেজিষ্ট্রী ঠিক করা—

—এ তো তাঁদের ডিউটি। এর জন্যে জলখাবার দেয়া কেন?

ক্লার্কওয়েল তর্ক করিয়া তথনকার জন্য নিজের কাজের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন বটে—কিন্তু পরের মাস হইতে মাষ্টারদের জলযোগ বন্ধ হইয়া গেল।

ক্ষেত্রবাবু সে দিন স্কুল হইতে বাড়ী ফিরিয়া দেখিলেন স্ত্রী, বিছানায় শুইয়া আছে, ভয়ানক জ্বর। এঁটো বাসন রান্নাঘরের এক পাশে জড়ো হইয়া আছে—ওবেলাকার এঁটো পরিষ্কার করা হয় নাই, ছেলেমেয়েগুলো ঘরময় দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতেছে,—চারিদিকে বিশৃঙ্খলা। ক্ষেত্রবাবুর মাথা ঘুরিয়া গেল : সারাদিন পরে আসিয়া এ সব কি সহ্য হয়? স্ত্রীর ব্যবস্থামত ঠিকা ঝিকে আজ মাস তিনেক হইল ছাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে—স্ত্রীই বলিয়াছিল, কেন মিছেমিছি ঝির পেছনে আড়াই টাকা তিন টাকা খরচ—আজ একটু নুন দাও মা, আজ খিদে পেয়েছে জলখাবার দাও মা, আজ মাখবার একটু তেল দাও মা—এই সব ঝক্কি রোজ লেগেই আছে—দাও ছাড়িয়ে, কাজকর্ম্ম সব করবো আমি।

হাসিয়া বলিয়াছিল,—কিন্তু মাসে মাসে আড়াইটে করে টাকা আমায় দিও গো, ফাঁকি দিও না যেন—

কিন্তু শরীর খারাপ, মন খাটিতে চাহিলে কি হইবে, তিন মাসের মধ্যে এই তিন বার অসুখে পড়িল। ডাক্তার ওষুধ ও খরচে ঠিকা ঝিয়ের ডবল খরচ হইয়া গেল।

ক্ষেত্রবাবু নিজে বড় মেয়েটির সাহায্যে রান্নাঘর পরিষ্কার করিলেন। মেয়েকে বলিলেন—বাসন মাজতে পারবি হাবি?

হাবি মাত্র সাত বছরের মেয়ে। ঘাড় নাড়িয়া বলিল—হুঁ, খু-উ-ব।

—যা দিকি, আমি কলতলায় দিয়ে আসছি—

ঘরের ভিতর হইতে নিভাননী চিঁ-চিঁ করিয়া বলিল—ও পারবে না—একটা ঠিকে-ঝি দেখে নিয়ে এসো—ওই সদ্‌গোপ বাবুদের পাশের গলিতে মুংলির মা বুড়ী থাকে—খোঁজ করে দেখগে—

ক্ষেত্রবাবু ধমক দিয়া বলিলেন—তুমি চুপ করে শুয়ে থাকো। আমি বুঝছি, কেন ও পারবে না? শিখতে হবে না কাজ? কাছু কোথায় রে?

হাবি বলিল—না বাবা, আমি পারবো। দাদা খেলা করতে গিয়েছে।

—সুজি কোথায় আছে? ঘি?

নিভাননীর ধমক খাইয়া রাগ হইয়াছিল। সে কথা বলিল না।

—আঃ বলি—সুজিটা কোথায়? সারাদিন খেটে খিদেতে মরছি—যা হয় কিছু খাবো তো?

নিভাননী পূর্ব্ববৎ চিঁ-চিঁ করিতে করিতে বলিল—আমার কি দরকার কথায়? যা বোঝো করো তুমি।

হাবি বলিল—আমি জানি বাবা, আমি দিচ্ছি—

তখন নিভাননী মেয়েকে ডাকিয়া বলিয়া দিল, সুজি করিবার দরকার নাই, ওবেলার রুটি করা আছে শিকের হাঁড়িতে। নিয়ে খেতে বল্—চা করে দিতে পারবি?

হাবি না বলিতে জানে না। ঘাড় লম্বা করিয়া বলিল—হুঁ—উ—উ—

সে চায়ের কাপ ইত্যাদি লইয়া রান্না-ঘরের দিকে যাইতে যাইতে বলিল—মা, উনুনে আঁচ দিয়ে দেবে কে?

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—তোমাকে ওসব করতে হবে না—হয়েছে থাক, আর চায়ে দরকার নেই। তারপর চা করতে গিয়ে জামায় আগুন লেগে মরুক—

নিভাননী বলিল—আহা, মুখের কি মিষ্টি বাক্যি।

ক্ষেত্রবাবু এক গ্লাস জল ঢক্ঢক্ করিয়া খাইয়া ফেলিলেন। তারপর হাবির সাহায্যে রুটি বাহির করিয়া গুড় দিয়া এক আধখানা নিজে খাইলেন, বাকি ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়া টুইশানিতে বাহির হইলেন।

হাবি বলিল—বাবা, মা বলছে, রাত্রে কি খাবে—একখানা পাঁউরুটি কিনে এনো—

ক্ষেত্রবাবু কথা কানে তুলিলেন না। ছাত্রের বাড়ী গিয়া মনে পড়িল, স্ত্রীর অসুখের জন্য একবার বেলেঘাটার রামসদয় ডাক্তারের ওখানে যাইতে হইবে। খানিকটা আলাপ পরিচয় আছে—স্কুল-মাষ্টার বলিয়া ভিজিটটা কম লইয়া থাকে তাঁহার কাছে।

ছেলের বাপ আসিয়া কাছে বসিয়া ছেলের পড়ার তদারক করিতে

লাগিল। ফলে ক্ষেত্রবাবু যে একটু সকালে সকালে বিদায় লইবেন, তাহার উপায় রহিল না। অভিভাবকের মনস্তুষ্টির দরুন উল্টিয়া বরং একটু বেশি সময় বসিয়া থাকিতে হইল। রাত্রে সাড়ে ন'টার সময় ছাত্রের বাড়ী হইতে পদব্রজে বেলেঘাটা চলিলেন—ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করিয়া কাজ শেষ করিতে সাড়ে দশটা বাজিয়া গেল—কাজেই আসিবার পথে ছ'টি পয়সা বাসভাড়া দিয়া ফিরিতে হইল।

বাসায় ফিরিয়া দেখেন, ছেলেমেয়েরা অঘোরে ঘুমাইতেছে—স্ত্রীর আবার জ্বর আসিয়াছিল সন্ধ্যার পরেই, সে বিছানায় পড়িয়া এপাশ ওপাশ করিতেছে।

ভীষণ ক্ষুধা পাইয়াছে। কিন্তু এত রাত্রে কি খাইবেন? ভাত চড়াইবার ধৈর্য্য থাকে না আর এখন।

নিভাননী জ্বরে বেহুঁস, তবুও সে জিজ্ঞাসা করিল—পাঁউরুটি এনেছ?

ঐ যাঃ,—পাঁউরুটি কিনিতে ভুলিয়া গিয়াছি—অত কি ছাই মনে থাকে? বলিলেন—না, আনতে মনে নেই।

নিভাননী উদ্বিগ্নকণ্ঠে বলিল—তবে কি খাবে এখন? দুটো চিঁড়ে কিনে আনো না হয়—

ক্ষেত্রবাবু বিরক্তির সহিত বলিলেন—হ্যাঁঃ—এখন এগারোটা বাজে, আমার জন্যে চিঁড়ের দোকান খুলে রেখেছে তারা।

—দেখই না গো, মোড়ের দোকানটা অনেক রাত পর্য্যন্ত খোলা থাকে—

ক্ষেত্রবাবু সে কথার কোনো উত্তর না দিয়া কলসী হইতে এক গ্লাস জল গড়াইয়া ঢক্‌ঢক্ করিয়া খাইয়া আলো নিবাইয়া শুইয়া পড়িলেন—অর্থাৎ সমস্ত অসুবিধা ও অনাহারের দায়িত্বটা রুগ্ন স্ত্রীর ঘাড়ে চাপাইয়া দিলেন বিনা বাক্যব্যয়ে।

নিভাননী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

পরদিন সকালে ডাক্তার আসিয়া বলিল, রোগ বাঁকা পথ ধরিয়াছে। বাড়ীতে ভাল চিকিৎসা হইবে না, হাসপাতালে পাঠাইতে পারিলে ভাল হয়। ক্ষেত্রবাবুর প্রাণ উড়িয়া গেল। হাসপাতালে স্ত্রীকে পাঠাইলে—

ছেলেমেয়েদের বাড়ীতে দেখাশোনা করে কে? হাসপাতালে যাওয়ার ব্যবস্থাই বা তিনি কখন্ করেন?

ডাক্তারের হাতে পায়ে ধরিয়া এক চিঠি লিখাইয়া লইলেন ক্যাম্বেল হাসপাতালের এক ডাক্তারের নামে। খাইতে গেলে ক্যাম্বেল হাসপাতালে গিয়া কাজ মিটাইয়া আবার ঠিক সময়ে স্কুলে যাইতে পারেন না। সুতরাং হাবিকে তাহার ভাইবোনের জন্ম রান্না করিতে বলিয়া, না খাইয়াই বাহির হইলেন। ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুলে পাঁচ মিনিট লেট হইবার যো নাই। হাসপাতালে গিয়া শুনিলেন, ডাক্তারবাবু দশটার আগে আসে না। বসিয়া বসিয়া সাড়ে দশটার সময় ডাক্তারের মোটর আসিয়া গেটে ঢুকিল। ক্ষেত্রবাবুর হাত হইতে চিঠি পড়িয়া বলিলেন—আচ্ছা, আপনি ওবেলা আমার সঙ্গে একবার দেখা করবেন, এই—ছ'টার সময়। এবেলা বলতে পারছিনে—

ক্ষেত্রবাবু প্রমাদ গণিলেন। ছ'টা পর্য্যন্ত এখানে অপেক্ষা করিবেন তো বাসায় যাইবেন কখন, ছেলে পড়াতেই বা যান কখন?

স্কুলের কাজ শেষ হইয়া আসিয়াছে, বেলা চারিটা বাজে, এমন সময় সাহেবের ঘরে ডাক পড়িল।

ক্ষেত্রবাবু সাহেবের টেবিলের সামনে গিয়া দাঁড়াইতেই সাহেব বলিলেন —ক্ষেত্রবাবু, ছুটো ক্লাসের প্রশ্নপত্র লিখো করতে হবে—আপনি ছুটি হোলে কাজটা করে বাড়ী যাবেন।

হেড্‌মাষ্টারের কথার উপর কথা চলে না—অগত্যা তাহাই করিতে হইল। ছুটির পর মাষ্টারদের মধ্যে দু-একজন বলিলেন—চলুন ক্ষেত্রবাবু চা খেয়ে আসি।

—মনে সুখ নেই, চা খাবো কি, চলুন—

সেখানে গিয়া মাষ্টারের দল প্রস্তাব করিলেন, স্কুলে একদিন ফিষ্টি করা হোক। হেড্ পণ্ডিত চা না খাইলেও এখানে উপস্থিত থাকেন রোজ— তিনি ফর্দ্দ করিলেন, প্রত্যেক মাষ্টারকে এক টাকা চাঁদা দিতে হইবে। তাহা হইলে একদিন পোলাও রাঁধিয়া সবাই আমোদ করিয়া খাওয়া যায়।

যদুবাবু বলিলেন, এক টাকা বড় বেশি হইয়া পড়ে—বারো আনার মধ্যে যাহা হয় হউক।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—মনে সুখ নেই দাদা, এখন ওসব থাক্—

যদুবাবু বলিলেন—কেন, কি হয়েছে?

—বাড়ীতে বড় অসুখ। হাসপাতালে পাঠাতে হচ্ছে কাল—

সকলেই নানারূপ ব্যগ্র প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। দু-একজন ক্ষেত্রবাবুর বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়া দেখিতে চাহিলেন। কিন্তু খাইবার প্রস্তাব আপাতত মুলতুবি রহিল। সকলেই কম মাহিনায় সংসার চালান, এক পরিবারের মত মনে করেন পরস্পরকে, একজনের দুঃখ সবাই বোঝেন বলিয়াই চায়ের এ মজলিসের বন্ধুদের মধ্যে প্রীতির বন্ধন ঘনিষ্ঠ ও নির্ভেজাল।

ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে নারাণবাবু হাসপাতাল পর্য্যন্ত গেলেন। ক্ষেত্রবাবু বলিয়াছিলেন, আপনি বুড়োমানুষ, এতটা আর যাবেন না হেঁটে।

—বুড়োমানুষ বলে কি মানুষ নই? ও কি ভায়া—চলো, গিয়ে দেখে আসি—

দুজনে গিয়া ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করিয়া হাসপাতালের সব ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন এবং পরদিনই নিভাননীকে হাসপাতালে আনা হইল।

নারাণবাবু রোজ বিকালে টুইশানিতে যাইবার আগে দুটি কমলালেবু, কোনদিন বা এক গুচ্ছ আঙুর হইয়া নিভাননীকে দেখিয়া যান। স্কুলে পরদিন বলেন—ও ক্ষেত্র-ভায়া, বৌমা কাল বলছিলেন, তুমি হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাচ্ছ—তোমার কে শালী আছেন, তাঁকে এনে দুদিন রাখো না—

—আপনাকে বল্লে বুঝি?

—হাঁ। কাল উনি বলছিলেন। তোমার কষ্ট হচ্ছে—কবে যে সেরে উঠবো, কবে যে বাড়ী যাবো—বলছিলেন বৌমা।

—ওই রকম বলে। শালীকে আনা কি সহজ দাদা? নিয়ে এস খরচ করে, দিয়ে এস খরচ করে—খাওয়াও লুচি পরোটা। সে কি আমাদের সাধ্যি?

নারাণবাবুকে নিভাননী ‘দাদা’ বলিয়া ডাকে। আড়ালে ‘বট্‌ঠাকুর’

বলিয়া তাকে, স্বামীর কাছে। নারাণবাবু কত রকম মজার গল্প করেন তার কাছে, রোগীর মনে আনন্দ দিতে চান। একদিন নিভাননী বলিল—দাদা, আমি ভাল হোলে আপনাকে ছোট বোনের বাড়ী একদিন খেতে হবে—

নারাণবাবু শশব্যস্ত হইয়া বলেন,—নিশ্চয়, বৌমা, নিশ্চয়—এর আর কথা কি?

—আপনি কি খেতে ভালবাসেন দাদা?

—আমি? আমার—বৌমা—বুড়ো হয়েছি—যা হয় সব ভালো লাগে। একলা থাকি, রেঁধে খাই—

—কতদিন আছেন একা?

—তা আজ সাতাশ বছর বৌমা—

—একা আছেন?

—তা থাকতে হয় বৈ কি বৌমা। নিজেই রাঁধি—এই বয়সে কি রান্না করতে ইচ্ছে করে?—বেশি কিছু রাঁধি না, যা হয় একটা তরকারি করি।

—আপনি মাছ খান?

—তা খাই বৌমা। ও বোষ্টমদের ঢং নেই আমার। পুরুষ মানুষ, মাছ-মাংস কেন খাবো না। ও বোষ্টমদের মেয়েলিপনার ঢং দেখলে আমি হাড়ে চটি।

—আমি আপনাকে ইলিশ মাছের দই-মাছ রেঁধে খাওয়াবো—আমি দিদিমার কাছে রাঁধতে শিখেছি—জানেন?

পিতৃসম স্নেহময় বৃদ্ধের সঙ্গে কথা বলিবার সময় নিভাননীর কণ্ঠে আপনিই যেন আব্দারের সুর আসিয়া পড়ে। তার বালিকা বয়সে যে বাবা স্বর্গে গিয়াছেন, যাঁহার কথা ভাল মনে পড়ে না—এই প্রাণখোলা সরল বৃদ্ধের মধ্যে নিভাননী তাঁহাকেই যেন আবার দেখিতে পায়, নিজের কণ্ঠে কখন যে কন্যার মত আব্দার অভিমানের সুর আসিয়া পড়ে সে বুঝিতেও পারে না।

নারাণবাবুও বসিয়া সুখদুঃখের কথা বলেন। নারীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আজ ত্রিশ বছর আসেন নাই—স্নেহভালবাসার পাট উঠিয়া গিয়াছে জীবনে। এমন দরদী শ্রোতা পাইয়া তাঁহারও মনের উৎস-মুখ খুলিয়া যায়। প্রথম

জীবনের চাকুরীর কথা বলেন। বহুকাল-পরলোকগতা পত্নীর সম্বন্ধে বলেন, অনুকূলবাবুর কথাও পাড়েন। নিভাননী সহানুভূতি জানায়, একমনে শুনিতে শুনিতে কখনো তার চোখ ছলছল করিয়া ওঠে।

ক্ষেত্রবাবু সারাদিন আসিতে পারেন না। টুইশানি, বাড়ীতে ছেলে-মেয়েদের দেখাশোনা—এসব সারিয়া রোজ হাসপাতালে আসা চলে না—নারাণবাবু আসেন বলিয়া হয় তো তেমন দরকারও হয় না।

সে দিন নারাণবাবু টুইশানি সারিয়া বৌবাজারের মোড় হইতে একটা বেদানা ও দুটি কমলালেবু কিনিলেন। অনেক দিন কিছু হাতে করিয়া যাইতে পারেন নাই—আজ টুইশানির মাহিনা পাইয়াছেন। হাসপাতালের হলে দেখিলেন, হলের কোণে নিভাননীর সে বিছানাটা খালি, লোহার খাটটা হাড়-পাঁজরা বাহির করা পড়িয়া আছে।

নারাণবাবু ভাবিলেন, তাঁহার ভুল হইয়াছে। কোন্ ঘরে আসিতে কোন্ ঘরে আসিয়াছেন, বৃদ্ধ বয়সে মনে থাকে না। বাহির হইতে গিয়া বারান্দায় জলের, না কিসের ড্রামটি চোখে পড়িল। না, এই ড্রাম রহিয়াছে—এই তো ঘর। আবার তিনি ঘরে ঢুকিলেন।

পাশের বিছানার এক রোগী বলিল—আপনি কাকে খুঁজছেন বলুন তো? ও, সেই বৌটির আপনি কেউ—আহা, আপনি জানেন না। ও তো আজ দুপুরে হয়ে গিয়েছে! বৌটির স্বামী এল, আরও কে কে এল—নিয়ে গেল, প্রায় তখন তিনটে। আহা, আমরা সবাই—কথা কইতে কইতে পাশ ফিরলো—আর অমনি হয়ে গেল। হার্টে কিছু ছিল না। আহা, আপনি কে হোচ্ছেন ওঁর—ইত্যাদি।

নারাণবাবু কিছু না বলিয়া ফলগুলি হাতে করিয়া বাহিরে আসিলেন।

আজ ক্ষেত্রবাবুকে কি স্কুলে দেখেন নাই? না বোধ হয়। এখন মনে পড়িল, সারাদিন স্কুলে ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে দেখা হয় নাই বটে। আজ হাস-পাতালে আসিবেন বলিয়া টুইশানিতে গিয়াছিলেন ছুটির পরেই—সুতরাং চায়ের দোকানেও যান নাই। নতুবা ক্ষেত্রবাবুর অনুপস্থিতি চোখে পড়িত।

নিজের ছোট ঘরের নিঃসঙ্গ শয্যায় শুইয়া বৃদ্ধ কত রাত পর্য্যন্ত ঘুমাইতে পারিলেন না!

স্কুলের দুর্দ্দশা উপস্থিত হইল এপ্রিল মাস হইতে। এপ্রিল মাসে মাষ্টারদের বেতন ঠিক সময় দেওয়ার উপায় রহিল না; কারণ, এবার জানুয়ারী মাসে আশানুরূপ ছেলে ভর্ত্তি হয় নাই—বরং অনেক ছেলে ট্রান্সফার লইয়া চলিয়া গিয়াছে। এ স্কুলে ছেলেদের মাহিনা অন্য স্কুল হইতে বেশি—কিন্তু এই সব দুঃসময়ে লোক বেশি মাহিনা দিতে চায় না। পূর্ব্বে ভাবা গিয়াছিল, সাহেব মেম স্কুলে পড়াইবে বলিয়া পাড়ার বড়লোকেরা ছেলে এখানেই ভর্ত্তি করিবে—কিন্তু গত ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল তেমন ভাল না হওয়ায়, এ স্কুলে পড়াইতে অনেকেই দ্বিধা বোধ করিল। ফলে ছেলে অনেক কমিয়া গিয়াছে এবার।

মাষ্টারেরা সাতাশে এপ্রিল মার্চ্চ মাসের মাহিনার কিছু অংশ মাত্র পাইল। গরমের ছুটির পূর্ব্বে মে মাসে মার্চ্চ মাসের প্রাপ্ত বেতনের বাকি অংশ শোধ করিয়া দেওয়া হইল। দেড় মাস গরমের ছুটি, গরীব শিক্ষকেরা বাড়ী গিয়া খায় কি? হেড্ মাষ্টারের কাছে দরবার করিয়া ফল হইল না। সকলে বলিল, সাহেব মেম ঠিক ওদের পুরো ছুটির মাইনে নিয়ে যাচ্ছে—আমাদেরই বিপদ্।

শোনা গেল, সাহেব দিল্লী না কোথায় যেন বেড়াইতে যাইতেছে।

স্কুলের কেরাণী হরিচরণ নাগ কিন্তু বলিল, কথা ঠিক নয়—সাহেব এখনও মার্চ্চ মাসের মাহিনা শোধ করিয়া লয় নাই—মেম এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত মাহিনা লইয়াছে।

সাহেবের নিকট যাইয়া মাহিনা পাইবার জন্য বেশি পীড়াপীড়ি করিলে—সাহেব বলিবেন—যাই তোর ইজ ওপ্‌ন্—যাঁদের না পোষায়, চলে যেতে পারেন। আমার স্কুলে কষ্ট করে যারা থাকতে না পারবে, তাদের দিয়ে এখানে কাজ হবে না। আমাদের অনেক কষ্টের মধ্যে দিয়ে এখনও যেতে হবে—স্বার্থত্যাগ চাই তার জন্যে। সামনের বছর থেকে স্কুল ভাল হয়ে যাবে। এই বছরটা তোমরা আমার সঙ্গে সহযোগিতা কর।

ক্লার্কওয়েল সাহেবের ব্যক্তিত্ব বলিয়া জিনিষ ছিল—অন্তত গরীব টিচারদের কাছে। কারণ, ব্যক্তিত্ব জিনিষটা ভীষণ রিলেটিভ, আমার গুরুদেবের ব্যক্তিত্ব তোমার কাছে হয় ত কিছুই নয়, কিন্তু আমার কাছে তা গুরুত্বপূর্ণ—তোমার জমিদার মনিবের ব্যক্তিত্ব যতই গুরু হউক, আমার নিকটে তাহা নিতান্তই লঘু। সুতরাং মাষ্টারের দল শুধু হাতে গরমের ছুটিতে দেশে চলিয়া গেল।

যদুবাবু পড়িয়া গেলেন মুস্কিলে।

কলিকাতা ছাড়িয়া কোথাও একটা যাইবার স্থান নাই—অথচ ইচ্ছা করে কোথাও যাইতে। কতদিন কলিকাতার বাহিরে যাওয়া ঘটে নাই—হাতও এদিকে খালি। তাঁহার ছাত্রেরা দেশে যাইতেছে, নবদ্বীপের কাছে পূর্ব্বস্থলি নামে গ্রাম, বেশ নাকি ভালো জায়গা। কিন্তু যদুবাবু তো একা নহেন, স্ত্রীকে বাসায় রাখিয়া যাওয়া সম্ভব নয়।

পৈতৃক গ্রামে যাইতে ইচ্ছা হয়—কিন্তু সেখানে ঘরবাড়ী নাই। জমিজমা শরিকে কিনিয়া লইয়াছে আজ বহুদিন। তবুও যদুবাবু স্ত্রীকে বলিলেন—বেড়াবাড়ী যাবে?

যদুবাবুর স্ত্রী বিবাহ হইয়া কিছুদিন যশোর জেলার এই ক্ষুদ্র গ্রামে শ্বশুরঘর করিয়াছিল, ম্যালেরিয়া ধরিয়া মাস দুই ভোগে—তাহার পর হইতেই স্বামীর সঙ্গে বর্দ্ধমান ও পরে কলিকাতায়। সে বেড়াবাড়ী যাইবার প্রস্তাবে বিস্মিত হইয়া কহিল—বেড়াবাড়ী! সেখানে কেমন করে যাবে গো? বাড়ীঘর কোথায় সেখানে?

চলো না, অবনীদের বাড়ীতে গিয়ে উঠি। সেও তো কলকাতায় এসে আমার বাসাতে থেকে গিয়েছে দু একবার—

—না বাপু, পরের ঘরকন্নার মধ্যে যাওয়া, সে বড় ঝঞ্ঝাট—হাতে তোমার টাকাই বা কই?

যদুবাবুর মতলব একটু অন্য রকম। হাতে প্রায় কিছুই নাই—স্ত্রীকে পাড়াগাঁয়ে জ্ঞাতিদের বাড়ী গছাইয়া রাখিয়া আসিয়া দিনকতক তিনি একটু

হালকা হইবেন। এবার টাকা করিয়া বাসাভাড়া আর টানিতে পারেন না। ওই থার্ড মাষ্টার শ্রীশ রায় মেসে থাকে, আড়াই টাকা সিট্ রেন্ট্, খোরাকি খরচ দশ টাকা, সাড়ে বারো টাকার মধ্যে সব শেষ।

যদুবাবু স্ত্রীকে বলিয়া কহিয়া রাজি করিলেন। কিন্তু যাইবার দিন বাড়ী-ওয়ালা গোলমাল বাধাইল।

আজ পাঁচ মাসের বাড়ীভাড়া পাওনা মশাই, পাঁচ এগারো: পঞ্চান্ন টাকা, দশ টাকা মাত্র ঠেকিয়েছেন এ মাসে আর মাত্র পাঁচ টাকা ঠেকিয়ে চলে যাচ্ছেন। বাক্স পেঁটরা বিছানা সবই তো নিয়ে চল্লেন, রইল এখানে কি শুবে? ওই একটা জারুল কাঠের সিন্দুক আর একখানা ভাঙ্গা তক্তপোষ, আর তো দেখছি কয়লাভাঙ্গা হাতুড়িটা—আর মরচেধরা গোটা দুই কাচ-ভাঙ্গা হারিকেন। আপনি যদি আর না আসেন মশাই, তো এতে আমার চল্লিশ টাকা আদায় হবে কিসে বুঝিয়ে দিয়ে তবে যান। আমি পাড়ার লোক ডাকি —তারা বলুক, আমার যদি অন্যায় হয়ে থাকে মশাই, আমায় দশ ঘা জুতো মারুক। আপনি ভদ্রলোকের ছেলে, বাড়ীতে জায়গা দিয়েছিলাম—স্কুলে মাষ্টারি করেন, ছেলেদের লেখাপড়া শেখান—তা এই যদি আপনার ধরণ হয়—না মশাই, আমি তা পারব না। মাপ করবেন। আপনি যেতে হয়, জিনিষপত্র রেখে যান—নইলে আমার ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে যান।

—কি হয়েছে, কি হয়েছে বলিয়া কলিকাতার হুজুগপ্রিয় কৌতূহলী লোক ভিড় পাকাইয়া তুলিল। কেহ হইল বাড়ীওয়ালার দিকে, কেহ হইল যদুবাবুর দিকে—উভয় দলে মারামারি হইবার উপক্রম হইল। যদুবাবুর স্ত্রী চট্ করিয়া উপরে গিয়া বাড়ীওয়ালার মায়ের কাছে কাঁদিয়া পড়িলেন—মা, আপনি বলে দিন। টাকা আমরা ফেলে রাখবো না—পালাবোও না। স্কুল খুললেই টাকা শোধ দেবো।

দোতালার বারান্দায় দাঁড়াইয়া বাড়ীওয়ালার মা ডাকিল—ও বদে, বলি শোন্, ওপরে আয়—

ব্যাপারটা মিটিল। স্ত্রী ও বাক্স বিছানা সমেত যদুবাবু মুক্তি পাইলেন—

কিন্তু আর তিনি কোন দিন এ বাসা তো দূরের কথা, এ পাড়ার ত্রিসীমানাও মাড়ান নাই।

বেড়াবাড়ী বগুলা ষ্টেশনে নামিয়া সাত ক্রোশ গরুর গাড়ীতে যাইতে হয়—দুপুর ঘুরিয়া গেল সেখানে পৌঁছিতে। শরিক অবনী মুখুয্যে আহারাদি সারিয়া দিবানিদ্রা দিতেছিলেন, বাহিরে সোরগোল শুনিয়া আসিয়া যাহা দেখিলেন—তাহাতে তিনি খুব সন্তুষ্ট হইলেন না। মুখে বলিলেন—কে, যদু দা? সঙ্গে কে—বৌদিদি, বেশ, বেশ—তা এত কাল পরে মনে পড়েছে যে।—না, ভাল না, বাড়ীর সব অসুখ ব্যায়রাম। আপনার বৌমা তো কাল জ্বর থেকে উঠেছে—ছেলে দুটোর এমন পাঁচড়া যে, পঙ্গু হয়ে বসে থাকে—ও পুঁটি—ওগো—এই বৌদিদি এসেছেন, নামিয়ে নাও—

রাত্রে যদুবাবু দেখিলেন, থাকিবার ভীষণ কষ্ট। ইহাদের দুইটি মাত্র ঘর আর এক ভাঙ্গা পুজার দালান, তার একখানায় কাঠকুটা রহিয়াছে—একটি ঘরে ভদ্রতা করিয়া আজিকার জন্য থাকিবার জায়গা দিয়াছে বটে, কিন্তু বেশি দিনের জন্য এ ব্যবস্থা সম্ভব নয়—কারণ, অবনী তিনটি বড় মেয়ে, দুটি ছেলে, স্ত্রী ও এক বিধবা দিদিকে লইয়া পাশের ওই একখানি মাত্র ঘরে কতদিন থাকিতে পারিবে?

দুদিন গেল, এক সপ্তাহ গেল! গরমে বড় কষ্ট হয়—সেকেলে কোঠার ছোট ছোট জানালা—হাওয়া চলে না—

অবনীদের সংসারে প্রথম দুদিন এক হাঁড়িতেই খাওয়া চলিয়াছিল, তারপর যদুবাবুর আলাদা রান্না হয়। জিনিষপত্র সস্তা, এক সের করিয়া দুধ যোগান করা হইয়াছে—বেশ খাঁটি দুধ। যদুবাবুর স্ত্রী বলে—এমন দুধ যাই বল, শহরে বেশি পয়সা দিলেও মিলবে না।

কিন্তু দিন পনেরো পরে থাকিবার বড় অসুবিধা হইতে লাগিল। অবনী একদিন ঘুরাইয়া কথাটা বলিয়াই ফেলিল—অর্থাৎ দেশ তো দেখা হইয়াছে, এইবার যাইবার কি ব্যবস্থা?…ভাবখানা এই রকম।

রাত্রে যদুবাবু স্ত্রীকে নিম্নকণ্ঠে বলিলেন—অবনী তো বলছিল, আর ক'দিন আছেন দাদা? তা কি করি বলো তো? এই গরমে কলকাতায়—

স্ত্রী বলিল—চলো এখান থেকে বাপু। নানান্ অসুবিধে। মন টেঁকে না—বাবাঃ যে জঙ্গল! ঘরদোরগুলো ভাল না, ছাদ যেমন, একটা বিষ্টি হোলেই জল পড়বে। আর ওরাও আর তেমন ভাল ব্যবহার করছে না। আজ ঘাটে বড় দিদি কাকে বলছিল—আমাদের বাড়ী তো আর শরীকের ভাগ নেই—যে যেখানে আছে, হুট্ করে এলেই তো হোলো না! এই রকম কি কথা। আমাদের যাওয়াই ভাল—যে মশা, রাত্তিরে ঘুম হয় না মশার ডাকে।

যদুবাবুর তাহা ইচ্ছা নয়। স্ত্রীকে এবার শরীকের ঘাড়ে কিছুদিন চাপাইয়া যাইবেন, এই মতলব লইয়াই এখানে আসিয়াছেন। তিনি কিছু বলিলেন না।

আর দু তিন দিন পরে যদুবাবু ফিরিবেন মনস্থ করিলেন।

অবনীকে বলিলেন—তোমার বৌদিদি রইল এ মাসটা। কাকীমার সঙ্গে শোবে। আমার কলকাতায় না গেলে নয়, আমি পরশু নাগাৎ যাই।

গ্রামের কাপালীপাড়া হইতে সিধু কাপালী আসিয়া বলিল—দাদাঠাকুর, এ গাঁয়ে একটা পাঠশালা খুলে বসুন। পঁচিশ ত্রিশটা ছেলে দেবো—চার আনা আর আট আনা করে রেট। আপনার বাড়ী বসে যা হয়! কলকাতা ছেড়ে দিয়ে এখানেই থেকে যান না কেন।

যদুবাবু হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। বলিলেন—কলকাতার স্কুলে পঁচাত্তর টাকা মাইনে পাই—সত্তর ছিল, ছেড়ে দেবো বলে ভয় দেখিয়েছিলাম, অমনি সেক্রেটারি পাঁচ টাকা বাড়িয়ে বল্লে, যদুবাবু, আপনার মত টিচার আর কোথায় পাবো—আপনি থাকুন! প্রাইভেট টুইশানিতে তাও ধরো পাই—পনেরো আর পঁচিশ সকালে—বিকেলে পনেরো আর কুড়ি। এই ছেড়ে আসবো পাঠশালা খুলে চার আনা আট আনা নিয়ে ছেলে পড়াতে? তুমি হাসালে সিদ্ধেশ্বর।

অবনী সেখানে উপস্থিত ছিল। যদুদাদা যে স্কুলে এত মাহিনা পান—এই সে প্রথম শুনিল। কিন্তু কই, তেমন তো আসবাবপত্র বসন-পরিচ্ছদ কিছুই নাই। বৌদিদি তো মোটে চারখানা শাড়ী আনিয়াছেন—দাদার দুটি মলিন পিরাণ, গায়ে ভাল সেমিজ একটাও দেখা যায় না। বিছানা তো যা

আনিয়াছেন, তাহা দেখিয়া একদিন অবনীর স্ত্রী বলিয়াছিল—বটঠাকুরের যা বিছানাপত্র, ওই বিছানায় কি করে ওরা শোয় কলকাতা শহরে, তা ভেবে পাইনে। আমরা যে অজ পাড়াগেঁয়ে—আমাদের বাড়ীর ছেলেমেয়েরা পর্য্যন্ত ও বিছানায় শোবে না।

গ্রামের সকলে ধরিয়াছিল, এতকাল পরে দেশে এসেছ, গাঁয়ের ব্রাহ্মণ ক'টিকে ভাল করে একদিন মা-বাপের তিথিতে খাইয়ে দাও। কিছুই তো করলে না গাঁয়ে—

যদুবাবু তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই।

অথচ তিনি এত রোজগার করেন নিজের মুখেই তো বলিলেন। কি জানি কি ব্যাপার শহরের লোকের! বেশ মোটা পয়সা হাতে আনিয়াছেন দাদা, অথচ খরচপত্র বিষয়ে কঞ্জুস—

কথাটা অবনী স্ত্রীকে বলিল।

স্ত্রী বলিল—কি জানি বাপু, দিদির গায়ে তো একরত্তি সোনা নেই—শাঁখা আর কাচের চুড়ি, এই তো দেখছি—তা কেমন করে বলবো বলো। হোতে পারে।

—তুমি জানো না, ওসব কলকাতার লোক, পাড়াগাঁয়ে আসবার সময়ে সব খুলে রেখে এসেছে। চুরি যাবার ভয় বড্ড ওদের।

ভাবিয়া চিন্তিয়া পরদিন অবনী যদুবাবুর কাছে দুপুরের পর কথাটা পাড়িল।

—দাদা, একটা কথা ছিল—

—কি হে!

—নানারকমে বড় জড়িয়ে পড়েছি, মেয়েটা বড় হয়ে উঠেছে, বিয়ে না দিলে আর নয়। বড়-দা সেই সোনাগুতির মোকর্দ্দমা করে আড়ালে বিল বিক্রি করে ফেললেন, জানেন তো সব। সেই নিজে মারাও গেলেন, আমাকে একেবারে পথে বসিয়ে রেখে গেলেন। পয়সা অভাবে ছেলেটাকে পড়াতে পারছি নে—তা আমি বলছি কি, ছেলেটাকে আপনার বাসায় রেখে যদি দুটো দুটো খেতে দেন—আর আপনার স্কুলে ·ফ্রি করে নেন

দয়া করে, তবে গরীবের ছেলের লেখাপড়াটা হয়। আপনিও তো ওর জ্যাঠামশায়—

যদুবাবু বুঝিলেন, মাহিনা সম্বন্ধে ও রকম বলা উচিত হয় নাই তখন। পাড়াগাঁয়ের গতিক ভুলিয়া গিয়াছেন বহুদিন না আসার দরুণ। এসব জায়গার লোকে সর্ব্বদা সুবিধা খুঁজিয়া বেড়াইতেছে—চাহিতে চিন্তিতে ইহাদের দ্বিধা নাই, লজ্জা নাই। কি বিপদেই ফেলিল এখন!

মুখে বলিলেন—তা আর বেশি কথা কি।—সুঁটো থাকবে, এ ভাল কথাই তো। তবে এখন স্কুলে ভর্ত্তি করার সময় নয়—সামনের জানুয়ারি মাসে নিয়ে যাবো ওকে—

অবনী পল্লীগ্রামের লোক, পাইয়া বসিল। বলিল—তা কেন দাদা ও বৌদিদির সঙ্গেই যাক না। বাসায় থাকুক, সকালে বিকেলে আপনার কাছে একটু আধটু পড়লেও ওর যথেষ্ট বিদ্যে হবে পেটে। বংশের মধ্যে আপনি এল-এ পাশ করেছেন—আমাদের বংশের চূড়ো আপনি। আমরা সব মুখ্য-সুখ্য। দেখুন, যদি আপনার দয়ায় একটু আধটু ইংরাজি পেটে যায় ওর, পরে করে খেতে পারবে।

যদুবাবু কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন—তা—তা, হবে। বেশ, বেশ।

স্ত্রীকে রাত্রে কথাটা বলিলেন। স্ত্রী বলিল—কে, ওই সুঁটো? ওই দেখতে পিলেরোগা পেটমোটা, ও আধ সের চালের ভাত খায়। সে দিন একটা কাঁটাল একলা খেলে। ওর পেছনে, যা মাইনে পাও, সব যাবে।

—তা তুমি কিছু বলেছ নাকি?

—বলেছি, বলেছি। কি আর করি। তোমাকে নিয়ে যাবার সময় এখন ছিনে জোঁকের মত ধরে না বসে। ও সব লোককে বিশ্বাস নেই রে বাবা।

—কেন, বাহাদুরি করতে গিয়েছিলে যে বড়? এখন সামলাও ঠ্যালা—

যদুবাবুকে আরও বেশি মুস্কিলে পড়িতে হইল। যে দিন তিনি যাইবেন, সে দিন অবনী আসিয়া কুড়ি টাকা ধার চাহিয়া বসিল। না দিলে চলিবে না, সামনের মাসে সে বৌদিদির হাতে কড়ায় গণ্ডায় শোধ করিয়া দিবে। এখন

না দিলে জমিদারের নালিশের দায়ে আমন ধানের জমা বিক্রয় হইয়া যাইবে। সে ( অবনী ) তাঁহাকে বড় দাদার মত দেখে—তিনি না দিলে এ বিপদের সময় সে কোথায় দাঁড়ায়, কাহার কাছে বা হাত পাতে ?

অবনী একেবারে যদুবাবুর পা জড়াইয়া ধরিল। দিতেই হইবে, যদুবাবুর বৌমা পর্য্যন্ত নাকি বট্‌ঠাকুরের কাছে আসিবার জন্ত তৈরি হইয়া আছে টাকার জন্ত।

যদুবাবু প্রমাদ গণিলেন। এমন বিপদে পড়িবেন জানিলে তিনি সাধু কাপালীকে কি ও কথা বলেন ?

বলিলেন—তা একটা কথা। টাকাকড়ি ভায়া এখানে কিছু রাখিনে তো! সব ব্যাঙ্কে। তোমার বৌদিদি বল্লে, পাড়াগাঁয়ে যাচ্ছ—সোনাদানা টাকাকড়ি সব এখানে রেখে যাও—হাতে কেবল যাবার ভাড়াটা রেখেছি ভায়া।

—আজই যাবেন ?

—হ্যাঁ, এখুনি—খাওয়া হোলেই বেরুবো। আজই দশটার গাড়ীতে—

যদুবাবু মনে মনে বলিলেন,—যাও বা থাকতাম আজকার এবেলাটা হয় তো—আর এক দণ্ডও এখানে থাকি! এখন বেরুতে পারলে হয় এখান থেকে।

কিন্তু অবনী মুখুয্যে অভাবগ্রস্ত পাড়াগাঁয়ের লোক, তাহাকে তিনি চেনেন নাই। কিংবা চিনিয়াও ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

অবনী বলিল—বেশ দাদা, চলুন আমিও আপনার সঙ্গে কলকাতা যাই তবে। না হয় যাতায়াতে সাত সিকে পয়সা খরচ হয়ে গেল—টাকাটা এনে জমিদারের দায় থেকে তো বেঁচে যাবো এখন। সাত সিকে খরচ বলে এখন কি করবো—না হয় গুনোগার গেল—

যদুবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—তুমি কেন গাড়ী ভাড়া করে যেতে যাবে ? আমি গিয়েই মনিঅর্ডার করে পাঠাবো। তা ছাড়া আজ—আজ আমি, কি বলে—একটু হালিসহর নামবো কিনা। আমার বড় শালীর বাড়ী। তারা কি গেলেই আজ ছাড়বে ? এক আধ দিন রাখবেই। তুমি মিছেমিছি পয়সা খরচ করবে, অথচ সেই দেরি হয়েই যাবে।

অবনী বলিল—ভালই তো, চলুন না হয়, বৌদিদির বোনের বাড়ী দেখেই আসি—গাঁয়ে থাকি পড়ে, কুটুম্বুবাড়ীর ভালটা মন্দটাও হয় খেয়েই আসি দুদিন—

কোথায় যাইবে অবনী তাঁহার সঙ্গে—তিনি এখন শ্রীশের মেসে গিয়া উঠিবেন। যদুবাবু কি যে বলেন, উপস্থিত বুদ্ধিতে আর কুলায় না। আকাশ পাতাল ভাবাও যায় না সামনে দাঁড়াইয়া।

বলিলেন—বেশ, বেশ—এ তো খুব ভাল কথা, তোমার মত কুটুম্বু যাবে আমার শালীর বাড়ী। তবে একটা কথা ভাবছি আবার। যদি কলকাতায় গিয়ে আমাদের স্কুলের হেড্ মাষ্টারের দেখা না পাই—

—হেড্ মাষ্টার? কেন দাদা—

যদুবাবু এতক্ষণে ভাবিয়া বলিবার একটা রাস্তা খুঁজিয়া পাইয়াছেন। বলিলেন—হেড্ মাষ্টারের কাছে ব্যাঙ্কের বইখানা রয়েছে কিনা। হেড্ মাষ্টার না থাকলে টাকা তুলবো কি করে?

—কারো কাছে চাইলে আপনি দুদিনের জন্য ধার পেয়ে যাবেন দাদা। আপনার কত বন্ধুবান্ধব সেখানে—এ দায় উদ্ধার করতেই হবে আপনাকে। দিন একটা উপায় করে।

—অবিশ্যি তা পেতাম। কিন্তু আমার যে বন্ধুবান্ধব এখন গরমের সময় কেউ নেই কলকাতায়, দার্জ্জিলিং কি সিমলে পাহাড় বেড়াতে গিয়েছে গরমের সময়। কলকাতার ভদ্রলোক, উকিল ব্যারিষ্টার সব—গরমের সময় সব পাহাড়ে চলে যাবে। এ কি তুমি আমি?

—তাই তো দাদা, তবে আমার কি উপায় হবে?

অবনী মুখুয্যে প্রায় কাঁদো কাঁদো হইয়া পড়িল।

যদু বলিলেন—কিছু ভেবো না ভায়া। আমি যাচ্ছি কলকাতায়—গিয়ে একটা যা হয় হিল্লে লাগিয়ে দেবো। কেন তুমি পয়সা খরচ করে অনর্থক যাবে আমার সঙ্গে। আমি চেষ্টা করে দেখে মনিঅর্ডার করে দেবো হাতে পেলেই। আচ্ছা চলি, দুটো খেয়ে নিই—আর দেরি করা চলে না।

যদুবাবু ঝড়ের বেগে সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

মনে মনে বলিলেন—উঃ, কি ছিনে জোঁক রে বাবা! কিছুতেই বাগ মানে না, এত করে ভেবে ভেবে বলি। ভাগ্যিস্ মনে এল হেড্ মাষ্টারের কাছে ব্যাঙ্কের খাতায় ওই ফন্দিটা!

টিনের স্যুটকেস্ হাতে ঝুলাইয়া যদুবাবু তাড়াতাড়ি দুটি খাইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। পাছে অবনী তাহার মত বদলাইয়া ফেলে। কি ঝঞ্ঝাট, এখন মেসে বসাইয়া উহাকে ফ্রেণ্ডচার্জ্জ দিয়া খাওয়াও, থিয়েটার বায়স্কোপ দেখাও, কোথায় বা ব্যাঙ্ক, আর কোথায় বা টাকা!

যদুবাবু শ্রীশ রায়ের মেসে আসিয়া উঠিবার পরে অবনী মুখুয্যের পর পর তিন চারিখানা তাগাদার চিঠি পাইলেন—তিনি উত্তর লিখিয়া দিলেন, হেড মাষ্টার অনুপস্থিত—টাকা ধারের কোনো উপায় হইল না, সে জন্য তিনি খুব দুঃখিত। তবুও চেষ্টায় আছেন। যদুবাবুর স্ত্রী বেচারীর খোঁটা খাইতে খাইতে প্রাণ যাইতেছে। সে বেচারী লিখিল—পরের বাড়ী এমন করিয়া ফেলিয়া রাখা কি তাঁহার উচিত হইতেছে? কবে তিনি আসিয়া লইয়া যাইবেন? আর সে এক দণ্ডও এখানে থাকিতে চায় না।

যদুবাবু স্ত্রীর পত্রের কোন উত্তর দিলেন না।

যদুবাবুরও খুব দোষ দেওয়া যায় না। স্কুল খুলিবার পর প্রত্যেক মাষ্টার মাত্র পনেরো টাকা করিয়া পাইলেন ছুটির মাসের দরুণ। তাহার মধ্যে মেস খরচ করিয়া আর হাতে কিছু থাকে না। এদিকে পুরাতন বাড়ীওয়ালা স্কুলে আসিয়া তাগাদা দিয়া গায়ের ছাল ছিঁড়িয়া খাইবার উপক্রম করিতেছে হেড্ মাষ্টারের সঙ্গে দেখা করিবার ভয় দেখাইয়া গিয়াছে। কেমন ভদ্রলোক সে, দেখিয়া লইবে।

চায়ের দোকানের মজলিসে বসিয়া মাষ্টারের দল পয়সাকড়ির টানাটানির কথা রোজই আলোচনা করে। কারণ, অবস্থা সকলেরই একরূপ। জ্যোতির্বিনোদ বলিলেন—সামান্য ত্রিশটে টাকা, তাও দুমাস বাকি—সাহেবের কাছে বলতে গেলাম, সাহেব আজ দুটাকা দিলে মোটে।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—আমাদেরও তো তাই, সংসার অচল।

যদুবাবু বলিলেন—আমার তো দুর্দ্দশা দেখতেই পাচ্ছ। দুবেলা শাসিয়ে ছে।—ক্ষেত্রভায়া, তোমার ছেলেমেয়ে কোথায় এখন ?

—রেখেছিলাম আমার শাশুড়ীর কাছে দু-মাস। এখন আবার এনেছি—

নারাণবাবু বলিলেন—আহা, বৌমার কথা ভাবলে কি কষ্ট যে পাই মনে। ীস্বরূপিণী ছিলেন। আমি যেন তাঁর বাবা, তিনি মেয়ে—এমন ব্যবহার রতেন আমার সঙ্গে।

উপস্থিত সকলেই ক্ষেত্রবাবুর স্ত্রী-বিয়োগের কথা স্মরণ করিয়া দুঃখ প্রকাশ রিলেন।

ক্ষেত্রবাবু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। তাহার নিগূঢ় কারণও ছিল। এই গ্রীষ্মের ছুটিতে তিনি বর্দ্ধমানে তাঁহার জ্যাঠতুতো ভাইয়ের কাছে গিয়াছলেন। জ্যাঠতুতো ভাই বর্দ্ধমানে রেলে কাজ করেন। বৌদিদি সেখানে তাহার জন্য একটি পাত্রী ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। পাত্রীপক্ষ এজন্য তাঁহাকে অনুরোধ উপরোধও করিয়া গিয়াছে। তিনি এখনও মত দেন নাই বটে, কিন্তু শনিবার হঠাৎ তাঁহার মন বর্দ্ধমানে যাইতে চাহিতেছে কেন!

চায়ের দোকান হইতে বাহির হইয়া টুইশানিতে যাইবার পূর্ব্বে ক্ষেত্রবাবু ওয়েলেস্‌লি স্কোয়ারে একটু বসিলেন। বেঞ্চিখানাতে আর একজন কে বসিয়া ছল, তিনি বসিতেই সে উঠিয়া গেল। ক্ষেত্রবাবু একটু অন্যমনস্ক। পুনরায় বিবাহ করিবার অবশ্য তাহার ইচ্ছা নাই। করিবেনও না। তবে আর একটা কথাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বিশেষ কষ্ট। সেই তিনি স্কুলে চলিয়া আসিয়াছেন। বড় মেয়েটার উপরে সব ভার —তার বয়স এই মাত্র সাড়ে সাত। সে-ই রান্না-বান্না, ছোট ভাইবোনদের াওয়ানো মাখানোর ঝুঁকি ঘাড়ে লইয়া গৃহিণী সাজিয়া বসিয়া আছে। কিন্তু আজ যদি একটা শক্ত অসুখ বিসুখ হয় কাহারও—কে দেখাশোনা করিবে তাদের? এ সব ভাবিয়া দেখিবার জিনিষ।

স্কুলের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইয়া আসিতেছে। গ্রীষ্মের ছুটির পর দুমাস লিয়া গিয়াছে, অথচ ছুটির মাহিনা এখনও সম্পূর্ণ শোধ হয় নাই। সাহেবকে

বার বার বলিয়াও কোনো ফল হয় না—সাহেবের এক কথা, এবছর কষ্ট সহ্য করিতে হইবেই। যাহার না পোষায়, সে চলিয়া যাইতে পারে।

একদিন সাহেবের সার্কুলার অনুযায়ী ছুটির পর সাহেবের আপিসে শিক্ষকদের হাজির হইতে হইল। সাহেব বলিলেন, আজ একটা বিশেষ জরুরী মিটিং করা দরকার। থার্ড ক্লাসে গণিতের ফল আদৌ ভাল হইতেছে না, এ বিষয়ে শিক্ষকদের লইয়া পরামর্শ করা নিতান্ত আবশ্যক।

মিটিং চলিল। হতভাগ্য টিচারের দল খালিপেটে শ্রান্তদেহে পাঁচটা পর্য্যন্ত নানারূপ কৌশল উদ্ভাবন করিতে ব্যস্ত রহিল—থার্ড ক্লাসে কি করিয়া এ্যালজেব্রা ভালরূপে শিখানো যায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে কোনো বৈদেশিক শক্তি যুদ্ধ ঘোষণা করিলে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী এতদপেক্ষা অধিক আগ্রহ ও উদ্যোগ দেখাইতে পারিতেন না তাঁহার ক্যাবিনেট মিটিংএ।

পাঁচটা বাজিয়া গেল। তখনও প্রস্তাবের অন্ত নাই। থার্ড ক্লাসের গণিত-শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত টিচার হতভাগ্য শেখরবাবু ম্লানমুখে বসিয়া শুনিয়া যাইতেছেন—কারণ, এ অবস্থার জন্য তিনিই ধর্ম্মতঃ দায়ী। তাঁহার দপ্তরেই এ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। উক্ত মাসের গত দুইটি সাপ্তাহিক পরীক্ষায় গণিতের ফল আদৌ আশাপ্রদ হয় নাই।

সাড়ে পাঁচটার সময় হেড্‌মাষ্টার উঠিয়া ধীরে ধীরে গণিত শিক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ পাঠ শুরু করিলেন, খাতার বহর দেখিয়া মনে হইল, সাড়ে ছ'টার কমে সে প্রবন্ধ শেষ হইবে না।

হঠাৎ নতুন টিচার দাঁড়াইয়া বলিলেন—স্যার, আমার একটা কথা বলবার আছে।

হেড্‌মাষ্টার প্রবন্ধ পাঠ করিতেছিলেন, থামিয়া মুখ তুলিয়া বিস্মিত ভাবে নতুন টিচারের দিকে চাহিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—ইয়েস্?

—স্যার, ছ'টা বাজে, মাষ্টারেরা সকলেই ক্ষুধার্ত্ত। আজ এই পর্য্যন্ত থাকলে ভাল হয়।

নতুন টিচারের সাহস দেখিয়া সবাই বিস্মিত ও স্তম্ভিত।

হেড্ মাষ্টার বলিলেন—জানো মিষ্টার, আমি আমার বক্তব্যের মধ্যে কোনো বাধা সৃষ্টি পছন্দ করি না।

—স্যার, আমায় ক্ষমা করবেন। স্পষ্ট কথা বলবার সময় এসেছে। আপনার এরকম মিটিং মাষ্টারদের পক্ষে বড় কষ্টদায়ক হয়। এতে স্কুলের কাজ হয় না।

—স্কুলের কাজ কি তোমার কাছে আমায় শিখতে হবে?

—আপনিই ভেবে দেখুন, এতে স্কুলের কি ভাল হচ্ছে? ছেলে ছেড়ে গিয়েছে, রিজার্ভ ফণ্ড নেই, মাইনে পাইনে আমরা নিয়মমত—অথচ আপনি এই সব শিক্ষকদের নিয়ে আলোচনা-সভার প্রহসন করছেন—আপনিই ভেবে দেখুন, এতে কি উপকার হয়? এই সব টিচার, এঁরা মুখ ফুটে বলতে পারেন না—কিন্তু চারটের পর আপনি এঁদের কাছ থেকে ভাল কিছু আশা করতে পারেন কি?

এবার হেড মাষ্টারের পালা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইবার। একজন সামান্য বেতনের টিচারের কাছে তিনি এ ধরণের সোজা ও স্পষ্ট কথা প্রত্যাশা করেন নাই।

বলিলেন—আমি কতদিন হেড্ মাষ্টারি করছি, তা তোমার জানা আছে?

—তা আমার জানবার দরকার নেই স্যার। কিন্তু আপনার এই শাসন-প্রণালী যে আদৌ ফলপ্রদ নয়, তা আপনাকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়াতে আপনি আমায় শত্রু ভাববেন না। আমি বন্ধুভাবেই একথা বলছি। আপনাকে সদুপদেশ দেওয়ার লোক নেই।

মাষ্টারেরা সকলে কাঠের মত বসিয়া আছেন। এমন একটা ব্যাপার তাঁহারা কখনো এ স্কুলে ঘটিতে পারে বলিয়া কল্পনাও করেন নাই। দু-চারিজন সপ্রশংস দৃষ্টিতে নতুন টিচারের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নতুন টিচার যে এমন চোস্ত ইংরাজি বলিতে পারদর্শী, এ তথ্য আজই তাঁহারা অবগত হইলেন।

হেড্ মাষ্টারের মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি বলিলেন—তুমি কি বলতে চাও আমি স্কুল চালাতে জানি নে?

নতুন টিচার কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে নারাণবাবু

নতুন টিচারকে বলিলেন—ভায়া, ছেড়ে দাও। আর তর্ক-বিতর্ক করো না—সাহেব যা বলছেন, ওনার ওপর আর কথা বোলো না।

আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই সভাতেই সাহেবের সামনে দু-তিনজন টিচার, তাঁহাদের মধ্যে ক্ষেত্রবাবু ও শ্রীশবাবু আছেন—নারাণবাবুর মধ্যস্থতা করিতে যাওয়ায় স্পষ্টতঃই বিরক্তি প্রকাশ করিলেন।

পিছন হইতে হেড্ মৌলবী বলিল—আহা, বলতে দ্যান না ওঁনাকে। নারাণবাবু বাধা দেবেন না।

আলম বেঞ্চির কোণে চুপ করিয়া বসিয়া আছে, মুখে কথাটি নাই।

নতুন টিচার বলিলেন—স্যার, আপনি ভেটারান্ হেড্মাষ্টার, স্কুল চালাতে জানেন না, তাই কি বলছি? কিন্তু আপনি স্কুলের বাজেট্ দেখে ব্যয়সঙ্কোচের ব্যবস্থা করুন, দু মাসের মাইনে পায়নি যে সব মাষ্টার, তাদের নিয়ে ছটা পর্য্যন্ত মিটিং করা চলে কি স্যার?

নারাণবাবু বলিলেন—থাম ভায়া, থাম।

দু তিনজন টিচার একসঙ্গে বলিয়া উঠিল—নারাণদা, ওকে বলতে দিন।

হেড্ মাষ্টার দেখিলেন সভার সমবেত মত তাঁহারই বিরুদ্ধে—নতুন টিচারের স্বপক্ষে।

তাঁহার নিজের স্কুলে বসিয়া এই তাঁহার প্রথম পরাজয়।

একটা দুর্ব্বল কথা তিনি হঠাৎ বলিয়া বসিলেন। বলিলেন—কেন, চারটের পর আমি মাষ্টারদের জন্যে জলখাবারের ব্যবস্থা তো করে দিই। আজ যদি তোমাদের খিদে পেয়ে থাকে, আমাকে আগে জানালেই আমি ব্যবস্থা করতাম।

সকলেই বুঝিল, হেড্মাষ্টারের এ উক্তি দুর্ব্বলতাজ্ঞাপক।

নতুন টিচার বলিলেন—সামান্য দু'চারখানা লুচি জলখাবারের কথা ধরিনি স্যার। সে যাঁরা খেতে চান, তাঁরা খেতে পারেন। আমার বলবার উদ্দেশ্য—মাষ্টারদের ওপর নানা দিক্ থেকে অন্যায় হচ্ছে—আপনি এর প্রতিকার করুন।

হেড্মাষ্টার যে আদৌ দমেন নাই, ইহা দেখাইবার জন্য মুখখানাতে

গর্ব্বসূচক হাসি আনিয়া সকলের দিকে একবার চাহিয়া লইয়া বলিলেন— শীগ্‌গির তোমরা আমার মতলব জানতে পারবে স্কুলের উন্নতি সম্বন্ধে।

বলিয়াই চশমাটি খুলিয়া ধীরভাবে মুছিয়া ফেলিতে ফেলিতে কৃত্রিম উৎসাহের সঙ্গে বলিলেন—আচ্ছা, এখন আমরা আমাদের প্রবন্ধ পাঠ আরম্ভ করি—কোন্ পর্য্যন্ত পড়েছিলাম তখন? দেখি—

এমন ভাব দেখাইবার চেষ্টা করিলেন, যেন নতুন টিচারের মন্তব্য তিনি গায়েই মাখেন নাই। ও রকম বহু অর্ব্বাচীনের উক্তি তিনি বহুবার শুনিয়াছেন, কিন্তু ওসব শুনিতে গেলে তাঁহার চলে না।

সাড়ে ছ'টার সময় প্রবন্ধ শেষ হইল। ইতিমধ্যে যদুবাবু কখন্ খাবারের টাকা হইয়া গিয়াছিলেন, কেহ লক্ষ্য করে নাই—তিন টুক্‌রি লুচি কচুরি আলুর দম কখন্ আসিয়া পৌঁছিয়া গিয়াছে।

হেড্‌মাষ্টার নিজে দাঁড়াইয়া শিক্ষকদের খাওয়ার তদারক করিলেন।

নতুন টিচারের মর্য্যাদা যথেষ্ট বাড়িয়া গেল স্কুলে এই দিনটির পর হইতে। দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ক্লার্কওয়েল যার সামনে হঠাৎ নরম হইয়া সরু সুতা কাটিতে লাগিল, তাহার ক্ষমতা আছে বই কি।

মিঃ আলম হেড্‌মাষ্টারকে বলিলেন—স্যার, আপনার মুখের ওপর তর্ক করে, আপনি তাই সহ্য করলেন কাল? বলুন, আজই পড়ানোর ভুল ধরে রিপোর্ট করে দিচ্ছি—দিন ওর চাকরী খেয়ে—

—নতুন টিচার অত ভাল ইংরাজি বলে, আমি জানতাম না মিঃ আলম। আমি ওর ক্লাস-ওয়ার্ক আগেও দেখেছি। তাকে খারাপ বলা যায় না ঠিক।

—স্যার, আমার কাল রাগ হচ্ছিল ওর বেয়াদবি দেখে—আর দেখলেন, মাষ্টারেরা প্রায় অনেকেই ওকে সাপোর্ট করলে?

—সেটা আমিও ভেবেছি। মাষ্টারেরা মাইনে ঠিকমত পায় না বলে অসন্তুষ্ট। অসন্তুষ্ট লোক দিয়ে কাজ হয় না। স্কুলের বজেট্‌টা সামনে বছর থেকে ব্যালান্স্ না করাতে পারলে আর এরা সন্তুষ্ট হচ্ছে না।

—স্যার, কাল কোন্ কোন্ টিচার ওকে সাপোর্ট করেছিল, তাদের নাম আমি লিখে রেখেছি।

—নামগুলো দিও আমার কাছে।

—বলেন তো ওদের ক্লাস ওয়ার্ক দেখি আজ থেকে। রিপোর্ট করি।

একদিন মিঃ আলম চুপি চুপি সাহেবের কাছে বলিল—স্যার, মাষ্টারেরা নতুন টিচারকে নিয়ে দল পাকাচ্ছে।

—কে কে?

—স্যার,—ক্ষেত্রবাবু, যদুবাবু, শ্রীশবাবু, জ্যোতির্বিনোদ, দত্ত, বোস্—কেবল নারাণবাবু নয়।

—নারাণবাবু ইজ অ্যান ওল্ড্ লয়্যালিষ্ট—

—স্যার, নতুন টিচারকে নিয়ে দল পাকায়—মোড়ের ওই চায়ের দোকানে রোজ ছুটির পর ওদের মিটিং হয়। নতুন টিচার ওদের দলপতি।

—তোমাকে কে বল্লে?

—ক্লার্ক সুবল যে আমায় সব কথা বলে। ও ওদের দলে যোগ দিয়ে শুনে এসে আমায় বলেছে। আমাদের স্কুলের সম্বন্ধে ইউনিভার্সিটীতে নাকি ওরা জানাবে। নতুন টিচারের কে আত্মীয় আছে ইউনিভার্সিটীতে—

—দেখ মিঃ আলম, যে যা পারে করুক। আর ও-সব স্পাইগিরি আমি পছন্দ করি নে। এটা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, এর মধ্যে ও-সব দলাদলি, পার্টি পলিটিক্স,—আই হেট্। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছেলেদের শিক্ষা, স্কুলকে ভাল করবো। গড্ ইজ্ অন্ মাই সাইড্—

—আমার মনে হয়, ওই নতুন টিচারকে না তাড়ালে স্কুলে দলাদলি আরও বাড়বে। ওই ভাঙবে স্কুলটাকে। ও লোক সুবিধে নয়।

কিন্তু এ রিপোর্টে ফল উল্টা হইল। সাহেবের কাছে মাস দুইয়ের মধ্যে নতুন টিচারের প্রতিপত্তি বাড়িয়া গেল। মাষ্টারেরা সব নতুন টিচারকে লিডার বানাইয়াছে—তাহাদের অভাব অভিযোগের কথা নতুন টিচারের মুখে ব্যক্ত হয় হেড্‌মাষ্টারের কাছে। আজ ইহাকে দু'টাকা আগাম দিতে হইবে,

কাল টিচার্স এইড্ ফড্ হইতে উহাকে পাঁচ টাকা ধার দিতে হইবে—নতুন টিচারকে মুখপাত্র করিয়া সবাই পাঠাইয়া দেয়।

সাহেব বলেন—কি, রামেন্দুবাবু—

—স্যার, আজ যদুবাবুকে কিছু আগাম দিতে হবে—

—কেন? ও মাসে দেওয়া হয়েছে সাত টাকা—

—ওর বড় ঠেকা। দেনা হয়েছে—

—বড় অবিবেচক লোক ওই যদুবাবু। আমি শুনেছি, ও রেস্ খেলে—

—না স্যার। রেস্ খেলার পয়সা কোথায় পাবে? মেসে থাকে এখানে—

মিঃ আলমের কানে কথাটা উঠিল। আজকাল নতুন টিচার সাহেবের কাছে মাষ্টারদের জন্য সুপারিশ করে এবং তাহাতে ফলও হয়। আলম একদিন সুবল দে কেরাণীকে বাহিরে একটা চায়ের দোকানে লইয়া গেলেন। বলিলেন—সুবল, এ সব হচ্ছে কি?

—কি বলুন স্যার—

—সাহেব নাকি ওই নতুন টিচারের কথা খুব শুনছেন—

—তাই মনে হয় স্যার। সে দিন জ্যোতির্ব্বিনোদকে দুদিন ছুটি দিলেন ওঁর সুপারিশে।

—কেন, কেন?

—জ্যোতির্ব্বিনোদের ভাগ্নীর বিয়ে।

জ্যোতির্ব্বিনোদের ক্যাজুয়াল লিভের হিসেবটা চেক্ করে কাল আমায় জানিও তো। বুঝলে?

—বেশ, স্যার।

—স্কুলে যা তা হচ্ছে—না?

কেরাণী চুপ করিয়া রহিল। কেরাণী মানুষ, বড় টিচারের সামনে যা তা বলিয়া কি শেষে বিপদে পড়িবে? মিঃ আলম বলিলেন—তোমার কি মনে হয়?

—স্যার, আমরা চুণোপুঁটির দল, আমাদের কিছু না বলাই ভালো—

—নতুন টিচার বড় বাড়িয়েছে, না?

। তবে একটা কথা—

—কি ?

—স্যার, নতুন টিচার রামেন্দুবাবু কিন্তু লোকের অসুবিধে বা উপকার, এই ধরণের ছাড়া অন্য কথা নিয়ে সাহেবের কাছে যায় না।

—তুমি কি করে জানলে ?

—আমি জানি স্যার। সেই জন্তেই মাষ্টারবাবুরা ওঁর খুব বাধ্য হয়ে পড়েছেন—

—যাক্। তোমার আর ব্যাখ্যা করতে হবে না। তুমি কাল জ্যোতির্ব্বিনোদের ক্যাজুয়্যাল লিভ্‌টা চেক্ করে আমায় জানাবে—কেমন তো ?

—হ্যাঁ স্যার্। তা করে দেবো—বলেন তো আজই দিই—

—কালই দেবে।

পরদিন হিসাব করিয়া ধরা পড়িল, জ্যোতির্ব্বিনোদের তিন দিন ছুটি বেশি লওয়া হইয়া গিয়াছে এ বছর। মিঃ আলম সাহেবের কাছে রিপোর্ট করিলেন। জ্যোতির্ব্বিনোদের পাঁচ দিনের বেতন কাটা গেল। মিঃ আলম হাসিয়া নিজের দলের মাষ্টারদের বলিলেন—লিডার হোলেই হল না। সব দিকে দৃষ্টি রেখে তবে লিডার হোতে হয়। স্কুলটাকে এবার উচ্ছন্ন দেবে আর কি। সাহেবেরও আজকাল হয়েছে যেমন।

হেড্‌পণ্ডিত ছুটিপ্রার্থী হইয়া সাহেবের টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়াছেন। সাহেব মুখ তুলিয়া বলিলেন—হোয়াট, পাণ্ডিট্ ?

—স্যার, কাল তালনবমী, টিচারেরা ও ছেলেরা ছুটি চাচ্ছে—

—টালনব হোয়াট ইজ্ ছাট্ পাণ্ডিট্ ? নেভার হার্ড দি নেম্—

—স্যার, মস্ত বড় পরব হিন্দুর। দুর্গাপুজোর নীচেই—মস্ত পরব।

সাহেব চিন্তা করিয়া বলিলেন—না পণ্ডিত, এ বছর একশো দিন ছাড়িয়েছে। ইন্‌স্পেক্টর আপিসে গোলমাল করবে। কি তুমি বলছো টাল—কি ?

—তালনবমী।

—ফানি নেম্—যাই হোক, ওতে ছুটি দেওয়া চলে না।

হেড্‌পণ্ডিত মাষ্টারদের শেখানো ইংরাজি আওড়াইয়া বলিলেন—নেকস্‌ট্‌ টু দুর্গাপুজা, স্যার—গ্রেট্‌—গ্রেট্‌—ইয়ে—

'ফেষ্টিভ্যাল' কথাটা ভুলিয়া গিয়াছেন, অত বড় কথা মনে আনিতে পারিলেন না।

সাহেব হাসিয়া বলিলেন—ইয়েস্‌, আণ্ডারষ্টাণ্ড্‌—ইউ মিন ফেষ্টিভ্যাল—আমি বুঝেছে। হবে না। ক্লাসে পড়াওগে যাও।

সকলেই জানিল, ছুটি হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ঠিক শেষ ঘণ্টায় মথুরা চাপরাসিকে সার্কুলার-বই লইয়া ক্লাসে ক্লাসে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে দেখা গেল। তালনবমীর ছুটি হইয়া গিয়াছে।

মনে সকলেরই খুব ক্ষূর্ত্তি। জ্যোতির্ব্বিনোদের ঘরে ছাদের উপর অনেকে আড্ডা দিতে গেলেন। জ্যোতির্ব্বিনোদ বলিলেন—বাব্‌বা, কাল সেই পাগল বৌটার কি কাণ্ড রাত্রে—

হেড্‌পণ্ডিত বলিলেন—কি হয়েছিল ?

—আরে, কখনো কাঁদে, কখনো হাসে। রাত্রে ছাদে কতক্ষণ বসে রইল। ওর দুই দেওর এসে শেষে ধরে নিয়ে গেল। মারলেও যা।

নারাণবাবু বলিলেন—বড় কষ্ট হয় মেয়েটার জন্যে। ওর অদৃষ্টটাই খারাপ।

যে বাড়ীর বধূর কথা বলা হইতেছে, বাড়ীটি বেশ বড়লোকের, স্কুলের পশ্চিম দিকে, গত ছ'মাসের মধ্যে বাড়ীটাতে অনেকগুলি বিবাহ হইয়াছিল খুব জাঁকজমকের সঙ্গে। সেই হিড়িকে এই মেয়েটিও বধূরূপে ও বাড়ীতে ঢোকে—কারণ, তাহার পূর্ব্বে মাষ্টারেরা আর কোনো দিন উহাকে দেখেন নাই ও বাড়ীতে। কিন্তু বিবাহের মাসখানেক পর হইতেই বধূটি কেন যে পাগল হইয়া গিয়াছে—তাহা ইহারা কি করিয়াই বা জানিবেন। তবে বধূটি যে আগে ভাল ছিল, এ ব্যাপার ইহারা স্বচক্ষেই দেখিয়াছেন।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—হ্যাঁ হে, সেই পার্শী মেয়েটাকে আর তো দেখা যায় না ও বাড়ীতে।

শ্রীশবাবু বলিলেন—ও বাড়ীতে অন্য ভাড়াটে এসে গিয়েছে। তারা চলে গিয়েছে।

—কি করে জানলে ?

—এই দিন দশ পনেরো থেকে দেখছি, ছাদে বাঙালী মেয়ে, গিন্নি, পুরুষ মানুষ ঘোরে।

পার্শী মেয়েটিকে ইহারা সকলেই প্রায় দু-বছর ধরিয়া দেখিয়া আসিতেছেন। তার আগে বছর পাঁচেক ও বাড়ীতে অন্য ভাড়াটে দেখিয়াছিলেন। মেয়েটি ছাদের লোহার চৌবাচ্চার ছায়ায় বসিয়া একমনে বেণী পিঠের উপর ফেলিয়া বসিয়া পড়িত—যেন সাক্ষাৎ সরস্বতীপ্রতিমা। কোনো স্কুল বা কলেজের ছাত্রী হইবে। দুপুরে বা বিকালে সতরঞ্চির উপর একরাশ বই ছড়াইয়া পড়িত—কি একাগ্র মনে পড়িত !

তাহাকে লইয়া মাষ্টারদের কত জল্পনা কল্পনা।

—আচ্ছা ও কি স্কুলের ছাত্রী ?

—কিন্তু ওর বয়েস হিসেবে কলেজের বলেই মনে হয়।

—খুব বড়লোক—না ?

—এমন আর কি। ফ্ল্যাট নিয়ে তো থাকে। ওদের চাল খুব বেশি—পার্শী জাতটার—

—বিয়ে হয়েছে বলে মনে হয় ?

এইরকম কত কথা, সে তরুণী পার্শী ছাত্রীটি বিবাহিতা হইলেই বা কাহার কি, না হইলেই বা তাহাতে মাষ্টারদের কি লাভ—তবুও আলোচনা করিয়া সুখ।

অধিকাংশ মাষ্টার এ স্কুলে বহুদিন ধরিয়া আছেন—দশ, তেরো, আঠারো, বিশ বছর। এই উঁচু তেতালার ছাদ হইতে চারি পাশের বাড়ীগুলিতে কত উত্থানপতন পরিবর্তন দেখিলেন। অনেকে বাড়ী যাইতে পান না পয়সার অভাবে, যেমন জ্যোতির্বিনোদ, কি নারাণবাবু, কিংবা মেস্-পালিত শ্রীশবাবু—গৃহস্থবাড়ীর মা, বোন, মেয়ে, ইহাদের চলচ্চিত্র মাত্র এত উঁচু হইতে দেখিতে পান—এবং দেখিয়া কখনও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন নিজেদের নিঃসঙ্গ জীবনের কথা ভাবিয়া, কখনও আনন্দ পান, কখনও পরের দুঃখে দুঃখিত হন, উদ্বিগ্ন হন। এই চলিতেছে বহুদিন ধরিয়া।

এ এক অদ্ভুত জীবনানুভূতি—দূর হইয়াও নিকট, পর হইয়াও আপন, অথচ যে দূর, সে দূরই, যে পর, সে পরই। অনেক কুশ্রী ঘটনাও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ওই লাল বাড়ীটাতে ন-বৎসর আগে একটি মেয়ে একটি ছেলের সঙ্গে পলাইয়া গিয়াছিল—এদিকের ওই বাড়ীটাতে প্রৌঢ়া গৃহিণীকে প্রত্যেক দিন—থাক্, সে সব কথায় দরকার নাই।

কত দুঃখের কাহিনীও এই সঙ্গে মনে পড়ে। ওই পূবদিকের হলদে দোতালা বাড়ীটাতে আজ প্রায় সাত আট বছর আগে স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে আত্মহত্যা করে। এতদিন পরেও সে কথা টিফিনের ছুটির সময় মাঝে মাঝে ওঠে। বেকার স্বামী, পরিবার প্রতিপালন করিতে না পারিয়া স্ত্রীর সঙ্গে মিলিয়া বেকার জীবনের অবসান করে।

সে সব দিনে ক্লার্কওয়েল সাহেব ছিল না। ছিলেন সুধীর মজুমদার হেড-মাষ্টার। অনুকূলবাবুর পরের কথা।

হেড্ পণ্ডিত বলেন—অনেকদিন হয়ে গেল এ স্কুলে যদু ভায়া—কি বল? সেই বৌবাজার স্কুল ভেঙে এখানে আসি—মনে পড়ে সে-কথা? হেড্-মাষ্টারের নাম কি ছিল যেন—শশিপদ কি যেন? আমার আজকাল ভুল হয়ে যায়, নাম মনে আনতে পারিনে।

যদুবাবু বলেন—শশিপদ রায় চৌধুরী। বৌবাজার থেকে তিনি তারপর রাণী ভবানীতে গিয়েছিলেন—মনে নেই?

—আমরা তো স্কুল ভেঙে গেলে চলে এলুম। শশিবাবুর আর কোনো খোঁজ রাখিনে। এ স্কুলে তখন অনুকূলবাবু হেড্ মাষ্টার। ওঃ, অমন লোক আর হয় না। আমাদের নারাণ দাদা সেই আমলের লোক—না দাদা?

নারাণবাবু বলেন—আমি তারও কত আগের। তুমি আর যদু এসেছ এই আঠারো বছর, আমি তারও বারো বছর আগে থেকে এখানে। অনুকূল-বাবুতে আমাতে মিলে স্কুল গড়ি।

ক্ষেত্রবাবু বলেন—আপনারা গড়লেন স্কুল, এখন কোথা থেকে মিঃ আলম আর সাহেব এসে নবাবি করছে তাখো।

নারাণবাবু বলেন—আমি কিছু নই, অনুকূলবাবু গড়েন স্কুল। তাঁর মত

ক্ষমতা যার-তার থাকে না। অনুকূলবাবুর মত লোক হচ্ছে এই সাহেব। সত্যিকার ডিউটিফুল হেড্‌মাষ্টার হিসেবে সাহেব অনুকূলবাবুর জুড়িদার। লেখাপড়া শেখে সবাই—কিন্তু অন্যকে শেখানো সবাই পারে না। যে পারে, তাকে বলে টিচার। তুমি আমি টিচার নই—টিচার ছিলেন অনুকূলবাবু, টিচার হোল এই সাহেব।

হেড্‌পণ্ডিত বলেন—না, দাদা, আপনি টিচার নিশ্চয়ই। আমরা না হোতে পারি—

নারাণবাবু বলেন—অত সহজে টিচার হয় না। এই শুনবে তবে অনুকূলবাবুর এক একটা ঘটনা? একবার একটা ছেলে এল, তার বাবা বর্ম্মায় ডাক্তারি করে দু'পয়সা পায়। ছেলেটাকে আমাদের স্কুলে দিয়ে গেল বাংলা শিখবে বলে। বর্ম্মী ভাষা জানে, বাংলা ভাল শেখে নি। পয়সাওয়ালা লোকের ছেলে, বদমাইসও খুব। স্কুল পালায়, বাবা মোটা টাকা পাঠায়—সেই টাকায় থিয়েটার দেখে, হোটেলে খায়, পড়াশুনোয় মন দেয় না।

—এখানে থাকে কোথায়?

—থাকে তার এক আত্মীয়-বাড়ী। সেই ছেলের জন্যে অনুকূলবাবুকে রাতের পর রাত বসে ভাবতে দেখেছি। আমায় বল্লেন—নারাণ, মারধোর বা বকুনিতে ওকে ভাল করা যাবে না। উপায় ভাবছি। তারপর ভেবে করলেন কি, রোজ সেই ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বার হোতেন, আর মুখে মুখে গল্প করতেন পাপের দুর্দ্দশা, অধঃপতনের ফল—এই সব সম্বন্ধে। গল্প নিজেই বসে বসে বানাতেন রাত্রে। আমায় আবার শোনাতেন পয়েন্ট্‌-গুলো। সেই ছেলে ক্রমে শুধরে উঠলো, ম্যাট্রিক পাশ করে বেরুলো। তার বাবা এসে অনুকূলবাবুকে একটা সোনার ঘড়ি দেয় ছেলে পাশ করলে। অনুকূলবাবু ফিরিয়ে দিয়ে বল্লেন—আমায় এ কেন দিচ্ছেন। আমার একার চেষ্টায় ও পাশ করেনি, আমার স্কুলের অন্যান্য মাষ্টারের কৃতিত্ব না থাকলে আমি একা কি করতে পারতাম। তা ছাড়া, আমি কর্ত্তব্য পালন করেছি, ভগবানের কাছে আপনার ছেলের জন্যে আমি দায়ী ছিলাম—কারণ, আমার স্কুলে তাকে আপনি ভর্ত্তি করেছিলেন। সে দায়িত্ব পালন করেছি, তার জন্যে

কোনো পুরস্কারের কথা ওঠে না।—আজকাল ক'জন শিক্ষক তাদের ছাত্রের সম্বন্ধে একথা ভাবেন বলুন দিকি? আদর্শ শিক্ষক বলতে যা বোঝায়, তা ছিলেন তিনি। আমাদের সাহেবকে দেখি, অনেকটা সেইরকম ভাব আছে ওঁর মধ্যে।

ক্ষেত্রবাবু ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন—দাদা, এতক্ষণ অনুকূলবাবুর কথা বলছিলেন, বেশ লাগছিল। আবার সাহেবকে তাঁর সঙ্গে নাম করতে যান কেন?

নারাণবাবু গম্ভীর মুখে বলিলেন—কেন করি তোমরা জানো না—আই নো এ রিয়াল টিচার হোয়েন দেয়ার ইজ্ ওয়ান্—আমার কথা শোনো ভায়া, সাহেবকে তোমরা অনেকেই চেনো নি।

শিক্ষকের দল পরস্পরের কাছে বিদায় গ্রহণ করিলেন; কারণ, সকলেরই টুইশানির সময় হইয়াছে।

পূজার ছুটির মাসখানেক দেরি। স্কুলের অবস্থা খুবই খারাপ। হেড্ মাষ্টার সার্কুলার দিলেন যে, যে মাষ্টারের নিতান্ত দরকার, তাহারা আসিয়া জানাইলে কিছু কিছু টাকা দেওয়া হইবে, বাকি শিক্ষকদের ছুটির পর স্কুল খোলা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে মাহিনা লওয়ার জন্য।

স্কুলে শিক্ষদের মধ্যে হট্টগোল পড়িয়া গেল।

যদুবাবু বলিলেন—এ সার্কুলারের মানে কি হে ক্ষেত্র ভায়া? আমাদের মধ্যে কে তালেবর আছে, যার টাকার দরকার নেই?

ক্ষেত্রবাবু কিছু জানেন না—তবে তাঁহার নিজের টাকার দরকার, এটুকু জানেন।

শ্রীশবাবু বলিলেন—তোমার যেমন দরকার, গরীব মাষ্টার—পুজোর সময় শুধু-হাতে বাড়ী যেতে হবে সারা বছর খেটে—সকলেরই দরকার। রামেন্দুবাবুকে সকলে বলা যাক্।

কিন্তু শোনা গেল, টাকা আদৌ নাই। আশামত আদায় হয় নাই—যা আদায় হইয়াছে, বাড়ীভাড়া আর কর্পোরেশন ট্যাক্স দিতেই যাইবে, যাহা কিছু উদ্বৃত্ত থাকিবে—নিতান্ত অভাবগ্রস্ত শিক্ষকদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।

সে দিন টিচারদের ঘরে হঠাৎ মিঃ আলমের আগমনে সকলেই বিস্মিত হইল। মাষ্টারদের বসিবার ঘরে মিঃ আলম বড় একটা আসেন না।

মিঃ আলমকে দেখিয়া মাষ্টারেরা সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। যে বসিয়া ছিল, সে উঠিয়া দাঁড়াইল, যে শুইয়া ছিল, সে সোজা হইয়া বসিল।

মিঃ আলম হাসিমুখে চারি দিকে চাহিয়া বলিলেন—বসুন, বসুন।

তারপর ধীরে ধীরে নিজের আগমনের উদ্দেশ্য পাড়িলেন। হেড্ মাষ্টারের এই যে সার্কুলার, এ নিতান্ত জুলুমবাজি। কাহার টাকার জন্য কে এখানে খাটিতে আসিয়াছে?

সকলে এ উহার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। মিঃ আলম সাহেবের বিশ্বাসী লেফটেন্যান্ট—তাহার মুখে এ কি কথা? সাহেবের স্পাই হিসাবেও মিঃ আলম প্রসিদ্ধ। কে কি কথা বলিবে তার সামনে?

মিঃ আলম বলিলেন—না, সাহেবকে দিয়ে এ স্কুলের আর উন্নতি নেই। আমি আপনাদের কো-অপারেশন্ চাই। আমার সঙ্গে মিলে সবাই সাহেবের বিরুদ্ধে সেক্রেটারির কাছে আর প্রেসিডেন্টের কাছে যান। স্কুলের যা আয়, তাতে মাষ্টারদের বেশ চলে যায়। সাহেব আর মেম পুষতে সাড়ে চার শো টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে—এ স্কুলের হাতী পোষার ক্ষমতা নেই। আসুন, আমরা ম্যানেজিং কমিটিকে জানাই।

যদুবাবু প্রথমে কথা বলিলেন। তাঁহার ভাব বা আদর্শ বলিয়া জিনিস নাই কোনো কালে, সুবিধা ও স্বার্থ লইয়া কারবার। তিনি বলিলেন—ঠিক বলেছেন মিঃ আলম। আমিও তো ভেবেছি।

মিঃ আলম বলিলেন—আর কে কে আমাকে সাহায্য করতে রাজি?

জ্যোতির্ব্বিনোদের রাগ ছিল হেড্ মাষ্টারের উপর, বলিলেন—আমি করবো।

যদুবাবু বলিলেন—আমিও।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—আমিও।

শ্রীশবাবুও সাহায্য করিতে রাজি।

কেবল নতুন টিচার ও নারাণবাবু, চুপ করিয়া রহিলেন।

মিঃ আলম বলিলেন—কি রামেন্দুবাবু, আপনি কি বলেন ?

নতুন টিচার বলিলেন—আমি ছুবছর প্রায় হোল, এ স্কুলে এসেছি, যা বুঝেছি এ স্কুলের উন্নতি নেই। স্কুলের বজেট্ যিনি দেখেছেন, তিনিই এ কথা বলবেন। মিঃ আলম যা বলেছেন, তা খুবই ঠিক।

—তা হোলে আপনি আমাকে সাহায্য করুন।

—কি জন্যে সাহায্য চান ?

—টু রিমুভ্ দি প্রেজেন্ট্ হেড্ মাষ্টার। আশী টাকার হেডমাষ্টার রাখলে স্কুল চলে যায়, মেমের কি দরকার ? ওতে ছেলে বাড়ছে না যখন, তখন হাতী পোষা কেন ? আমরা অনাহারে আছি, আর সাহেব মেম সাড়ে চার শো টাকা নিয়ে যাচ্ছে।

—ঠিক কথা।

—তবে আপনি কি করবেন ?

—আমি এতে নেই।

—কেন ?

প্রকাশ্যভাবে প্রতিবাদ করি বলে গোপনে শত্রুতা করতে পারবো না—মাপ করবেন মিঃ আলম। তবে আমি নিউট্রাল থাকবো। কারো দিকে হবো না, এ কথা আপনাকে দিতে পারি।

—বেশ, তাই থাকুন। নারাণবাবু ?

—আমি বুড়ো মানুষ, আমায় নিয়ে কেন টানাটানি করেন মিঃ আলম ? আপনি জানেন, আমি নির্বিরোধী লোক। আমায় আর এর মধ্যে জড়াবেন না।

—অত সব টিচারের মুখের দিকে চেয়ে রাজি হোন নারাণবাবু। আপনি হেড্ মাষ্টার হোন, খুব খুশি হবো সবাই। এঁদের মধ্যে কেউ নেই, যিনি তাতে অমত করবেন। কিংবা রামেন্দুবাবুই হেড্ মাষ্টার হোন—কারো আপত্তি হবে না।

সকলে সমস্বরে এ প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

এই দিনটির পরে মিঃ আলমের চক্রান্ত রোজই চলিতে লাগিল। মাষ্টারদের

মধ্যে স্বার্থান্বেষী, প্রিন্সিপ্‌ল্‌-বিহীন যাঁরা ( যেমন যদুবাবু ), মিঃ আলমের দলে যোগ দিয়াছেন ; ক্ষেত্রবাবু ও শ্রীশবাবু মনে মনে মিঃ আলমের দলে আছেন, মুখে কিছু বলেন না। কেবল নারাণবাবু ও নতুন টিচার রামেন্দু দত্ত নিরপেক্ষ, কোনো দলেই নাই।

ইহাদের মিটিং প্রতি দিন ছুটির পর তেতালার ঘরে হয়—নতুন টিচার ও নারাণবাবু সেখানে থাকেন না।

এই অবস্থার মধ্যে আসিল পুজার ছুটির সপ্তাহ। শনিবারে ছুটি হইবে। ছেলেরা ক্লাসে ক্লাসে ছুটির দিন শিক্ষকদের জলযোগের ব্যবস্থা করিতেছে। শিক্ষকদের মধ্যে কেহ কেহ গোপনে তাহাদের উস্কাইয়া না দিতেছেন এমন নয়।

—কি রে, পড়াশুনো কিছুই হয়নি কেন ? গ্রামার মুখস্থ ছিল—টাস্ক ছিল, কিছু করিস্ নি ? খাওয়াতে ব্যস্ত আছিস বুঝি ? কি ফর্দ্দ করলি এবার ?

ফর্দ্দ শুনিয়া যদুবাবু উদাসীন ভাবে বলিলেন—এ আর কি তেমন কিছু হোল—এবার থার্ড ক্লাসে যা করবে, শুনে এলুম—

ক্লাসের চাঁই বালকেরা সাগ্রহ কলরবে বলিয়া উঠিল—কি স্যার—কি স্যার—

—আইস্‌ক্রিম, লুচি, আলুর দম—হরি ময়রার কড়াপাকের সন্দেশ—

—স্যার, আমরাও করবো আইস্‌ক্রিম—

—হরি ময়রার সন্দেশ স্যার, কোথায় পাওয়া যায় ?

—সে আমি তোদের এনে দেবো, ভাবনা কি। পয়সা দিস আমার হাতে।

—কালই দেবো চাঁদা তুলে।

—স্যার, আপনার হাতে আমরা দশ টাকা দেবো—আপনি যাতে থার্ড ক্লাসের চেয়ে ভাল হয়, তা কিন্তু করবেন—

থার্ড ক্লাসে গিয়া যদুবাবু বলিলেন—ওঃ, ছুটির টাস্কটা সবাই লিখে নে, ভুলে গিয়েছি একেবারে।—তোদের এবার কি বন্দোবস্ত হচ্ছে রে ? কিন্তু এবার ফোর্থ ক্লাসে যা হচ্ছে, তার কাছে তোরা পারবি নে—

শ্রীশবাবু ও জ্যোতির্বিনোদ অন্ত অন্ত ক্লাসে উস্‌কাইলেন। প্রতি বৎসর :স ক্লাসে টেক্কা দিবার চেষ্টা করে।

ছুটির পর হেড মাষ্টারের ঘরে নতুন টিচার গিয়া টেবিলের সামনে লেন।

—স্যার, আপনার সঙ্গে গোপনীয় কথা আছে—কখন্ আসবো?

—ও, মিঃ দত্ত। তুমি সন্ধ্যার পরে এসো—আর আজ টুইশানিতে বা না—

—বেশ

ছুটির পর প্রায় দেড় ঘণ্টা মাষ্টারেরা থাকিয়া ছেলেদের সেকেণ্ড্ টমিনেল পরীক্ষার ফল লিপিবদ্ধ করিলেন, প্রোগ্রেস্ রিপোর্ট লিখিলেন, বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সিজিল মিজিল করিলেন—বড় একটা ছুটির আগে অনেক কাজ। অথচ সকলেই জানে, ছুটির মাহিনা কেহ পাইবে না। এই শারদীয়া পূজার সময়ে সকলকে শুধুহাতে বাড়ী যাইতে হইবে—উপায় নাই। ইহা যে স্বার্থত্যাগ-প্রণোদিত ব্যাপার, তাহা নহে, নিরুপায়ে পড়িয়া মার খাওয়া মাত্র। এ চাকুরী ছাড়িলে কোন্ স্কুলে হঠাৎ চাকুরী মিলিতেছে?

সন্ধ্যার পর নতুন টিচার হেড্ মাষ্টারের নিজের বসিবার ঘরের দরজায় কড়া নাড়িলেন।

—হ্যাঁ—এসো। কাম্ ইন্—

নতুন টিচার ঢুকিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

—বোসো মিঃ দত্ত, বোসো। এক পেয়ালা চা?

—না, ধন্যবাদ। এই খেয়ে আসছি। মিস্ সিবসন্ কোথায়?

—উনি আজকাল পড়াতে বেরোন।—ভাল টুইশানি পেয়েছেন—পঞ্চকোটের রাজকুমারীকে এক ঘণ্টা ইংরাজি পড়াতে—

—ও!

—কি কথা বলবে বলছিলে?

নতুন টিচার পকেট হইতে একটা কাগজ বাহির করিলেন। গলা ঝাড়িয়া বলিলেন—স্যার, আপনি এবার কি কিছু দেবেন না আমাদের মাইনে?

—তোমায় তো সব দেখিয়েছি মিঃ দত্ত। স্কুলের আর্থিক অবস্থা তুমি আর মিঃ আলম জানো—আর জানে নারাণবাবু। বেশি লোককে বলে কোনো লাভ নেই। স্কুলকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করছি প্রাণপণে। বাড়ীওলা নালিশ করবে শাসিয়েছিল—তার টাকা পাঁচ শো দিতে হয়েছে। মিস্ সিবসন্‌কে দেড় শো টাকা দিতে হবে, উনি দার্জ্জিলিং যাচ্ছেন—কিন্তু তার মধ্যে মোটে পঁচাত্তর দিতে পারছি—আমি এক পয়সা নিচ্ছি নে—এ আমাদের স্ট্রাগ্‌লের বছর, এ বছর যদি সামলে উঠি—সামনের বছরে হয় তো সুদিন আসবে। সকলকেই স্বার্থত্যাগ করতে হবে, কষ্ট স্বীকার করতে হবে এ বছরটাতে। বুঝলে না?

—হ্যাঁ, স্যার।

—তুমি কিছু চাও? কত দরকার বলো—

—না স্যার। আমি একরকম ম্যানেজ্ করে নেবো। ধন্যবাদ স্যার। এই ক'জনকে কিছু কিছু দিতেই হবে, যে করে হোক ম্যানেজ্ করুন।

নতুন টিচার হাতের কাগজ দেখিয়া বলিতে লাগিলেন—ক্ষেত্রবাবু কুড়ি টাকা—জ্যোতির্ব্বিনোদ পনেরো টাকা, শ্রীশবাবু আঠারো টাকা, হেড্‌পণ্ডিত দশ টাকা—যদুবাবু কুড়ি—

সাহেব কুইনাইন সেবনের পরের অবস্থার মত মুখখানা করিয়া বলিলেন—ও, দিজ্ আর দি ট্রাব্‌ল মেকারস্

—না স্যার, এদের না হোলে চলবে না। এদের অবস্থা সত্যিই খারাপ—প্রত্যেকেরই বিশেষ বিশেষ দরকার আছে। জ্যোতির্ব্বিনোদের বাড়ী পৈতৃক পুজো—তাকে বাড়ী যেতে হবে, ভাড়া চাই। ক্ষেত্রবাবুর আবশ্যক আমি ঠিক জানিনে—তবে তাঁরও দরকার জরুরী। হেড্‌পণ্ডিত পুজো করতে যাবে দক্ষিণে শিষ্যবাড়ী, কাপড় চোপড় নেই, কিনবে। যদুবাবু—

—দি কানিং ওল্ড্ ফক্স্—

—যদুবাবুর স্ত্রী আজ তিন চার মাস পড়ে আছেন জ্ঞাতির বাড়ী, তাদের

সেখান থেকে না আনলে নয়—তারা চিঠি লিখছে কড়া কড়া। ট্রেণভাড়া খরচ চাই—

সাহেব হাসিয়া বলিলেন—তোমার কাছে সবাই বলে, তোমাকে ধরেছে আমাকে বলতে। বুঝলাম।

—হাঁ, স্যার।

—এ টাকা আমি যে করে হয় ম্যানেজ করবো, তুমি যখন বলছো। তুমি নিজের জন্যে কিছু নেবে না?

—না স্যার। আমার দুটো টুইশানির টাকা পাবো—একরকম করে নেবো এখন। এখনও তো কত মাষ্টারকে কিছু দেওয়া হচ্ছে না। শুধু এই ক'জনের নিতান্ত জরুরী দরকার—তাই—

—বেশ, কাল ওদের বোলো, টাকা দিয়ে দেবো যে করেই হোক।

—আর একটা কথা স্যার—যদি জানুয়ারী মাসে সুবিধে হয়, জ্যোতির্বিনোদের কিছু মাইনে বাড়িয়ে দিতে হবে। বড় গরীব।

—কেন, ওকে আমরা যা দিই, ওর বিদ্যাবুদ্ধির পক্ষে তা যথেষ্ট নয় কি?

—না স্যার। ওর প্রতি অবিচার করবেন না। গরীব বড়—

—কিন্তু বড় ফাঁকিবাজ, ক্লাসে কিছু করে না। আর দু-চার জন আছে ফাঁকিবাজ। তুমি ভাবো, আমি তাদের চিনি নে, স্কুলের অবস্থা ভাল না বলে কিছু বলিনে। আচ্ছা, তোমার কথা মনে রইলো, জানুয়ারী মাসে বেশি ছেলে ভর্ত্তি হোলে থার্ড পণ্ডিতের কেস্ আমি বিবেচনা করবো।

নতুন টিচার বিদায় লইলেন।

•

যদুবাবু সত্যই বিপদে পড়িয়াছেন।

গত গ্রীষ্মের ছুটিতে স্ত্রীকে সেই যে গ্রামে শরিকের বাড়ী রাখিয়া আসিয়াছিলেন, অর্থাভাবে তাহাকে আনিতে পারেন নাই। অবনী মুখুয্যেকে টাকা ধার দিবেন বলিয়াছিলেন—সে অন্ত তিন মাস ধরিয়া তাগাদার উপর তাগাদা দিয়া আসিয়াছে—নানা ছল ছুতা, সত্য মিথ্যা নানারূপ স্তোকবাক্যে তাহাকে কতদিন ঠেকাইয়া রাখিয়াছেন। যদুবাবুর স্ত্রী লিখিল, তুমি অবনী

ঠাকুরপোকে টাকা দিবার কথা নাকি বলিয়া গিয়াছিলে, সে একদফা নিয়ে, একদফা তাহার মা ও স্ত্রীর দ্বারা আমার গায়ের ছাল খুলিয়া ফেলিতেছে, তোমার কাছে টাকা ধারের সুপারিশ করিতে। তুমি কোথা হইতে টাকা দিবে জানি না। তবে এমন বলিলেই বা কেন, তাহাও ভাবিয়া পাই না। যদি টাকা দিতে না পারো, তবে আমাকে এখান হইতে সত্বর লইয়া যাইবে। ইহাদের খোঁটা ও গঞ্জনা আর আমার সহ্য হয় না।

যদুবাবু স্ত্রীকে স্তোকবাক্য দিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন—সে আজ দেড় মাসের কথা। তারপর স্ত্রীর যত চিঠি আসিয়াছে, তাহার কোন উত্তর দেন নাই।

দিবেনই বা কি করিয়া, স্কুলে দুই মাস খাটিয়া এক মাসের মাহিনা পাওয়া যায়—মাসের উনত্রিশ তারিখে গত মাসের মাহিনা যদি হইল, তবে মাষ্টারেরা ভাগ্য প্রসন্ন বিবেচনা করেন। মেসের দেনা ঠিকমত দেওয়া যায় না—টুইশানি ছিল, তাই চলে। স্ত্রীকে ইহার মধ্যে আনেন কোথায়, বাসা করিবার খরচ জুটাইবেন কোথা হইতে—বলিলেই তো হইল না।

শনিবার পূজার ছুটি হইবে, আজ বৃহস্পতিবার। যদুবাবু টুইশানি করিয়া ফিরিবার পথে ভাবিতেছিলেন, ছুটিতে কি বেড়াবাড়ী যাইবেন? রামেন্দু-বাবুকে ধরিয়াছেন, হেড্‌মাষ্টারকে বলিয়া কহিয়া অন্ততঃ কুড়িটা টাকা যাহাতে পাওয়া যায়। রামেন্দুবাবুর কথা আজকাল সাহেব বড় শোনে।

কিন্তু তা যেন হইল। এই সামান্য টাকা হাতে সেখানে গিয়া আনিয়া কোথায়ই বা রাখেন? এই অর্থকষ্টের বাজারে বাসা করিবেনই বা কোন্ সাহসে, হাওয়ায় ভর করিয়া দাঁড়াইয়া এত বড় ঝুঁকি লওয়া চলে না।

আকাশ পাতাল ভাবিতে ভাবিতে যদুবাবু মেসের দরজায় ঢুকিতেই মেসের একটি লোক বলিয়া উঠিল—একটি ভদ্রলোক আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন অনেকক্ষণ থেকে, শ্রীশদা এখনও ছেলে পড়িয়ে ফেরেন নি, আপনাদের ঘরে আমি বসিয়ে রেখেছি আপনার সিটে।

যদুবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন—আমার জন্যে? কোথা থেকে—

—তা তো জিগ্যেস্ করিনি। দেখুন না গিয়ে—আপনার সিটেই বসে

আছেন। বল্লেন, এখানে খাবো—আমি আবার ঠাকুরকে বলে দিলাম যত্নবাবুর ফ্রেণ্ড খাবে। নইলে রান্না-বান্না হয়ে যাবে, আপনি কখন ফিরবেন।

যত্নবাবু দুরুদুরু বক্ষে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া নিজের ঘরে ঢুকিতেই সম্মুখের সিট্ হইতে অবনী মুখুয্যে দাঁত বাহির করিয়া একগাল হৃদ্যতার হাসি হাসিয়া বলিল—আসুন দাদা—এই যে! প্রণাম—ওঃ কতক্ষণ থেকে বসে আছি।

যত্নবাবুর হৃৎস্পন্দন যেন এক সেকেণ্ডের জন্য থামিয়া গেল। চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। তখনি কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন—আরে, অবনী যে! এসো এসো ভায়া! তারপর সব ভালো? তোমার বৌদিদি ভাল তো?

—হেঁ হেঁ দাদা, সব একরকম আপনার আশীর্ব্বাদে—

—বেশ-বেশ।

—তারপর দাদা এলাম, বলি যাই দাদার কাছে। জঙ্গলে পড়ে থাকি, দুদিন মুখ বদ্লানো হবে আর শহরে দেখে শুনে আসিগে, যাই থিয়েটার বায়োস্কোপ। দিন পনেরো কাটিয়ে আসি পুজোর মহড়াটা। ম্যালেরিয়ায় শরীর জরজর, একটু গায়ে লাগুক্—দাদা যখন আছেন।

যত্নবাবু পুনরায় কাষ্ঠহাসি হাসিলেন—তা বেশ, তা বেশ। তবে—

—তারপর আপনার কাছে বলতে লজ্জা নেই দাদা—ধার করে গাড়ীর ভাড়াটি কোনোক্রমে যোগাড় করে তবে আসা। হাতে কানা-কড়িটি নেই। বাড়ীতে আপনার বৌমার, ছেলেপুলের পরণে কাপড় নেই কারো—বছরকার দিন, পুজো আসছে। নিজেরও দাদা এই দেখুন না? সাত পুরোনো ধুতি—তাই প'রে তবে। বলি, যাই—দাদার কাছে, একটা হিল্লে হয়েই যাবে। আপাততঃ গোটা কুড়ি টাকা নিয়ে কাপড়গুলো কিনে তো রাখি। এর পরে বাজার আক্রা হয়ে যাবে কিনা!

যত্নবাবুর কপাল ঘামিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার রুদ্ধ কণ্ঠ হইতে কি একটা কথা অস্ফুটভাবে উচ্চারিত হইল, ভাল বোঝা গেল না। অবনী তাহাকেই সম্মতিসূচক বাণী ধরিয়া লইয়া বলিল—না, কালই সকালে টাকাটা নিয়ে বাজার করে নিয়ে আসি। আর আপনি না দিলেই বা যাচ্ছি কোথায় বলুন। আপনার ওপর জোর খাটে বলেই তো আসা। না হয় দুটো বকবেন, না

হয় মারবেন—কিন্তু ছোট ভাইয়ের আবদার না রেখে তো পারবেন না—হেঁ হেঁ—

যদুবাবু বেচারী সারাদিন খাটিয়াছেন, সেই কোন্ সকালে দুটি খাইয়া বাহির হইয়াছিলেন—রাত দশটা, এখন কোথায় খাইয়া ঘুমাইবেন—এ উপসর্গ কোথা হইতে আসিয়া জুটিল বল তো?

পাড়াগাঁয়ের দূরসম্পর্কের জ্ঞাতি, দেখাশোনা ঘটিত কালেভদ্রে—এখন মাখামাখি করিতে গিয়া কি মুস্কিলেই পড়িয়া গেলেন। পাড়াগাঁয়ের লোকের সঙ্গে বেশি মাখামাখি করিতে নাই—ইহারা হাত পাতিয়াই আছে। পাড়াগাঁয়ের লোকের এ স্বভাব তিনি জানিতেন না যে, তাহা নয়—কিন্তু বহুদিন কলিকাতায় থাকার দরুণ ভুলিয়া গিয়াছিলেন—তাই আজ এ দুর্দ্দশা। বলিলেন—চলো, এসো খাবে—

যদুবাবুর ঘরে সাতটি সিট—অর্থাৎ মেজেতে ঢালা বিছানা পাতিয়া পাশাপাশি সাতটি ক্লান্ত প্রাণী শয়ন করে। তাহার মধ্যে অবনীকে গুঁজিয়া কোনো রকমে শোওয়া চলিল—কিন্তু পাড়াগাঁয়ের লোক, সকলের সম্মুখে অভাব অভিযোগের কথা উচ্চৈঃস্বরে ব্যক্ত করিতে লাগিল—আর এত বকিতেও পারে! 'হুঁ হাঁ' দিতে দিতে যদুবাবুর মুখ ব্যথা হইয়া গেল।

সকালে উঠিয়া অবনীর জন্য চা ও খাবার আনাইয়া দিয়া যদুবাবু মেসের বাজার করিতে বাহির হইলেন—কারণ, বাজার জিনিসটা তিনি করেন ভালই—এবং ইহা হইতে দু'চারি আনা লাভও রাখিতে জানেন নিজের জন্য।

স্কুলে বাহির হইতে যাইবেন, অবনী জিজ্ঞাসা করিল—দাদা, কখন্ আসছেন?

—কাল যে সময় এসেছিলাম, রাত হবে—

অবনী সকলের সামনেই বলিয়া বসিল—তা হোলে দাদা, কাপড়ের টাকাটা আমায় দিয়ে যান, আজই কাপড়গুলো কিনে রাখি—আর ওবেলা ভাবছি বায়োস্কোপ দেখবো—তার দরুণও কিছু দিন, আমার ট্যাক যাকে বলে গড়ের মাঠ কিনা? হ্যা—হ্যা—

যদুবাবু তিন চার জন মেস্-বন্ধুর সামনে কি বলিবেন, বলিলেন—আমি

এসে দেবো এখন—এখন তো। ইহাতে অবনী চেঁচাইয়া আবদারের সুরে বলিয়া উঠিল না—দাদা, তা হবে না, আপনি দিয়েই যান—

যদুবাবু ফাঁপরে পড়িলেন। টাকা দিবেন কোথা হইতে? কুড়ি টাকা স্কুল হইতে লইবার সুপারিশ ধরিয়াছেন—হয় তো শনিবারের আগে সেই এক-মাত্র সম্বল কুড়িটি টাকা হাতে পাওয়া যাইবে না। টুইশানির টাকা হয় তো ওবেলা মিলিবে। অবশ্য টাকা হাতে আসিলে অবনীকে তিনি দিবেন না নিশ্চয়ই,—তাঁহার নিজের খরচ নাই?

বলিলেন—এসো, বাইরে আমার সঙ্গে—

পথে গিয়া বলিলেন—অমন করে সকলের সামনে বলতে আছে, ছিঃ! টাকা হাতে থাকলে তোমায় দিতাম না?

অবনী অনুযোগের সুরে বলিল—বা রে—আপনাকে তো কাল রাত্ত থেকে বলছি। সত্যি দাদা—হাতে কিছুই নেই—চা জলখাবারের পয়সাটি পর্য্যন্ত নেই। শুধু আপনার ভরসায় এখানে আসা—

—এই রাখো দুআনা পয়সা—চা খাবার খেয়ো। আমি স্কুল থেকে ফিরি, তারপর বলবো। চল্লাম, বেলা হয়ে যাচ্ছে—

স্কুলে বসিয়া যদুবাবু আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলেন। যখন আসিয়া পড়িয়াছে অবনী, তখন হঠাৎ এক আধ দিনে চলিয়া যাইবে না। উহার স্বভাবই ওই, টাকা না লইয়া যাইবে না—দুবেলা আট আনা ফ্রেণ্ড-চার্জ্জ দিয়া উহাকে বসাইয়া খাওয়াইতে গেলে যদুবাবু স্কুল হইতে যে ক'টি টাকা পাইয়াছেন, তাহা উহার পিছনেই ব্যয় হইয়া যাইবে। আর কেনই বা উহাকে তিনি এখানে জামাই আদরে বসাইয়া খাওয়াইতে যাইবেন—কে অবনী? কিসের খাতির তাহার সঙ্গে?

আচ্ছা, যদি মেসে না ফিরিয়া তিনি পালাইয়া দুদিন অন্যত্র গিয়া থাকেন, তবে কেমন হয়? মেসে শ্রীশকে দিয়া বলিয়া পাঠাইয়া দেন যদি—বিশেষ কাজে তিনি অন্যত্র যাইতেছেন—এখন দিন দশ বারো মেসে ফিরিবেন না। কেমন হয়? হইবে আর কি, অবনী সেই দশ দিন বসিয়া বসিয়া দিব্য খাইবে এখন তাঁহার খরচে।

সামনের শনিবার ছুটি। একদিন আগে কি ছুটি লইবেন ?

সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে টুইশান শেষে যদুবাবু মেসে গিয়া দেখিলেন, অবনী নাই। চলিয়া গেল নাকি ?

পাশের ঘরের সতীশবাবু বলিলেন—যদুবাবু আসুন। আপনার ছোট ভাই সিনেমা দেখতে গিয়েছে, এখুনি আসবে। ছ'টার শোতে গিয়েছে—

—সিনেমা ? আমার ছোট ভাই ?

সতীশবাবু যদুবাবুর কথার সুরে বিস্মিত হইয়া বলিলেন—হ্যাঁ, যিনি কাল এসেছিলেন। আমায় বল্লেন, দাদার স্কুল থেকে আসতে দেরি হচ্ছে। বায়স্কোপ দেখতে যাবার ইচ্ছে ছিল। তা বোধ হয় হোল না। আমি বল্লাম—কেন হোলো না ? উনি বল্লেন, টাকা নেই সঙ্গে, দাদার কাছে চাবি। মনে করে নিয়ে রাখতে ভুলে গিয়েছিলাম। আমি বল্লাম—তা আর কি ? যদুবাবুর ফিরতে রাত হবে দশটা। আপনার কত দরকার, নিয়ে যান—পরস্পর বন্ধুবান্ধবের মধ্যে এসব—মেস্ মেটের ভাই, আপনার কাছে নেই বলে কি আর অভাব ঘটবে ?

—কত নিয়ে গেল ?

—দুটাকা বল্লেন দরকার। আর দুটাকা নিয়েছেন বুঝি আপনার পিসীমার জন্যে কি ওষুধ কিনতে হবে—দোকান বন্ধ হোলে আজ আর পাওয়া যাবে না—কাল সকালেই বুঝি উনি চলে যাবেন। তা থাক্—তার জন্যে কি, এখন দেবার তাড়া নেই। মাইনে পেলে শনিবার দেবেন এখন, কাজটা তো হয়ে গেল।

যদুবাবু অতিকষ্টে রাগ সামলাইয়া ঘরে ঢুকিলেন এবং একটু পরেই অবনী সিনেমা হইতে ফিরিয়া ঘরে ঢুকিল। দাঁত বাহির করিয়া বলিল—এই যে দাদা—দেখে এলাম সিনেমা। থাকি গাঁয়ে পড়ে, ওসব দেখা অদেষ্টে ঘটেই না তো! সতীশবাবুর কাছ থেকে গোটা চার টাকা নিয়ে গেলাম। কুড়ি টাকার মধ্যে চার টাকা সতীশবাবুকে, আর ষোলটা দেবেন আমায়।

যদুবাবু দেখিলেন, অবনী ধরিয়াই লইয়াছে—কুড়ি টাকা তাহার হাতের মুঠার মধ্যে আসিয়া গিয়াছে। কুড়ি টাকা তো দূরের কথা, এই বহু

কষ্টার্জ্জিত টাকার মধ্যে চার টাকা এভাবে বাজে ব্যয় হওয়াই কি কম কষ্টকর? এ চার টাকা দিতেই হইবে ভদ্রতার খাতিরে। যদুবাবুর বহু ভাগ্য যে, সে কুড়ি টাকা ধার করে নাই!

এমন মুস্কিলে তিনি জীবনে কখনো পড়েন নাই। কেন মিছামিছি শরিক জ্ঞাতিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিতে গিয়াছিলেন—এখন তার ধাক্কা সামলাইতে প্রাণ যে যায়! যদুবাবুর ইচ্ছা হইল, তিনি হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিয়া হাত পা ছোঁড়েন, অবনীকে ধরিয়া দুমদাম করিয়া কিল মারেন, কিংবা একদিকে ছুটিয়া বাহির হইয়া যান। কিন্তু মেসের ভদ্রলোকদের মধ্যে কিছুই করিবার যো নাই—তিনি শান্তমুখে তামাক সাজিতে বসিয়া গেলেন।

অবনী উৎসাহের সঙ্গে সিনেমায় কি দেখিয়া আসিয়াছে, তাহার গল্প সবিস্তারে আরম্ভ করিল। গল্প তাহার আর শেষ হয় না। যদুবাবু বলিলেন—চলো, খেয়ে আসি—

অবনী হাসিয়া বলিল—আজ এখনো হয়নি—আজ যে আপনাদের মেসে ফিষ্ট্—আমি খোঁজ নিয়ে এলাম রান্নাঘরে, এখনও দেরি আছে।

সর্ব্বনাশ! আট আনা ফ্রেণ্ড্ চার্জ্জ আজ ফিষ্টের দিনে। এ ভূতভোজন করাইয়া লাভ কি তাঁহার রক্ত-জলকরা পয়সায়।

অবনী পরের দিনও নড়িতে চাহিল তো না-ই, টাকার তাগাদা করিয়া যদুবাবুকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিল। রাত দশটায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, অবনী কাহার কাছে খবর পাইয়াছে, আগামী কাল শনিবার স্কুল বন্ধ হইবে, সুতরাং সে ওৎ পাতিয়া বসিয়াছিল, বলিল—দাদা, কাল মাইনে পাবেন দু' মাসের—না? কাল চলুন, আপনার সঙ্গেই স্কুলে যাই—টাকা যোলটা দিয়ে দিন, তিনটের গাড়ীতে বাড়ী যাই। যদুবাবুর ভয়ানক রাগ হইল, কিন্তু এখানে স্পষ্ট কথা বলিতে গেলেই অবনী ঝগড়া বাধাইবে, তাহাও বুঝিলেন। পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত লোক, কাণ্ডজ্ঞানহীন। কেলেঙ্কারী একটা না বাধাইয়া ছাড়িবে না।

পরদিন ক্লাসের ছেলেরা খাওয়াইল। অবনী গিয়া জুটিল যদুবাবুর সঙ্গে।

যদুবাবু কুড়িটি টাকা বেতন পাইলেন—তাও রামেন্দুবাবুর সুপারিশে। ছুটির সার্কুলার বাহির হইয়া গেল। সকলে কে কোথায় যাইবেন, পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিলেন। মাষ্টারেরা চায়ের দোকানে গিয়া মজলিস করিবে ঠিক ছিল, কিন্তু সাহেব তাহাদের লইয়া পাঁচটা পর্য্যন্ত মিটিং করিলেন।

মিটিংএর কার্য্যতালিকা নিম্নলিখিতরূপ :—

(১) ছুটির পরেই বার্ষিক পরীক্ষা—কি ভাবে পড়াইলে ছেলেরা বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে।

(২) দেখা গিয়াছে, তৃতীয় শ্রেণীর ছেলেরা ইংরাজি ব্যাকরণে বড় কাঁচা। এই সময়ের মধ্যে কি প্রণালীতে শিক্ষা দিলে তাহারা উক্ত বিষয়ে পারদর্শী হইয়া উঠিতে পারে।

(৩) টেষ্ট পরীক্ষার প্রশ্নপত্রগুলি পড়া ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা।

(৪) সপ্তম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় শ্রুতিলিখন থাকিবে কি না। থাকিলে তাহাতে কত নম্বর থাকিতে পারে।

মিঃ আলম ক্ষেত্রবাবুর প্রশ্নপত্রের দুই স্থানে দুইটি ভুল বাহির করিলেন। পাঠ্যতালিকার বাহিরে সেই দুইটি প্রশ্ন করা হইয়াছে—এ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় ঐ দুইটি বিষয় নাই। সাহেবের আদেশে পাঠ্যতালিকা দেখা হইল—ভুলই বটে। ক্ষেত্রবাবু অপ্রতিভ হইলেন।

ধরা পড়িল, যদুবাবু ষষ্ঠ শ্রেণীর ইতিহাসের প্রশ্ন এখনও তৈয়ারী করেন নাই। মিঃ আলম ধরিয়া দিলেন।

সাহেব বলিলেন—কি যদুবাবু?

যদুবাবু মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন—অত্যন্ত দুঃখিত, স্যার। এখুনি করে দিচ্ছি—

—মিঃ আলম ধরে না দিলে কি মুস্কিলেই পড়তে হোত।

—স্যার, বড় ব্যস্ত ছিলাম। মন ভাল ছিল না—

—সে সব কথা আমি জানি না। কর্ত্তব্য কাজে অবহেলা করে যে, তার স্থান নেই আমার স্কুলে। মাই গেট্ ইজ—

—এবার মাপ করুন স্যার, আর কখনো এমন হবে না।

দোতালা হইতে নামিতেই অবনীর সহিত দেখা। সে সিঁড়ির নীচে তাঁহারই অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। দাঁত বাহির করিয়া বলিল—মাইনে পেলেন দাদা?

যদুবাবুর বড় রাগ হইল—একে সাহেবের কাছে অপমান, অপরের সুপারিশে মাত্র কুড়ি টাকা প্রাপ্তি—তার উপর এই সব হাঙ্গামা সহ্য হয়?

যদুবাবু বলিলেন—না।

—মাইনে পান নি? পেয়েছেন দাদা—

—না, পাইনি। কেউই পায়নি—

অবনী একগাল হাসিয়া বলিল—দাদার যেমন কথা!—দু মাসের মাইনে একসঙ্গে পেলেন বুঝি?

যদুবাবু বলিলেন—সত্যিই পাইনি। তুমি মাষ্টার-মশায়দের জিগ্যেস করে দ্যাখো না?

—এক মাসের মাইনে দেবে না পুজোর সময়—তা কি কখনো হয়?

—এ স্কুলে এমনি নিয়ম। সাহেবের স্কুল, পুজোটুজো মানে না।

অবনী কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া রহিল—তারপর বলিল—তবে আমায় টাকা দেবেন বল্লেন যে ওবেলা?

—কোথা থেকে দেবো বলো? স্কুলের মাইনে যখন হোল না, টাকা পাবো কোথায়?

অবনী কথাটা উড়াইয়া দিবার মত তাচ্ছিল্যের স্বরে বলিল—আপনার আবার টাকার ভাবনা! না হয় ডাকঘর থেকে তুলে কিছু দিন দাদা—এখনও সময় যায়নি—

যদুবাবু অবনীর মুখের দিকে চাহিয়া নীরস কণ্ঠে কহিলেন—ডাকঘরে এক পয়সাও নেই আমার। দিতে পারবো না।

অবনী আরও কিছুক্ষণ কাকুতি মিনতি করিল, রাগ করিল, ঝগড়া করিল, যদুবাবুকে কৃপণ বলিল, তাঁহার স্ত্রীকে এতদিন বাড়ীতে জায়গা দিয়া

রাখিয়াছে, সে খোঁটা দিতে ছাড়িল না। যদুবাবুর এক কথা—তিনি টাকা দিতে পারিবেন না।

তিনি মাত্র কুড়ি টাকা মাহিনা পাইয়াছেন, তাহা হইতে কিছু দেওয়ার উপায় নাই।

অবনীর হৃদ্যতা আগেই উবিয়া গিয়াছিল, সে বলিল—তা হোলে টাকা দেবেন না আপনি?

কথা যেন ছুঁড়িয়া মারিতেছে।

যদুবাবু বলিলেন—না।

—বেশ। কিন্তু আপনাকে চিনে রাখলাম—বিপদে আপদে লাগবো না কি আর কখনো? আচ্ছা চলি।

কিছু দূর গিয়া তখনি ফিরিয়া আসিয়া বলিল—হ্যাঁ, বৌদিদিকে ওখানে রাখার আর সুবিধে হচ্ছে না। কালই গিয়ে তাঁকে নিয়ে আসবেন, বলে দিচ্ছি। এত অসুবিধে করে পরের বৌকে জায়গা দেবার ভারি তো লাভ। সব চিনি—এক কড়ার উপকারে কেউ লাগে না। কেবল মুখে লম্বা লম্বা কথা—

অবনী চলিয়া গেল। যদুবাবু স্কুলের বাহিরে আসিলেন ভাবিতে ভাবিতে। ক্ষেত্রবাবু পিছন হইতে আসিয়া বলিলেন—চলো হে যদুদা, একটু চা খাই সবাই মিলে—

—আর চা খাবো কি, মন বড় খারাপ—

—কি হোল? তুমি তবুও কুড়ি টাকা পেলে। আমাদের তো এক পয়সাও না।

—না হে, তোমার বৌদিদি রয়েছে বেড়াবাড়ী—সেই পাড়াগাঁ। তাকে এবার না আনলেই নয়—কিন্তু এনে কোথায় বা রাখি?

—এখন নাই বা আনলে দাদা? নিজের বাড়ীতেই তো রয়েছেন? থাকুন না। এখন পুজোর সময়, দেশে পুজো দেখুন না? গাঁয়ে পুজো হয় না?

যদুবাবু গর্ব্বের সহিত বলিলেন—আমার বাড়ীতেই পুজো। শরিকি

পুজো। আর, বেড়াবাড়ীর জমিদার তো আমরা। মস্ত বাড়ী, আমার অংশেই এখনো ( যতুবাবু মনে মনে গণনা করিলেন ) পাঁচখানা ঘর, ওপর নীচে। বাড়ীতেই পুকুর, বাঁধা ঘাট। আমার স্ত্রী সেখানেই রয়েছে—আসতে চায় না, বলে বেশ আছি। হয়েছে কি ভায়া, নামে তালপুকুর, ঘটি ডোবে না। আছে সবই, এখনও দেশে গেলে লোকজন ছুটে দেখা করতে আসে—বলে, বড়বাবু, বিদেশে পড়ে থাকেন কেন—দেশে আসুন, আপনার ভাবনা কি ? কিন্তু ম্যালেরিয়া বড্ড। তেমন আয়ত্ত নেই পুরোনো আমলের মত। নামটাই আছে। নইলে কি আর বত্রিশ টাকা সাত আনায় পড়ে থাকি এই স্কুলে—রামোঃ !

যতুবাবু ওয়েলেস্‌লি স্কোয়ারের বেঞ্চিতে বসিয়া মনে মনে বহু আলোচনা করিলেন। স্ত্রীকে এখন কলিকাতায় আনা অসম্ভব।

কুড়ি টাকা মাত্র সম্বলে বাসা করিয়া এক মাসও চালাইতে পারিবেন না। বেড়াবাড়ী এখন গেলে অবনী দস্তুরমত অপমান করিবে তাঁহাকে। সুতরাং তিনি কলিকাতায় মেসেই থাকিবেন, স্ত্রী কাঁদাকাটা করিলে কি হইবে ?

যতুবাবুর স্ত্রী পুজার ছুটির মধ্যে স্বামীকে পাঁচ-ছ'খানা লম্বা লম্বা পত্র লিখিল। সে সেখানে টিকিতে পারিতেছে না, অবনীর মা ও স্ত্রীর খোঁটা এবং দুর্ব্ব্যবহারে তাহার জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে—সেখানে আর থাকিতে হইলে সে গলায় দড়ি দিবে—ইত্যাদি।

যতুবাবু লিখিলেন, তিনি এখন রামপুরহাটের জমিদারের বাড়ীতে টুইশানি পাইয়াছেন, ছুটি লইয়া এখন দেশে যাইবার কোনো উপায় নাই। তাহারা তাঁহাকে বড় ভালবাসে, ছাড়িতে চায় না।

সর্ব্বৈব মিথ্যা।

স্কুলে ঢুকিবার পুর্ব্বে গেটের কাছে একদল ছাত্র ভিড় জমাইয়া তুলিয়াছে। যতুবাবুকে দেখিয়া ক্লাস নাইনের একটি বড় ছেলে আগাইয়া আসিয়া বলিল—আজ স্কুলে ঢুকবেন না, স্যার—আজ আমাদের ষ্ট্রাইক, কেউ যাবে না স্কুলে।

যদুবাবুর মুখ অপ্রত্যাশিত আনন্দে উজ্জল দেখাইল। এও কি সম্ভব হইবে? আজ কার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলেন? ষ্ট্রাইক হওয়ার অর্থ সারাদিন ছুটি। এখনি বাসায় ফিরিয়া দুপুরে দিব্য নিদ্রা দিবেন, তারপর বিকালের দিকে উঠিয়া তাঁর এক বন্ধুর বাড়ী আছে মলঙ্গা লেনে, সেখানে সন্ধ্যার পুর্ব্ব পর্য্যন্ত দাবা খেলিবেন। মুক্তি।

এই সময় শ্রীশবাবু ও মিঃ আলম একসঙ্গে গেটের কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে ছেলেরা তাঁহাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইল। আজ রামতারক মিত্র গ্রেপ্তার হওয়ার দরুন—দেশবিখ্যাত নেতা রামতারক মিত্র—কলিকাতার সমগ্র ছাত্রসমাজে দারুণ চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে, স্কুল কলেজের ছাত্রদল মিলিয়া বিরাট্ শোভাযাত্রা বাহির করিবে ওবেলা।

মিঃ আলম বলিলেন—আমাদের যেতে হবেই। আর তোমাদেরও বলি আমি চাই না যে, এ স্কুলের ছাত্রেরা কোনো পলিটিক্যাল আন্দোলনে যোগ দেয়—চলুন যদুবাবু, শ্রীশবাবু—

যদুবাবু মনে মনে ভাবিলেন—গিয়ে সইটা করেই ছুটি, কেউ আসছে না স্কুলে।

হেড্ মাষ্টার ষ্ট্রাইকের কথা জানিতেন না। তিনি সকালে উঠিয়া খয়রাগড়ের রাজবাড়ীতে টুইশানিতে গিয়াছিলেন, ফিরিয়া সব শুনিলেন। নিজে গেটে দাঁড়াইয়া ছেলেদের বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন অনেক—তাঁহার কথা কেহ শুনিল না। টিচার্স রুমে বসিয়া বসিয়া মাষ্টারেরা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। যদুবাবু বলিলেন—হ্যাঁঃ, শুনছে আজ ক্লার্কওয়েল সাহেবের কথা! তুমিও যেমন। কোথায় রামতারক মিত্তির অত বড় লিডার আর কোথায় ক্লার্কওয়েল, ফোতো স্কুলের ফোতো হেড্ মাষ্টার।

কিন্তু মাষ্টারদের আশা পুর্ণ হইল না। একটু পরেই হেড্ মাষ্টারের স্লিপ লইয়া মথুরা চাপরাসী আসিল, নীচু দিকের ক্লাসে ছোট ছোট ছেলেরা অনেক সকালেই আসে—বিশেষতঃ তাহারা দেশনেতা রামতারক মিত্রের বিরাট্ ব্যক্তিত্বের বিষয়ে কিছুই জানে না; সুতরাং মাষ্টার ও অভিভাবকের ভয়ে যথারীতি ক্লাসে আসিয়াছে। তাহাদের লইয়া ক্লাস করিতে হইবে।

ওপরের দিকের ক্লাসের মাষ্টার যাঁরা—এ আদেশে তাঁহাদের কোন অসুবিধা হইল না—কেন না, ওপরের কোনো ক্লাসে একটি ছাত্রও আসে নাই। ধরা পড়িয়া গেলেন শ্রীশবাবু যদুবাবু প্রভৃতি, যাঁহাদের প্রথম ঘণ্টায় নীচের দিকে ক্লাস আছে।

যদুবাবু চতুর্থ শ্রেণীতে ঢুকিয়া দেখিলেন, জন পাঁচ-ছয় ছোট ছেলে বসিয়া আছে। ওপাশে ক্লাস সেভেন-এ জনপ্রাণীও আসে নাই, সুতরাং প্রথম ঘণ্টার শিক্ষক হেড্ পণ্ডিত দিব্য উপরের ঘরে বসিয়া আড্ডা দিতেছেন—অথচ তাঁর—

রাগে দুঃখে যদুবাবু ধপ্ করিয়া চেয়ারে বসিয়া কটমট্ করিয়া চারি দিকে চাহিলেন। এই হতভাগাগুলার জন্যই এই শাস্তি—যদি এই বদমাইসগুলা না আসিত, তবে আজ তাঁহার দিবানিদ্রা রোধ করে কে?

কড়া বাজখাঁই সুরে হাঁকিলেন—আজ পুরোনো পড়া ধরবো—নিয়ে আয় বই—ছাল তুলবো আজ পিঠের, যদি পড়া ঠিকমত না পাই—

ছোট ছোট ছেলেরা তাঁহার রাগের কারণ ঠাহর করিতে না পারিয়া গা টেপাটিপি করিতে লাগিল পরস্পর। একটি ছেলে ভয়ে ভয়ে দাঁড়াইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আজ তো পুরোনো পড়ার কথা বলা ছিল না স্যার?

যদুবাবু দাঁত খিঁচাইয়া বলিলেন—পুরোনো পড়া আবার বলা থাকবে কি? ও যে দিন ধরবো, সেই দিনই বলতে হবে—দেখাচ্ছি সব মজা, কোনো ক্লাসের ছেলে স্কুলে আসে নি, ওঁরা এসেছেন—ওঁদের পড়বার চাড় কত? ছাল তুলছি আজ পড়া না পারলে—

দু একটি বুদ্ধিমান্ ছেলে ততক্ষণ তাঁহার রাগের কারণ খানিকটা বুঝিয়াছে। একজন বলিল—স্যার, না এলে বাড়ীতে বকে, বলে—ওপরের ক্লাসের ছেলেরা ষ্ট্রাইক করেছে তা তোদের কি? সেই আষাঢ় মাসে ষ্ট্রাইকের সময় এরকম হয়েছিল—

আর একটি অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান্ ছেলে বলিল—স্যার, বলেন তো পালাই—

যদুবাবু সুর নরম করিয়া বলিলেন—পালাবি কোথা দিয়ে? ইস্কুলের গেটে হেড্ মাষ্টার তালা দিয়ে রেখেছেন—

ক্লাসসুদ্ধ ছেলে বলিয়া উঠিল প্রায় সমস্বরে—গেটের দরকার কি স্যার—আপনি বলুন, টিনের বেড়া রয়েছে পেছনে—ওর তলা দিয়ে গলে বেরিয়ে যাবো।

—তবে তাই যা। কাউকে বলিস্ নে—রেজিষ্ট্রি হয়নি তো এখনো—পালা। একে একে যা—

নীচের তলায় আশপাশের ক্লাসে ছেলে নাই—কারণ, সেগুলি বড় ছেলেদের ক্লাস। কেবল পুর্ব্বদিকের কোণে হল-ঘরের পাশের ক্লাসে গুটি-কয়েক ছোট ছেলে লইয়া জ্যোতির্ব্বিনোদ বিরক্তমুখে বসিয়া আছে। যদুবাবু বলিলেন—ওহে জ্যোতির্ব্বিনোদ, ওগুলোকে যেতে দাও না?

জ্যোতির্ব্বিনোদ যেন দৈববাণী শুনিল, এরূপভাবে লাফাইয়া উঠিয়া আগ্রহের সুরে বলিল - দেবো ছেড়ে? সাহেব কিছু বলবে না তো?

যদুবাবু মুখে কোন দিনই খাটো নহেন, ব্যঙ্গের সুরে বলিলেন—ও সব ভাবলে তবে বসে ক্লাস করো'সেই বেলা তিনটে পর্য্যন্ত ( ছোট ছেলেদের তিনটার সময় ছুটি হইয়া যায় )—এই তো আমি ছেড়ে দিলাম—

—আপনারা সব বড় বড়—আমরা হোলাম চুনোপুঁটি, সবতাতেই দোষ হবে আমাদের।

—কিছু না, ছেড়ে দাও সব। এই, যা সব পালা—টিনের পার্টিশনের তলা দিয়ে পালা—ষ্ট্রাইকের দিন স্কুল করতে এসেছে। ভারি পড়ার চাড়!

জ্যোতির্ব্বিনোদও সুরে সুর মিলাইয়া বলিল—দেখুন দিকি কাণ্ড যতো—প'ড়ে তো সব উল্টে যাচ্ছেন একেবারে। যা সব একে একে—রোতো গোল করবি তো হাড় ভাঙবো মেরে—কেউ টের না পায়—

কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ক্লাস প্রায় খালি হইয়া গেল।

যদুবাবু উপরে গিয়া বলিলেন—কোথায় ছেলে? দু একটা এসেছিল, কে কোথা দিয়ে পালিয়ে গেল ধরতেই পারা গেল না—

ক্ষেত্রবাবু ছুটির দিনই রাত্রের ট্রেণে বর্দ্ধমান রওনা হইলেন।

পরদিন বৈকালের দিকে বর্দ্ধমান ষ্টেশনে নামিয়া প্ল্যাটফর্ম্মের উত্তর দিকে

মালগুদামের ও পার্শেল আপিসের পেছনে দাদার কোয়ার্টারে গিয়া ডাক দিলেন—

—ও বৌদি!

—এসো এসো ঠাকুরপো। মনে পড়লো এতদিন পরে? তা ভাল আছো বেশ? আমায় শশীবাবুর বৌ রোজই বলেন, হ্যাঁ দিদি, তোমার সে ঠাকুরপো কবে আসবেন? আমি বলি, তা কি করে জানবো। কলেজে কাজ করেন, বড় চাকরী, ছুটি না হোলে তো আসতে পারেন না। তা ছেলেমেয়েদের কোথায় রেখে এলে?

—ওরা তাদের পিসীমার কাছে রইল কালীঘাটে—মেজদিদির কাছে।

—বেশ, এসেছ, ভালই হয়েছে। এবার একটা যা হয় ঠিক করে ফেলো। ওঁদের মেয়ে বড় হয়েছে, তোমার ভরসাতেই আছে। আর তোমাকে সংসার যখন করতেই হবে—তখন আর দেরি করা কেন, আমি বলি। বোসো, হাত পা ধোও, চা করি।

ক্ষেত্রবাবু এইরূপ একটা অস্পষ্ট আশার গুঞ্জনধ্বনি সারাদিন ট্রেণের মধ্যে কানের কাছে শুনিয়াছেন—চলমান বাতাসে সে আভাস আসিয়াছিল। বাসায় পা দিতে এমন কথা শুনিবেন, তাহা কিন্তু ভাবেন নাই।

ক্ষেত্রবাবু পুলকিত হইয়া উঠিলেন।

তাঁহার জ্যাঠতুতো দাদা গোবর্দ্ধনবাবু সন্ধ্যার সময় ডিউটি হইতে ফিরিয়া বলিলেন—এই যে, ক্ষেত্র কখন্ এলে? চা খেয়েছ? স্কুল কবে, কাল বন্ধ হোল? বেশ।

গোবর্দ্ধনবাবু পাকা লোক। যে খুড়তুতো ভাই আজ সাত আট বছরের মধ্যে কখনো ঘনিষ্ঠতা করা দূরের কথা, বছরে দুখানি পোষ্টকার্ডের পত্র দিয়া খোজ-খবর লইত কি না সন্দেহ, সেই ভাই কাল স্কুল বন্ধ হইতে না হইতে কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমানে আসিয়া হাজির, এ নিশ্চয়ই নিছক ভ্রাতৃপ্রেম নয়। গোবর্দ্ধনবাবু মনে মনে হাসিলেন।

চা জলখাবার পর্ব্বান্তে ক্ষেত্রবাবু তাঁহারই সমবয়সী শ্রীগোপাল মজুমদার

এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টারের বাড়ী বেড়াইতে গেলেন। রেলওয়ে সমাজে পরস্পরকে উপাধি দ্বারা সম্বোধন করাই প্রচলিত।

ক্ষেত্রবাবুকে সেখানেও একদফা চা খাবার খাইতে হইল। মজুমদার বলিল—তারপর ক্ষেত্রবাবু, শুনছিলাম একটা কথা—

ক্ষেত্রবাবুর বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করিয়া উঠিল। বুঝিয়াও না বুঝিবার ভান করিয়া বলিলেন—কি কথা?

—আমাদের মুখুয্যের ভাইঝির সঙ্গে নাকি—আপনার—

ক্ষেত্রবাবু সলজ্জ হাসিয়া বলিলেন—না, না, কই না—আমার তো—

—না, আমি বলি, দ্বিতীয় সংসার করার ইচ্ছে যদি থাকে—তবে এখানেই করে ফেলুন—মেয়েটি বড় ভাল।

ক্ষেত্রবাবু দু-এক বার বলি বলি করিয়া অবশেষে বলিলেন—মেয়ে? ও! —দেখেছেন নাকি?

কে, অনিলা? অনিলাকে ফ্রক্ পরে বেড়াতে দেখেছি। আমাদের বাসায় আমার ভগ্নী বিমলার সঙ্গে খুব আলাপ—

—ও!

—বেশ মেয়ে। দেখতে তো ভালই, ঘরের কাজকর্ম্ম সব জানে। চলুন না—পায়ে পায়ে মুখুয্যের বাসায় যাই। আপনি এসেছেন, বোধ হয় জানে না।

ক্ষেত্রবাবু জিভ কাটিয়া বলিলেন—আরে তা কি কখনো হয়? না না। আমি যাবো কেন?

—আমরা যে ক'জন আছি ষ্টেশনের কোয়ার্টারে—সব এক ফ্যামিলির মত। এখানে কুটুম্বিতে করিনে কেউ কারো সঙ্গে। সে বারে ওই মল্লিক-বাবুর মা মারা গেল, আঠাত্তর বছর বয়সে। রাত দেড়টা—আমি এইট্রিন ডাউন সবে পাস্ করে টিকিটের হিসেব চালানে এনট্রি করছি, এমন সময় বাসা থেকে লোক গিয়ে বল্লে—শীগগির চলো, এই রকম ব্যাপার। সেই রাত্তিরে মশাই, রেলওয়ে কোয়ার্টারের ক'টি প্রাণী, বলি ব্রাহ্মণ আর কায়েস্থ কি, হিন্দু তো বটে—ঘাড়ে করে নিয়ে গেলুম শ্মশানে। তা এখানে ওসব নেই—চলুন, যাওয়া যাক।

ক্ষেত্রবাবুর যাওয়ার ইচ্ছা যে না হইয়াছিল তাহা নয়, কিন্তু দাদা কি মনে করিবেন, এই ভয়ে মজুমদারের কথায় রাজি হইতে পারিলেন না।

পরদিন বেলা দশটায় সময় ক্ষেত্রবাবু বাসায় বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছেন, এমন সময় একটি মেয়ে এক বাটি তেল আনিয়া সামনে রাখিয়া সলজ্জ সুরে বলিল—দিদি বল্লেন আপনাকে নেয়ে আসতে—

ক্ষেত্রবাবু চাহিয়া দেখিলেন—সতেরো আঠারো বছরের মেয়েটি। বেশী ফর্সাও নও, বেশী কালোও না। মুখশ্রী ভাল।

—ও! বৌদিদি বল্লেন?

ক্ষেত্রবাবু যেন একটু থতমত খাইয়া গিয়াছেন, কথার সুরে ধরা পড়িল।

মেয়েটি হাসি চাপিতে চাপিতে বলিল—হাঁ—

এই কথা বলিয়াই সে চলিয়া গেল।

ক্ষেত্রবাবু ভাবিলেন, কে মেয়েটি, কখনো তো দেখেন নাই একে। এ সেই মেয়েটি নয় তো?

স্নান করিয়া খাইতে বসিয়াছেন, সেই মেয়েটিই আসিয়া ভাতের থালা সামনে রাখিল। আবার ফিরিয়া গিয়া ডালের বাটি আনিয়া দিল। খাওয়ার মধ্যে মেয়েটি অনেক বার যাতায়াত করিল। ক্ষেত্রবাবু দু-একবার মেয়েটির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—মুখখানা ভাল ছাড়া মন্দ বলিয়া মনে হইল না তাঁহার কাছে। ভাল করিয়া চাহিতে পারিলেন না, দাদা পাশে বসিয়া খাইতেছেন। আহারাদির পর ক্ষেত্রবাবু বিশ্রাম করিতেছেন, সেই মেয়েটিই আসিয়া পান দিয়া গেল। ক্ষেত্রবাবুর কৌতূহল হইল জানিবার জন্য মেয়েটি কে, কিন্তু কখনো অপরিচিতা মেয়ের সঙ্গে কথা কওয়ার বা মেলামেশার অভিজ্ঞতা না থাকায় চুপ করিয়া রহিলেন। গরীব স্কুলমাষ্টার, তেমন সমাজে কখনও যাতায়াত নাই।

এদিন এই পর্য্যন্ত। মেয়েটি আর আসিল না সারাদিনের মধ্যে। কিন্তু ক্ষেত্রবাবুর মন যেন তাহার জন্য উৎসুখ হইয়া রহিল সারাদিন। মুখখানা বেশ। সেই মেয়েটি নাকি? কি জানি। লজ্জায় কথাটা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। পরে আরও দুদিন গেল, মেয়েটির কোনো চিহ্ন নাই

কোনো দিকে। হঠাৎ তৃতীয় দিনে মেয়েটি সকালে চায়ের পেয়ালা রাখিয়া গেল সাম্‌নে। ক্ষেত্রবাবুর বুকের মধ্যে কিসের একটা ঢেউ চমকিয়া উঠিল। মেয়েটি দোরের কাছে একটুখানি দাঁড়াইয়া চলিয়া গেল এবং আর কিছুক্ষণ পরে আবার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনাকে কি আর এক পেয়ালা চা দোব?

—চা, তা বেশ!

—আনবো?

—হ্যাঁ।

মেয়েটি এবার চলিয়া যাইতেই ক্ষেত্রবাবু ভাবিলেন, লজ্জা কিসের—এবার তিনি জিজ্ঞাসা করিবেনই। সেই মেয়েটি নয়, ও অন্য কেউ পাশের কোনো বাসার মেয়ে। কি জাতি, তাহারই বা ঠিক কি। তা হোক, একটু আলাপ করিতে দোষ নাই।

এবার চা আনিতেই ক্ষেত্রবাবু লাজুকতা প্রাণপণে চাপিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি বুঝি পাশের বাসাতেই থাকেন?

মেয়েটি যেন এতদিন ক্ষেত্রবাবুর কথা কহিবার আশায় ছিল, বহুবিলম্বিত ব্যাপারের অপ্রত্যাশিত সংঘটনে প্রথমটা নিজে যেন কিছু থতমত খাইয়া গেল। পরে বেশ সপ্রতিভভাবেই আঙুল তুলিয়া অনির্দ্দেশ্য একটা বাসার দিকে দেখাইয়া বলিল—পাশে না, ওই দিকে আমাদের বাসা—

—ও!

ক্ষেত্রবাবু আর কথা খুঁজিয়া পান না, মেয়েটি যেন আশা করিয়াই দাঁড়াইয়া আছে—তিনি আবার কথা বলিবেন। ক্ষেত্রবাবু পুনরায় মরিয়া হইয়া বলিলেন—আপনার বাবা বুঝি রেলে কাজ করেন?

—পার্শেল আপিসে কাজ করেন।

—বেশ।

মেয়েটি তখনও দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া ক্ষেত্রবাবু আকাশ পাতাল ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি পড়েন বুঝি?

—এখন বাড়ীতেই পড়ি, গার্লস্ স্কুলে থার্ড ক্লাস পর্য্যন্ত পড়েছিলাম, এখন বড় হয়েছি তাই আর স্কুলে যাইনে।

মেয়েটি যে ক'টি ইংরাজি কথা বলিল—সবগুলির উচ্চারণ স্পষ্ট ও জড়তা-শূন্য, অশিক্ষিত উচ্চারণ নয়। ইংরাজি-জানা মেয়ে ক্ষেত্রবাবু এ পর্য্যন্ত দেখেন নাই, মেয়েটির প্রতি সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—এখানে বুঝি গার্লস্ স্কুল আছে?

—বেশ বড় স্কুল তো, আড়াই শো মেয়ে পড়ে।

—হেড্ মিষ্ট্রেস্ কে?

—আমাদের সময়ে ছিলেন মিস্ সুকুমারী দত্ত বি-এ, বি-টি—এখন কে এসেছেন জানি নে!

বা রে, মেয়েটি 'বি-টি'র খবর পর্য্যন্ত রাখে। স্কুলমাষ্টার ক্ষেত্রবাবু প্রশংসায় বিগলিত হইয়া উঠিলেন মনে মনে।

যেন কোনো অদৃষ্টপূর্ব্ব কিছু দেখিতেছেন। বেশ মেয়েটি তো!

—আপনাদের স্কুলে পুরুষ মানুষ টিচার নেই বুঝি?

—নীচের দিকে একজন আছেন ভুবনবাবু বলে, বুড়োমানুষ। আমরা দাদু বলে ডাকতাম—

—পড়ানো বেশ ভাল হোত স্কুলে? অঙ্ক কসাতেন কে?

ক্ষেত্রবাবু এবার কথা কহিবার বিষয় খুঁজিয়া পাইয়াছেন।

—নীহার-দি। মিস্ নীহার তালুকদার, ওঁরা ব্রাহ্ম—

বাঃ, মেয়েটি ব্রাহ্মদের খবরও রাখে। এত বাহিরের খবর-জানা মেয়ে সাধারণ গৃহস্থঘরে বড় একটা দেখা যায় না, অন্ততঃ ক্ষেত্রবাবু তো দেখেন নাই। ইচ্ছা হইল, খানিকক্ষণ মেয়েটির সঙ্গে গল্প করেন—কিন্তু সাহসে কুলাইল না। কে কি মনে করিতে পারে।

পরদিন বৈকালে ক্ষেত্রবাবুর বৌদিদি বলিলেন—শশীবাবুদের বাসায় তোমার আর ওঁর নেমন্তন্ন।

ক্ষেত্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—শশীবাবু কে? সেই তাঁরা?

বৌদিদি হাসিমুখে বলিলেন—হ্যাঁ গো—সেই তারাই তো।

—সেখানে কি যাওয়া উচিত হবে ?

—কেন ?

—একটা আশা দেওয়া হবে—কিন্তু—

—কিন্তু কি ? তুমি বিয়ে করবে কি না, এই তো ?

—হ্যাঁ—তা—সেই রকমই ভাবছিলাম—

—কেন, মেয়ে পছন্দ হয় নি ?

ক্ষেত্রবাবু আকাশ হইতে পড়িলেন। তিনি তখনই ব্যাপারটা আগাগোড়া বুঝিয়া ফেলিলেন। বৌদিদির ষড়্‌যন্ত্র। তাহা হইলে শশীবাবুদের বাসার সেই মেয়েটি !

হাসিয়া বলিলেন—সব আপনার কারসাজি। তখন তা ভাবিনি যে, ওই মেয়ে—ও !

—মেয়ে খারাপ ?

ক্ষেত্রবাবু দেখিলেন, হঠাৎ নিজেকে অত্যন্ত খেলো করিয়া লাভ নাই—ওজনে ভারী থাকা মন্দ নয়। বলিলেন—মেয়ে ? হ্যাঁ—না, তা খারাপ নয়। তবে 'আহা মরি'ও কিছু নয়।

—মনের কথা বলছো ঠাকুরপো ? সত্যি বল, তোমার পছন্দ হয় নি ? অনিলার কিন্তু তোমাকে পছন্দ হয়েছে।

ক্ষেত্রবাবুর সতর্কতার বাঁধ হঠাৎ ভাঙিয়া গেল। তিনি তাড়াতাড়ি আগ্রহপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি, কি, কি রকম ?

ক্ষেত্রবাবুর বৌদিদি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—তবে নাকি ঠাকুরপোর মন নেই ? আমাদের কাছে চালাকি ? সত্যি তা হোলে ভাল লেগেছে। তবে আমিও বলছি শোনো, অনিলা তোমাকে দেখতেই এসেছিল আসলে। অবিশ্যি ছুতো করে এসেছিল। আমি যেন কিছু বুঝিনি এই ভাবে বল্লুম, কলকাতা থেকে আমাদের একজন আত্মীয় এসেছে, বাইরে বসে আছে—চা-টা দিয়ে এসো—ভাতটা দিয়ে এসো। একা পারছিনে। তাই ও গিয়েছিল। বার বার পাঠালে ভাল হয়, এম্‌নি মনে হোল। আজকালকার সব বড়সড় মেয়ে! ওদের ধরনই আলাদা। যেও কিন্তু—

রাত্রে সেই মেয়েটিই ক্ষেত্রবাবুদের পরিবেশন করিল। কিন্তু করিলে কি হইবে, দাদা পাশেই বসিয়া। ক্ষেত্রবাবু লজ্জায় মুখ তুলিয়া চাহিতেও পারিলেন না। খাওয়া দাওয়া মিটিয়া গেল। ছোট রেলওয়ে কোয়ার্টারের বাহিরের ঘরে ক্ষুদ্র তক্তপোষ সতরঞ্চির উপর ক্ষেত্রবাবু আসিয়া বসিলেন। বাড়ীর কর্ত্তা হঠাৎ ক্ষেত্রবাবুর দাদাকে কোথায় ডাকিয়া লইয়া গেলেন। অল্প পরেই সেই মেয়েটি একটা চায়ের পিরিচে চারটি পান আনিয়া তক্তপোষের এক কোণে রাখিল। ক্ষেত্রবাবু একটা বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিলেন—ও, এটা আপনাদের বাসা? আমি প্রথমটা বুঝতে পারিনি··

মেয়েটি চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু চলিয়া গেল না।

ক্ষেত্রবাবু আর কথা খুঁজিয়া পান না। মেয়েটি যখন সামনেই দাঁড়াইয়া, তখন বেশিক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলে বড় খারাপ দেখায়। চট্ করিয়া মাথায় কিছু আসেও না ছাই। তখন যে কথাটা আজ দুদিন হইতে মনে হইতেছে প্রায় সব সময়েই, সেটাই বলিলেন।

—রেলের বাসাগুলো বড় ছোট—না?

—হ্যাঁ।

—এতে আপনাদের অসুবিধে হয় না?

—আমাদের অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। এই তো রেলে রেলেই বেড়াচ্ছি কতদিন থেকে—ও সয়ে গিয়েছে। জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত এই রকমই দেখছি—

—এর আগে কোথায় ছিলেন আপনারা?

—আসানসোলে। তার আগে পাকুড়। তার আগে ছিলুম সক্রিগলি জংশন। তখন আমার বয়েস সাত বছর, কিন্তু সব মনে আছে আমার।

মেয়েটি বেশ সহজ সুরেই কথা বলিতে লাগিল, যেন ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে তার অনেক দিনের পরিচয়।

—আচ্ছা, আপনাদের দেশ কোথায়?

—হুগলী জেলায় আরামবাগ সাবডিভিসনে, কিন্তু সে বাড়ীতে আমরা যাইনি কোনো দিন। রেলের চাক্‌রীতে ছুটি পান না বাবা। আমার ভাইয়ের পৈতের সময় বাবা বলেছেন যাবেন।

মেয়েটি তাঁহাকে কোনো প্রশ্ন করে না, নিজে হইতেও কোনও কথা বলে না—কিন্তু তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য যেন উন্মুখী হইয়া থাকে। এ এমন এক অবস্থা, ক্ষেত্রবাবুর পক্ষে যাহা সম্পূর্ণ নূতন। নিভাননীর সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল, তখন তাঁহার বয়স উনিশ, নিভাননীর দশ। তখন নারীর মনের আগ্রহ বুঝিবার বয়স হয় নাই তাঁহার।

এতকাল পরে...এসব নূতন ব্যাপার জীবনের।

—আচ্ছা, আপনারা অনেক দেশ ঘুরেছেন, পাহাড় দেখেছেন?

—তিনপাহাড়ী বলে একটা ষ্টেশন আছে লুপ লাইনে। সেখানে বাবা কিছুদিন রিলিভিং-এ ছিলেন, সেখানে পাহাড় দেখেছি।

—আপনি তো দেখেছেন, আমি এখনও দেখিনি।

মেয়েটি বিস্ময়ের সুরে বলিল—আপনি পাহাড় দেখেন নি?

ক্ষেত্রবাবু হাসিয়া বলিলেন—নাঃ—কোথায় দেখবো? বরাবর কলকাতাতেই আছি। স্কুলের ছুটি থাকলেও টুইশানির ছুটি নেই। যাতায়াত বড় একটা হয় না। আপনাদের বড় মজা, পাসে যাতাযাত করতে পারেন।

মেয়েটি বিস্ময়ের সুরে বলিল—ওঃ ওঃ! খু-উ-ব।

—গিয়েছেন কোথাও?

—দুম্‌কায় আমার এক পিসেমশায় চাকরী করেন, দুম্‌কা রাজষ্টেটে। সেখানে মার সঙ্গে গিয়ে মাসখানেক ছিলাম একবার। আর একবার পুরী যাওয়ার সব ঠিকঠাক, আমার ছোট ভাইয়ের অসুখ হোল বলে বাবা পাস ফেরৎ দিলেন। সামনের বছর যাবেন বলেছেন। ও, আপনাকে আর দুটো পান দি—

—না না, আমি বেশি পান খাইনে। বরং খাবার জল এক গ্লাস যদি—

—আনি—

বলিয়াই মেয়েটি বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল এবং দুর্ভাগ্যের বিষয় (অখণ্ড সুখ জীবনে পাওয়া যায় না), তখনই বাহির হইতে শশীবাবুর সহিত ক্ষেত্রবাবুর দাদা গোবর্দ্ধনবাবু ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—ক্ষেত্র, তা হলে চল যাই।

একটু পরে জলের গ্লাস হাতে মেয়েটি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া নিঃশব্দে গ্লাসটি

তক্তপোষের কোণে রাখিয়া কিঞ্চিৎ দ্রুতপদেই চলিয়া গেল। ক্ষেত্রবাবু ও তাঁহার দাদাও বিদায় লইয়া চলিয়া আসিলেন।

সেই দিনই রাত্রে ক্ষেত্রবাবু বৌদিদির কাছে প্রকারান্তরে বিবাহে মত প্রকাশ করিলেন। পরবর্ত্তী তিন চারি দিনের মধ্যে সব ঠিকঠাক হইয়া গেল, সামনের অগ্রহায়ণ মাসের দোসরা ভাল দিন আছে। বরপণ এক শো এক টাকা নগদ ও দশ ভরি সোনার গহনা। ঠিকুজী কোষ্ঠী মিলিলে কথাবার্ত্তা পাকা হইবে।

ক্ষেত্রবাবু দাদাকে বলিলেন—দাদা, আমি তা হোলে কাল যাবো—

—এখনই কেন? আর দু-চার দিন থাকো না?

—না দাদা, খোকাখুকী রয়েছে পড়ে সেখানে। যাই একবার।

যাইবার পূর্ব্বদিন পুনরায় শশীবাবুর বাড়ী তাঁহার নিমন্ত্রণ হইল। এদিন কিন্তু ক্ষেত্রবাবুর উৎসুক দৃষ্টি চারি দিক্ খুঁজিয়াও মেয়েটির টিকি দেখিতে পাইল না।

বার্ষিক পরীক্ষা চলিতেছে। হেড্‌মাষ্টারের তাড়নায় মাষ্টারেরা অতিষ্ঠ। বড় হলে যদুবাবু ও শরৎবাবু পাহারা—হঠাৎ মিঃ আলম তদারক করিতে আসিয়া ধরিয়া ফেলিলেন, দুজন ছাত্র টোকাটুকি করিতেছে।

মিঃ আলম বলিলেন—আপনারা কি দেখছেন যদুবাবু, কত ছেলে টুক্‌ছে—

যদুবাবু দেখিতেছিলেন না সত্যই—এই স্কুলে উনিশ বৎসর হইয়া গেল তাঁহার। সাহেব আসিবার অনেক আগে হইতে এখানে ঢুকিয়াছেন। নতুন মাষ্টার যারা, খুব উৎসাহের সঙ্গে এদিক্ ওদিক্ ঘোরাঘুরি করে,—তাঁহার সে বয়স পার হইয়া গিয়াছে। তিনি চেয়ারে বসিয়া ঢুলিতেছিলেন।

সাহেবের টেবিলের সামনে দাঁড়াইতে হইল দুজনকেই। সাহেব ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দুজনের দিকে চাহিলেন।

—কি যদুবাবু, আপনার হলে এই দুজন ছাত্র টুকছিল—আপনি দেখেন না, আপনাদের কৈফিয়ৎ কি?

—দেখছিলাম স্যার।

—দেখলে এ রকম হোল কেন?

—ছেলেরা বড় দুষ্টু, স্যার—কি ভাবে যে ঢোকে—

—চেয়ারে বসে পাহারা দেওয়ায় কাজ হয় না। বিশেষ করে যদুবাবু, আপনার আর মনোযোগ নেই স্কুলের কাজে, অনেক দিন থেকে লক্ষ্য করছি। এ স্কুলে আপনার আর পোষাবে না।

যদুবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

—আর শরৎবাবু, আপনি নতুন এসেছেন, আজ দু-বছর। কিন্তু এখনি এমনি গাফিলতি কাজের, এর পরে কি করবেন? আপনাদের দ্বারা স্কুলের কাজ আর চলবে না। এখন যান আপনারা, ছুটির পরে একবার আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

যদুবাবু রাগ করিয়া হলে ঢুকিয়া প্রত্যেক ছাত্রের পকেট খানাতল্লাস করিতে আরম্ভ করিলেন। নিম্নলিখিত জিনিষগুলি বাহির হইল খানাতল্লাসের ফলে। (১) থার্ড ক্লাসের এক ছেলের পকেট হইতে একখানা ইতিহাসের বইয়ের পাতা, (২) সেই ক্লাসের আর একটি ছেলের কোঁচায় লুকানো একখানি আস্ত ইতিহাসের বই, (৩) নারাণবাবুর ছাত্র, চুনির খাতার মধ্যে চার পাঁচখানা কাগজে নানারূপ নোট্ লেখা, (৪) সেভেন্থ্ ক্লাসের একটি ছেলের ডেস্ক হইতে দুখানি বই। একখানি ইংরাজি ইতিহাসের বই,—এবেলা আছে ইতিহাসের পরীক্ষা, আর একখানি হইল ভূগোল, যাহার পরীক্ষা ওবেলা আছে। বোঝা গেল, ইতিহাসের বই হইতে কিছু আগেও সে টুকিতেছিল।

সব ক'জনকে হেড্ মাষ্টারের কাছে হাজির করা হইল। সাহেবের হুকুমে তাহাদের এবেলা পরীক্ষা দেওয়া রহিত হইয়া গেল। বাড়ীতে তাহাদের অভিভাবকদের কাছে পত্র গেল। নারাণবাবুর ছাত্র চুনি বাড়ী যাইতেছিল, নারাণবাবু ডাকিয়া পাঠাইলেন।

—হ্যাঁ চুনি, তুমি নোট লিখে এনেছিলে?

চুনি চুপ করিয়া রহিল।

—কেন এনেছিলে? কার কাছ থেকে লিখে এনেছিলে? ও লিখে আনা কি তোমার উচিত হয়েছে?

—না স্যার—

—তবে আনলে কেন ?

—আর কখনো আনবো না ।

—তা তো আনবে না বুঝলাম। এদিকে একটা পেপার পরীক্ষা দিতে পারলে না। পাশনম্বর থাকবে কি করে, তাই ভাবছি।—চুনি, খিদে পেয়েছে ? কিছু খাবি ? আয় আমার ঘরে—

নিজের ছোট ঘরটাতে লইয়া গিয়া নারাণবাবু তাহার পিঠে হাত দিয়া কত ভাল ভাল কথা বোঝাইলেন, মিথ্যা দ্বারা কখনো মহৎ কাজ হয় না ইত্যাদি। গীতার শ্লোক পড়িয়া শোনাইলেন। ছোলাভিজে ও চিনি এবং আধখানা পাঁউরুটি খাওয়াইলেন। চুনি যাইবার সময় বলিল—স্যার, একটা কথা বলবো ? বাড়ী গিয়ে কোন কথা বলবেন না যেন—

—না, আমার যেচে কিছু বলবার দরকার কি। কিন্তু হেড্ মাষ্টারের চিঠি যাবে তোমার বাবার নামে—

চুনির মুখ শুকাইল। বলিল—কেন স্যার ?

—তাই সাহেবের নিয়ম—

—আপনি হেড্ স্যারকে বুঝিয়ে বলুন না ? আপনি বল্লেই—

—যা, বাড়ী যা এখন। দেখি আমি—

চুনি চলিয়া গেলে নারাণবাবু ভাবিতে লাগিলেন, চুনির এ অসাধু প্রকৃতিকে কি করিয়া ভিন্ন পথে ঘুরাইবেন। আজ যে ভাবে বলিলেন, ও ঠিক পথ নয়। গীতার শ্লোক বলা উচিত হয় নাই—অতটুকু ছেলে গীতার কথা কি বুঝিবে ? তাঁহার নোট্বুকে টুকিয়া রাখিলেন—চুনি—মিথ্যা ব্যবহার, হাউ টু করেক্ট্ অনুকূলবাবু হইলে কি করিতেন ? নারাণবাবু গভীর দুশ্চিন্তায় মগ্ন হইলেন।

চায়ের দোকানে বসিয়া সে দিন যদুবাবু আস্ফালন করিতেছিলেন।

—এক পয়সার মুরোদ নেই স্কুলের—আবার লম্বা লম্বা কথা! ডিউটি, ট্রুথ্—আরে মশাই, পুজোর ছুটির মাইনে দু'টাকা এক টাকা করে সে দিন শোধ হোল। গরীব মাষ্টারেরা কি খায় বলো তো ?

ক্ষেত্রবাবু হাসিয়া বলিলেন—না পোষায়, চলে যেতে পারেন দাদা। সাহেবের গেট্ ইজ্ ওপ্ন্—

রামেন্দুবাবু আর নতুন টিচার নন, দু-তিন বছর হইয়া গেল এ স্কুলে, তিনি সব দিন এ মজলিসে থাকেন না, আজ ছিলেন।

বলিলেন—জানুয়ারী মাস থেকে মাইনে কাটা হবে, জানেন না বোধ হয়?

সকলেই চমকিয়া উঠিলেন। যদুবাবু ও জগদীশ জ্যোতির্ব্বিনোদ একসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন—কে বল্লে? অ্যাঁ, আবার মাইনে কাটা!

—জানুয়ারী মাসে ছাত্র ভর্ত্তি না হোলে মাইনে কাটা হবেই।

—এই সামান্য মাইনে, এও কাটা হবে? আপনি একটু বলুন হেড্ মাষ্টারকে—

—বলেছিলাম। কিন্তু বজেট্ যা, তাতে মাইনে না কাট্‌লে মাষ্টারদের মধ্যে দু-এক জনকে জবাব দিতে হবে কাজ থেকে। তার চেয়ে সকলকে রেখে মাইনে কাটা ভাল—

জ্যোতির্ব্বিনোদ বলিলেন—সে যাক্‌গে, যা হয় হবে। এখন সাহেবের কাছে একটা দরখাস্ত দেওয়া যাক আসুন, যাতে মাসের মাইনেটা ঠিক সময় পাই। আড়াই মাস খেটে এক মাসের মাইনে নিয়ে এভাবে তো আর পারা যাচ্ছে না।

রামেন্দুবাবু বলিলেন—ও করতে যাবেন না। তাতে ফল হবে না। আমি কি ও নিয়ে বলিনি ভাবছেন?

যদুবাবু বলিলেন—না, আপনি যা বলেন, তার ওপর আমাদের কথা কওয়ার দরকার কি। যা ভাল হয় করবেন।

চায়ের দোকান হইতে বাহির হইয়া কে একজন বলিলেন—আজ যে নারাণ দাকে দেখছি নে?

জ্যোতির্ব্বিনোদ বলিলেন—যখন আসি, ঘরে উঁকি মেরে দেখি, তিনি কি লিখছেন বসে বসে একমনে। আমি আর ডাকলাম না।

রামেন্দুবাবু বলিলেন—ওই একজন বড় খাঁটি, sincere লোক, সে কালের

গুরুর মত। ও টাইপ আজকাল বড় একটা দেখা যায় না এ ব্যবসাদারির যুগে। আচ্ছা, আমি এখন চলি—বসুন।

বসিবার সময় নাই কাহারো। সকলকেই এখনি টুইশানিতে যাইতে হইবে।

ক্ষেত্রবাবু চায়ের দোকান হইতে পাশেই শ্রীনাথ পালিতের লেনে বাসায় গেলেন। পনেরো টাকা ভাড়ায় দুখানি ঘর একতালায়, ছোট্ট রান্নাঘর। একদিকে সিঁড়ির নীচে কয়লা রাখিবার জায়গা। অন্ধকার কলঘরে একজন লোক দিনমানে ঢুকিলেও বাহির হইতে হঠাৎ দেখিবার যো নাই। তারের আন্‌লায় কাপড় শুকাইতেছে। বাড়ীওয়ালী শুচিবেয়ে বুড়ী গামছা পরিয়া ঝাঁটা হাতে উঠানে জল দিয়া ঝাঁট দিতেছে ও ধুইতেছে।

অনিলা বাহিরে আসিয়া হাসিমুখে বলিল—দেরি হোল যে?

—কোথায় দেরি? কানু কই?

—সে বল্ খেলা দেখতে গিয়েছে, ইণ্টার-স্কুল ম্যাচ্ আছে কোথায়। চা খাবে?

—না, এই খেয়ে এলাম দোকান থেকে—

অনিলা হাত পা ধুইবার জল আনিয়া একটা ছোট টুল পাতিয়া দিল, একখানা গামছা টুলের উপর রাখিল। তারপর একটা বাটিতে মুড়ি মাখিয়া এক পাশে একটু গুড় দিয়া স্বামীকে খাইতে দিল। ক্ষেত্রবাবু হাত মুখ ধুইয়া জলযোগ সমাপনান্তে টুইশানিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

অনিলা বলিল—একটু জিরোবে না?

—না, দেরি হয়ে যাবে।

—অমনি বাজার থেকে ছোট খুকীর জন্তে একটা বালি কিনে এনো, আর জিরে মরিচ।

—আর কি কি নেই দেখো—

—আর সব আছে, আনতে হবে না।

বড় খুকী এই সময়ে বলিল—বাবা, আমার জন্যে একটা পেন্সিল কিনে এনো—আমার পেন্সিল নেই।

অনিলা বলিল—পেন্সিল আমার কাছে আছে, দেবো এখন। মনে করে দিস্ কাল সকালে।

ক্ষেত্রবাবু মাসখানেক হইল, নতুন বাসায় উঠিয়া আসিয়া নতুন সংসার পাতিয়াছেন। মন্দ লাগিতেছে না। নিভাননীর মৃত্যুর পরে দিনকতক বড় কষ্ট গিয়াছিল, এখন আবার একটু সেবাযত্নের মুখ দেখিতেছেন। চিরকাল স্ত্রী লইয়া সংসার-ধর্ম্ম করায় অভ্যস্ত, স্ত্রীবিয়োগের পর সব যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিত। অসুবিধাও ছিল বিস্তর, আট বছরের খুকীকে গৃহিণী সাজিতে হইয়াছিল, কিন্তু খুকী যতই প্রাণপণে চেষ্টা করুক, অনভিজ্ঞা শিশু মেয়ে কি তার মায়ের স্থান পুর্ণ করিতে পারে?

আবার সংসারে আয়না চিরুণীর দরকার হইতেছে, সিঁদুর কিনিতে হইতেছে—স্নো পাউডার কিনিবার প্রয়োজন তো আসিয়া পড়িল। চিরকাল যে গরুর কাঁধে জোয়াল, ছাড়া পাইলে অনভ্যস্ত মুক্তির অভিজ্ঞতা তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তোলে। মনে হয়, সংসার হইল না, কাহার জন্য খাটিয়া মরিব, কে আমার অসুখ হইলে মুখে একটু জল দিবে—ইত্যাদি। যে বলিষ্ঠ ও শক্তিমান্ মন মুক্তির পরিপুর্ণতাকে ভোগ করিতে পারে, নির্জ্জনতার ও উদাস মনোভাবের মধ্য দিয়া জীবনে নব নব দর্শন ও অনুভূতিরাজির সম্মুখীন হয়—নিরীহ স্কুল মাষ্টার ক্ষেত্রবাবুর মন সে ধরণের নয়। কিন্তু না হইলে কি হয়? যে ভাবে যে জীবনকে ভোগ করিতে পারে, সেই ভাবেই জীবন তাহার নিকট ধরা দেয়—ইহাতেই তাহার সার্থকতা। বাঁধা-ধরা নিয়ম কি-ই বা আছে জীবনকে ভোগ করিবার?

ক্ষেত্রবাবু ছাত্রদের একতালা কুঠুরীর অন্ধকূপে গিয়া ভীষণ গরমের মধ্যে পাখার তলায় অবসন্ন দেহ একখানা ইংরাজি ডিক্সনারির উপর এলাইয়া দিয়া পড়ানো সুরু করিলেন। আগে বেশ সময় কাটিত এখানে। এখন মনে হয়, অনিলার সঙ্গে গিয়া কতক্ষণে দু-দণ্ড কথা বলিবেন। ছাত্রও ছাড়ে না, এটা বুঝাইয়া দিন, ওটা বুঝাইয়া দিন, করিতে করিতে রাত সাড়ে ন'টা বাজাইয়া

দিল। তারপর আসিল ছাত্রের কাকা। সে এফ্-এ ফেল, কিন্তু তাহার বিশ্বাস ইংরাজিতে তাহার মত পণ্ডিত নাই, ভুল ইংরাজিতে সে ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে আলোচনা করিতে লাগিল, কি ভাবে ছেলেদের ইংরাজি শিখাইতে হয়, আজকালকার প্রাইভেট মাষ্টারেরা ফাঁকিবাজ, পড়াইতে জানে না, কেবল মাহিনা বাড়াও, এই শব্দ মুখে। তারপর সে আবার দেখিতে চাহিল, আজ ক্ষেত্রবাবু ছেলেদের কি পড়াইয়াছেন, কালকার পড়া বলিয়া দিয়াছেন কি না, টাস্ক দিয়াছেন কি না।

লোকটার হাত এড়াইয়া রাত দশটার সময় ক্ষেত্রবাবু বাসার দিকে আসিতেছেন, এমন সময়ে পথে রাখাল মিস্তিরের সঙ্গে দেখা। ক্ষেত্রবাবু পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিয়াও পারিলেন না, রাখাল মিস্তির ডাকিয়া বলিল—এই যে! ক্ষেত্রবাবু যে! শুনুন, শুনুন—

—রাখালবাবু যে! ভাল আছেন?

—কই আর ভাল, খেতেই পাইনে, তার ভাল। আপনারা তো কিছু করবেন না।

বলিতে বলিতে রাখালবাবু ক্ষেত্রবাবুর দিকের ফুটপাথে আসিয়া উঠিলেন।

—আসুন না, কাছেই আমার বাসা। একটু চা খেয়ে যান। সে দিন আপনাদের স্কুলে গিয়েছিলাম আমার বই দুখানা নিয়ে। সাহেব তো কিছু বোঝে না বাংলা বইয়ের, আপনারা একটু না বললে আমার বই ধরানো হবে না।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—এত রাত্তিরে আর যাবো না রাখালবাবু, এখন চা খায় কেউ? আমি যাই—

—তবে আসুন, এই মোড়েই চায়ের দোকান, খাওয়া যাক একটু—

অগত্যা ক্ষেত্রবাবুকে যাইতে হইল। রাখালবাবু নাছোড়-বান্দা লোক, অনেক দিনের অভিজ্ঞতায় ক্ষেত্রবাবু জানেন, ইহার হাতে পড়িলে নিস্তার নাই। চা খাইতে খাইতে রাখালবাবু বলিলেন—এবার মশাই, ধরিয়ে দিতে হবে আমার বই দুখানা। আপনাদের মিঃ আলম ভারি দুষ্ট লোক, আমায়

বলে কি না, ও সব চলবে না, আজকাল অনেক ভাল বই বেরিয়েছে। আমি বলি, তোমার বাবা আমার বই প'ড়ে মানুষ হয়েছে, তুমি আজ এসেছ রাখাল মিত্তিরের বইয়ের খুঁৎ ধরতে?

রাখাল মিত্তিরকে ক্ষেত্রবাবু বহুদিন ধরিয়া জানেন। বয়স পঁয়ষট্টি, জীর্ণ অতিমলিন লংক্লথের পিরান গায়ে, তাতে ঘাড়ের কাছে ছেঁড়া, পায়ে সতেরো তালি জুতা। রাখালবাবু কলিকাতার স্কুলসমূহে অতি পরিচিত, পনেরো বছর হইল, স্কুল মাষ্টারি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য বই স্কুলে স্কুলে শিক্ষকদের ধরিয়া চালাইয়া দেন। তাহাতেই কায়ক্লেশে সংসার চলে।

ক্ষেত্রবাবুর দুঃখ হয় রাখালবাবুকে দেখিয়া। এই বয়সে লোকটা রৌদ্র নাই, বৃষ্টি নাই, টো-টো করিয়া স্কুলে স্কুলে সিঁড়ি ভাঙিয়া ওঠানামা করিয়া বই চালানোর তদ্বির করিয়া বেড়ায়। কিন্তু বিশেষ কিছু হয় না। লোকটার পরণ-পরিচ্ছদেই তাহা প্রকাশ।

বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিবার জন্য ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—না না, আপনার বই খারাপ কে বলে। চমৎকার বই।

রাখাল মিত্তির খুশি হইয়া বলিল—তাই বলুন দিকি! সকলে কি বোঝে? আপনি একজন সমজদার লোক, আপনি বোঝেন। আরে, এ কালে ব্যাকরণ জানে কে? আমি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষাতে ব্যাকরণে ফার্ষ্ট হই, আমার মেডেল আছে, দেখাবো।

—বলেন কি!

—সত্যি। আপনি আমার বাসায় কবে আসছেন বলুন, দেখাবো।

—না, দেখাতে হবে কেন। আপনি কি আর মিথ্যে বলছেন।

—সে দিন অমনি এক স্কুলের হেড্‌মাষ্টার বল্লে,—মশাই, আপনার বই পুরোনো মেথডে লেখা। ও এখন আর চলে না। এখন কত নতুন অথর বেরিয়েছে, তাদের বইয়ের ছাপা, ছবি, কাগজ অনেক ভাল। আপনার বই আজকাল ছেলেরাই পছন্দ করে না।—শুনলেন? আরে, রাখাল মিত্তিরের বই পড়ে কত অথর সৃষ্টি হয়েছে। অথর!...আমাকে এসেছেন মেথড

শেখাতে। পয়সা হাতে পাই তো ভাল ছাপা-ছবি আমিও করতে পারি। কিন্তু কি করবো, খেতেই পাইনে, চলেই না। বুড়ো বয়সে লোকের দোর দোর ঘুরে বই ক'খানা ধরাই, তাতেই কোনো রকমে—ছেলেটা আজ যদি মরে না যেতো, তবে এত ইয়ে হোত না। ধরুন, পঁচিশ বছরের জোয়ান ছেলে, আজ বাঁচলে চৌত্রিশ বছর বয়স হোত। আমার ভাবনা কি?

—আচ্ছা, আমি দেখবো চেষ্টা করে, এখন উঠি রাখালবাবু, রাত অনেক হোল।

—এই শুনুন—নব ব্যাকরণ-সুধা ১ম ভাগ, ফোর্থ ক্লাসের জন্যে। নব ব্যাকরণ-সুধা দ্বিতীয় ভাগ, থার্ড ক্লাসের উপযুক্ত—আর এবার নতুন একখানা বাংলা রচনা লিখেছি, রচনাদর্শ প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। খুব ভাল বই, পড়ে দেখবেন। সব রকমের রচনা আছে তাতে। কি ভাষা! ব্যাটারা সব বই লিখেছে, রচনা হয় কারো? কোনো ব্যাটা বাংলা সেণ্টেন্স্ শুদ্ধ করে লিখতে জানে? নিয়ে আসুন বই, আমি পাতায় পাতায় ভুল বার করে দেবো—একবার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় 'কৃৎ' প্রত্যয়ের—চল্লেন যে, ও ক্ষেত্রবাবু, আচ্ছা। তা হোলে শনিবারে বই নিয়ে যাবো, শুনুন মনে থাকবে তো? দেবেন একটু বলে হেড্‌মাষ্টারকে। আর শুনুন, বাংলা রচনাও একখানা নিয়ে যাবো—যাতে হয়, একটু দেবেন বলে—নমস্কার—

ক্ষেত্রবাবু শেষের কথাগুলি ভাল শুনিতে পাইলেন না, তখন তিনি একটু দূরে গিয়া পড়িয়াছেন।

বাসায় অনিলা তাঁহার ভাত ঢাকা দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ক্ষেত্রবাবু ভাবেন, ছেলেমানুষ—এত রাত পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকার অভ্যাস নাই, সারাদিন খাটিয়া বেড়ায়। স্ত্রীকে ডাক দেন, অনিলা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসে, স্বামীকে দেখিয়া অপ্রতিভ হয়। বলে—এত রাত আজ?

—ঘুমুচ্ছিলে বুঝি?

অনিলা হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ, খোকাখুকীদের খাইয়ে দিলাম—তারপর একখানা বই পড়তে পড়তে কখন ঘুম এসে গিয়েছে—

ক্ষেত্রবাবু আহারাদি করিলেন। অনিলা বলিল—হ্যাঁ গা, রাগ করনি তো, ঘুমুচ্ছিলাম বলে ?

—বাঃ, বেশ, রাগ করবো কেন ?

—আমার বালি আর জিরে-মরিচ এনেছ ?

—ঐ যাঃ! একদম ভুলে গিয়েছি। ভুলবো না ?—যদি বা ছাত্রের কাকার হাত এড়িয়ে বেরুলাম, তো পড়ে গেলাম রাখাল মিত্তিরের হাতে। সব স্কুলের সব মাষ্টার ওকে এড়িয়ে চলে। একবার পাকড়ালে আর নিস্তার নেই।

—সে কে ?

—অথর।

—কি কি বই আছে, কই, নাম শুনিনি তো—

—শুনবে কি, বঙ্কিমবাবু, না রবি ঠাকুর, না শরৎ চাটুয্যে ? স্কুলের—স্কুলের বই লেখে, নব কবিতাপাঠ, বাল্যবোধ—এই সব। বড্ড গরীব, হাতে পায়ে ধরে বই চালায়। ছিনে জোঁক।

—একদিন এনো না বাসায়, দেখবো। আমি অথর কখনো দেখিনি—একদিন চা খাওয়াবো—

—রক্ষে করো। তুমি চেনো না রাখাল মিত্তিরকে। বাসায় আনলে আর দেখতে হবে না। সে কথাই তুলো না।

—বড় লোক ?

—খেতে পায় না। বই চলে না, সেকেলে ধরণের বই, একালে অচল। ওই যে বল্লাম, নাছোড়বান্দা হয়ে ধরে পেড়ে চালায়।

অনিলার লেখাপড়ার উপর খুব অনুরাগ দেখিয়া ক্ষেত্রবাবুর আনন্দ হয়। নিভাননী লেখাপড়া জানিত সামান্যই, অনিলা মন্দ লেখাপড়া জানে না, ইংরাজিও জানে। বই পড়িতে ভালবাসে বলিয়া শাঁখারিটোলার লাইব্রেরি হইতে ক্ষেত্রবাবু গত মাস হইতে বই আনিয়া দেন, দুখানা বই একদিনেই কাবার। সম্প্রতি স্কুলের লাইব্রেরি হইতে ছোট ছোট ইংরাজি বই আসে—অনিলার সেগুলি পড়িতে একটু সময় লাগে।

অনিলা সব সময় সব কথার মানে বুঝিতে পারে না। বলে—হ্যাঁ গা, হপ মানে কি? বইয়েতে আছে এক জায়গায়—

—লাফিয়ে লাফিয়ে চলা—

—উঁহু, লাফানো নয়, কোনো গাছপালা হবে। লাফানো হোলে সে জায়গায় মানে হয় না।

—ওহো, ও একরকমের লতা, চাষ হয় ইংলণ্ডে, বিশেষ করে স্কট্‌ল্যাণ্ডে। মদ চোলাই হয় লতা থেকে, হুইস্কি বিশেষ করে—

ছোট খুকী ঘুমের ঘোরে ভয় পাইয়া কাঁদিয়া উঠিতে অনিলা ছুটিয়া গেল।

বেলা চারিটা বাজে। হেড্ মাষ্টারের সার্কুলার বাহির হইল, ছুটির পরে জরুরী মিটিং, কোন মাষ্টার যেন চলিয়া না যায়। মাষ্টারদের মুখ শুকাইল। আজ দুদিন আগে সাহেব ক্লাসে ঘুরিয়া পড়ানোর তদারক করিয়া গিয়াছেন, আজ সেই সব ব্যাপারের আলোচনা হইবে, কাহার না জানি কি খুঁৎ বাহির হইয়া পড়িল!

যদুবাবু ফাঁকিবাজ মাষ্টার, তাঁহার খুঁৎ বাহির হইবেই তিনি জানেন। অনেক দিন অনেক তিরস্কার খাইয়াছেন, বড় একটা গ্রাহ্য করেন না।

মিটিং-এ হেড মাষ্টার বলিলেন—সে দিন আপনাদের ক্লাসে পড়ানো দেখে খুব আনন্দিত হওয়ার আশা করেছিলাম; দুঃখের বিষয়, সে আনন্দলাভ ঘটেনি। টিচারদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আপনাদের অনেকবার বলেছি, কিন্তু তবুও এমন কতকগুলি টিচার আছেন, যাঁদের বার বার সে কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়ে দিতে হয়, এটা বড় দোষের কথা। রামবাবু?

একটি ছিপ্‌ছিপে ছোকরা গোছের মাষ্টার দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—স্যার?

—আপনি ফিফ্‌থ্ ক্লাসে জিওগ্রাফি পড়াচ্ছিলেন, কিন্তু ম্যাপ নিয়ে যাননি কেন?

রামবাবু নিরুত্তর।

—কত বার না বলেছি, ম্যাপ না দেখালে জিওগ্রাফি পড়ানো—

এইবার রামবাবু সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিলেন—স্যার, দেশের কথা পড়ানো হচ্ছিল না, বাংলা দেশের উৎপন্ন দ্রব্য পড়াচ্ছিলাম, তাই—

—ও! উৎপন্ন দ্রব্য পড়ালে ম্যাপ নিয়ে যেতে হবে না? কেন, বাংলা-দেশের ম্যাপ নেই?···আর ক্ষেত্রবাবু?

ক্ষেত্রবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

—আপনি রচনা শেখাচ্ছিলেন থার্ড ক্লাসে। কিন্তু শুধু সামনের বেঞ্চিতে যারা বসে আছে, তাদের দিকে চেয়ে কথা বলছিলেন, পেছনের বেঞ্চির ছাত্ররা তখন গল্প করছিল। ক্লাস সুদ্ধ ছেলের মনোযোগ আকর্ষণ করতে না পারলে আপনার পড়ানো বৃথা হয়ে গেল, বুঝতে পারলেন না? তা ছাড়া ব্ল্যাকবোর্ড আদৌ ব্যবহার করেন নি সে ঘণ্টায়।—পাণ্ডিট্?

পণ্ডিত বলিতে কোন্ পণ্ডিত, বুঝিতে না পারিয়া দুই পণ্ডিতই উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সাহেব জ্যোতির্ব্বিনোদের দিকে আঙুল দিয়া বলিলেন—আপনি বাংলা পড়াচ্ছিলেন ফোর্থ ক্লাসে। আপনি কি ভাবেন, খুব চেঁচিয়ে পড়ালেই ভাল পড়ানো হোল। আপনি নিজের প্রশ্নের নিজেই উত্তর দিচ্ছিলেন, নামতা পড়ানোর সুরে চীৎকার ক'রে পড়াচ্ছিলেন—ফলে, ইউ ফেল্‌ড্ টু ক্যারি দি ক্লাস উইথ্ ইউ।—

পরে হেড্‌পণ্ডিতের দিকে বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া রহস্যের সুরে বলিলেন—তা বলে ভাববেন না—আপনার পড়ানো নিখুঁৎ। আপনি এক জায়গায় বসে পড়ান, সামনের বেঞ্চিতে দৃষ্টি রাখেন এবং মাঝে মাঝে অবান্তর গল্প করেন।—যদুবাবু?

যদুবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

—আপনার কোন দোষই গেল না। আমার মনে হয়, আপনার কাজে মন নেই। আপনার দোষের লিষ্ট্ এত লম্বা হয়ে পড়ে যে, তা বলা কঠিন। আপনি কোন দিন ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহার করেন না, ক্লাসে ছেলেদের প্রশ্ন করেন না, টাস্ক্ দেন না—সে দিন বায়ুপ্রবাহের গতি বোঝাচ্ছিলেন, গ্লোব নিয়ে যাননি ক্লাসে। গ্লোব না নিয়ে গেলে—

এমন সময়ে একটি ছাত্রকে মিটিংয়ের ঘরের মধ্যে উঁকি মারিতে দেখিয়া হেড্‌মাষ্টার ধমক দিয়া বলিলেন—কি চাই? এখানে কেন?

ছাত্রটি মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিল—স্যার, ফোর্থ ক্লাসের ধীরেনের চোখে বল লেগে চোখ বেরিয়ে এসেছে—

সকলেই লাফাইয়া উঠিলেন।

হেড্‌মাষ্টার বলিলেন—চোখ বেরিয়ে এসেছে, কোথায় সে?

সকলে নীচের তলায় ছুটিলেন। স্কুলের বারান্দায় একটা তেরো চোদ্দ বছরের ছেলেকে শোয়াইয়া আরও অনেক ছেলে ঘিরিয়া মাথায় জল দিতেছে, বাতাস করিতেছে। হেড্‌মাষ্টারকে দেখিয়া ভিড় ফাঁক হইয়া গেল। সত্যই চোখ বাহির হইয়া আধ ইঞ্চি পরিমাণ ঝুলিয়া পড়িয়াছে। বীভৎস দৃশ্য!

তখনই মেমসাহেব খবর পাইয়া আসিয়া ছেলেটিকে কোলে লইয়া বসিল। সাহেব দারোয়ানকে ছেলের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন—বড়লোকের ছেলে, বাড়ীতে মোটর আছে। মোটর আসিতে দেরি দেখিয়া সে স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে বল খেলিতেছিল,—তাহার ফলেই এ দুর্ঘটনা।

দেখিতে দেখিতে ছেলের বাড়ীর লোক মোটর লইয়া ছুটিয়া আসিল। তার পূর্ব্বেই স্কুলের পাশের ডাঃ বসু হেড্‌মাষ্টারের আহ্বানে আসিয়া ছেলেটিকে প্রাথমিক চিকিৎসা করিতেছিলেন। ছেলের বাবা, হেড্‌ মাষ্টার ও ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ছেলেকে মোটরে মেডিকেল কলেজে লইয়া গেল। হেড্‌মাষ্টার সঙ্গে দুজন মাষ্টার দিলেন, শরৎবাবু ও গেম্‌ মাষ্টার বিনোদবাবুকে যাইতে হইল।

পরের কয়দিন হেড্‌মাষ্টার নিজে এবং আরও তিন চার জন মাষ্টার হাসপাতালে গিয়া ছেলেটিকে দেখিতে লাগিলেন। যে চোখে চোট লাগিয়াছিল, সে চোখটা অস্ত্র করিয়া বাহির করিয়া ফেলিতে হইল—তবুও কিছু হইল না। ছেলেটির অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে যায়। মেমসাহেব প্রায়ই গিয়া বসিয়া থাকে, সাহেবও এক আধ দিন অন্তর যান, নারাণবাবু টুইশানি ফেরতা প্রায় রোজই যান।

একদিন বিকালে হেড্‌ মাষ্টারকে দেখিয়া ছেলেটি কাঁদিয়া ফেলিল। তখনও

তাহার বাড়ী হইতে লোকজন আসে নাই। সাহের গিয়া বসিয়া বলিলেন—ডোণ্ট ইউ ক্রাই মাই চাইল্ড—দেয়ার ইজ এ লিট্‌ল্ ডিয়ার—বি এ হিরো—এ লিট্‌ল হিরো।

মুস্কিল এই যে, সাহেব বাংলা বলিতে পারেন না ভাল, ছোট ছেলে তাঁহার ইংরাজি বুঝিতে পারে না। মুখে কথা বলিতে বলিতে হেড্‌মাষ্টার বিপন্ন মুখে ছেলেটির মাথায় ও পিঠে সান্ত্বনাসূচকভাবে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

—কান্না করে না, কান্না লজ্জার কঠা আছে—ইট্ ইজ এ শেম্ ফর এ বয় টু ক্রাই—বুঝেছে? ভাল বালক আছে—সারিয়া যাইবে। কিচ্ছু হইবে না—

এমন্ সময় ছেলের মা ও বাড়ীর মেয়েদের আসিতে দেখিয়া সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে বলিলেন—টোমার মার সামনে কান্না করে না। দেয়ার ইজ এ গুড বয়—আমার স্কুলের বালক কাঁদিবে না—আই নো ইউ উইল কিপ আপ দি প্রেষ্টিজ অফ ইওর স্কুল—আই ব্লেস্ ইউ মাই চাইল্ড—

ছেলেটি খানিকটা বুঝিল, খানিকটা বুঝিল না—কিন্তু সে কান্না বন্ধ করিল, আর কখনো কাহারো সামনে কাঁদে নাই, এমন কি, মৃত্যুর দুই দিন পূর্ব্বে তাহার সংজ্ঞা লোপ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, ভয় কি দুর্ব্বলতাসূচক একটি কথাও তাহার মুখে কেহ শোনে নাই।

মাষ্টারদের বেতন আরও কমিয়া গিয়াছে; কারণ, জানুয়ারী মাসে নতুন ছেলে ভর্ত্তি হয় নাই আশানুরূপ। এই মাসের মাহিনা লইতে গিয়া মাষ্টারেরা ব্যাপারটা জানিতে পারিলেন।

চায়ের আসরে যদুবাবু বলিলেন—আর তো চলে না হে, একে এই মাইনে ঠিকমত পাওয়া যায় না, তাতে আরও পাঁচ টাকা কমে গেল। কলকাতা শহরে চালাই কি করে?

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—তবুও তো দাদা, আপনি বৌদিদিকে পাড়াগাঁয়ে রেখেছেন আজ দু বছর। আমি আর বছর বিয়ে করে কি মুস্কিলেই পড়ে গিয়েছি, বাসায় খরচ কখনো চলতো না, যদি টুইশানি না থাকতো।

জ্যোতির্বিনোদ বলিলেন—খোকার অন্নপ্রাশন দেবে কবে ক্ষেত্রবাবু?

আর অন্নপ্রাশন! খেতে পাইনে তার অন্নপ্রাশন। বাসা-খরচ চলে না, বাসাভাড়া আজ তিন মাস বাকি!

—আমার কথা যদি শোনেন, তবে অবাক্ হয়ে যাবেন। স্কুলের ঘরে থাকি, ঘরভাড়া লাগে না, তাই রক্ষে। আজ ছ মাস বাড়ীতে পাঁচটা করে টাকা মাসে, তাও পাঠাতে পারিনে। পঁচিশ ছিল, হোল বাইশ। এখানেই বা কি খাই, বাড়ীতেই বা কি দিই?

যদুবাবু বলিলেন—আমার ভাবনা কিসের শুনবে? বৌটাকে এক জ্ঞাতি-শরিকের বাড়ী ফেলে রেখেছি দেশে। সেখানে তার কষ্টের সীমা নেই। কতবার লিখেছে, কিন্তু আনি কোথায় বলো। বত্রিশ থেকে আটাশ হোল। মেসে খাই, তাই কুলোয় না।

শরৎবাবু বলিলেন—কোথাও চলে যাই ভাবি, কিন্তু এ বাজারে যাই-ই বা কোথায়?

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—আচ্ছা শরৎ, তোমায় একটা কথা বলি। আমাদের না হয় বয়েস হয়েছে, স্কুল মাষ্টারি ধরেছি অনেক দিন থেকে, কোথায় আর এ বয়সে যাবো—কিন্তু তুমি ইয়ং ম্যান, কেন মরতে এ লাইনে পচে মরবে? স্কুল মাষ্টারি কি কেউ সখ ক'রে করে? সমস্ত জীবনটা মাটি। এখনও সময় থাকতে অন্য পথ দেখে নাও—তুমি, কি ওই গেম টিচার বিনোদবাবু, কেন, যে তোমরা এখানে আছ। পিওর লেজিনেস্—

শরৎবাবু বলিলেন—লেজিনেস্ নয় দাদা। এখানে পঁচিশ পেতাম, হোল বাইশ। অনেক চেষ্টা করেছি, হেন আপিস্ নেই, যেখানে দরখাস্ত-হাতে যাইনি—হেন লোক নেই, যাকে ধরিনি। আমরা গরীব, নিজের লোক না থাকলে হয় না। আমাদের কে ব্যাক্ করছে, বলুন না দাদা?

—কিন্তু তা তো হোল, এ স্কুলের অবস্থা দিন দিন-হয়ে দাঁড়ালো কি?

—কে জানে কেমন? সাহেবের অত কড়াকড়ি, অমন পড়ানোর মেথড্—কিছুতেই কিছু হচ্ছে না।

যদুবাবু বলিলেন—তা নয়—কি হয়েছে জানো? পাশের স্কুলগুলো

ছেলে ভাঙিয়ে নেয়, ওরা বাড়ী বাড়ী গিয়ে ছেলে যোগাড় করে। হেড্‌মাষ্টার মাষ্টারদের সঙ্গে নিয়ে বাড়ী বাড়ী যায়।

—আমাদেরও যেতে হবে।

—হেড্ মাষ্টার সে রাজি নন। ওতে মাষ্টারদের প্রেষ্টিজ থাকে না, ওসব ব্যবসাদারি করে স্কুল রাখার চেয়ে না রাখা ভালো—এই সব বিলিতি মত এখানে খাটবে না. আমি জানি, লালবাজারে একটা স্কুল থেকে ছেলে ট্রান্সফার নেবে বলে দরখাস্ত দিলে—হেড্ মাষ্টার দুজন টিচার নিয়ে তাদের বাড়ী গিয়ে পড়লো, গার্জ্জেনকে বোঝালে—কেন ট্রান্সফার নেবেন, কি অসুবিধে হচ্ছে বলুন—কত খোসামোদ। কিছুতেই ছেলেকে নিতে দিলে না।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—আমাদের স্কুলে যেমন ট্রান্সফারের দরখাস্ত পড়েছে—আর সাহেব অমনি তখনি ক্লার্ককে ডেকে বল্লে, কত বাকি আছে দেখো, দেখে ট্রান্সফার দিয়ে দাও।

—এ রকম করে কি কলকাতার স্কুল চলে? সাহেবকে বোঝালেও বুঝবে না।

—প্রেষ্টিজ যাবে! প্রেষ্টিজ ধুয়ে জল খাই এখন।

পরদিন স্কুলে মিঃ আলম টিচারদের লইয়া এক গুপ্ত-সভা করিলেন, স্কুলের ছুটির পর তেতালার ঘরে। উদ্দেশ্য, এ হেড্ মাষ্টারকে না তাড়াইলে স্কুলের উন্নতি নাই। একা দু শো টাকা মাহিনা লইবে, তাহার উপর ছেলে আসে না স্কুলে। মাষ্টারদের এই দুর্দ্দশা। হেড্‌মাষ্টার ও মেম বিতাড়ন না করিলে স্কুল টিকিবে না।

যদুবাবু বলিলেন—কি উপায়ে সরানো যায় বলুন? হিমালয় পর্ব্বত কে সরায়?

—কমিটির কাছে দরখাস্ত পেশ করি সবাই মিলে। আমাদের ভিউজ আমরা লিখি।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—কিচ্ছু হবে না মিঃ আলম। কমিটি ওতে কানও দেবে না, উল্টো বিপত্তি হবে—

মিঃ আলম বলিলেন—দেখুন, কি হয়। আমি বলছি, ওতে ফল হোতেই হবে।

এ মিটিং-এ নারাণবাবু ছিলেন না, কিন্তু রামেন্দুবাবু ছিলেন। তিনি বলিলেন—আমি এ অপোজ করছি। হেড্‌মাষ্টার বিতাড়ন করে ফল ভাল হবে কে বলেছে? সেটা উচিতও নয়।

মিঃ আলম বলিলেন—তবে কিসে ফল ভাল হবে?

—তা আমি জানি নে, তবে হেড্‌মাষ্টার কড়া বটে, কিন্তু এঁ ভেরি গুড টিচার। অমন লোককে বুড়ো বয়সে তাড়ালে ধর্ম্মে সইবে না, আর তাড়াতে পারবেনও না।

—কেন?

—কমিটির কাছে হেড্‌মাষ্টারের পোজিশন খুব সিকিওর। তারা ওঁকে মেনে চলে, শ্রদ্ধা করে।

—শত্রুও আছে, যেমন ডাক্তার গাঙ্গুলি, সাতকড়ি দত্ত, মিঃ সেন—এঁরা স্বদেশী কি না, সাহেবকে দেখতে পারেন না। আপনারা বলুন, আমি তদ্বির তদারক আরম্ভ করি, মেম্বরদের—বিশেষ করে স্বদেশী মেম্বরদের বাড়ী যাই।

রামেন্দুবাবু বলিলেন—আমি এর মধ্যে নেই। তবে আমি সাহেবকেও কিছু বলবো না। আপনাদের এর মধ্যেও থাকবো না, আপনারা যা হয় করুন—

মিঃ আলম বলিলেন—একটা কথা আছে এর মধ্যে।

—কি?

—আপনারা সবাই কিন্তু বলুন, এর পরে আমাকে হেড্‌মাষ্টার করবেন আপনারা।

মাষ্টারেরা দণ্ডমুণ্ডের মালিক নহেন, বেশ ভাল রকমই তাহা জানেন, তবুও ঘাড় নাড়িয়া কেহ সায় দিলেন, কেহ উৎসাহের সহিত বলিলেন—বেশ, বেশ।

অর্থাৎ যে ক্ষমতা তাঁহাদের নাই, অপর একজনের মুখে তাহা তাঁহাদের আছে শুনিয়া মাষ্টারের দল খুশি ও উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন।

রামেন্দুবাবুর দলের দু একজন মাষ্টার নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিলেন—তাঁহারা রামেন্দুবাবুকে হেড্‌মাষ্টার করিবেন।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—মিঃ আলম, তবে আপনাকে মাইনে কম নিতে হবে—

—কত বলুন ?

—এক শোর বেশি নয়—

—সে আপনাদের বিবেচনা—যা ভাল হয় করবেন—

যদুবাবু বলিলেন—আচ্ছা, আপনাকে যদি আর পঁচিশ বেশি দেওয়া যায়, তবে আপনি আমাদের মাইনের বিষয়টাও দেখবেন। এই স্কেল করুন না, গ্রাজুয়েট পঞ্চাশ টাকা। আণ্ডার গ্রাজুয়েট—চল্লিশ—

মাহিনার কত স্কেল হইবে, তাহা লইয়া কিছুক্ষণ মাষ্টারদের তুমুল তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল, যদুবাবুর প্রস্তাব গ্রাজুয়েটদের পক্ষে ঠিকই রহিল, তবে আণ্ডার গ্রাজুয়েটদের ত্রিশের বেশি আপাততঃ দেওয়া চলিবে না।

জ্যোতির্ব্বিনোদ বলিলেন—পণ্ডিতদের সম্বন্ধে একটা বিবেচনা করুন—

মিঃ আলম বলিলেন—আপনারা কত হোলে খুশি হন ?

যদুবাবু বিষম আপত্তি উঠাইলেন। আণ্ডার গ্রাজুয়েট আর পণ্ডিত এক স্কেলে মাহিনা পাইবে, তাহা হয় না। হেড্ পণ্ডিত পঁয়ত্রিশ, অন্য পণ্ডিত ত্রিশ ও পঁচিশ।

হেড্‌মাষ্টার হওয়ার আসন্ন সম্ভাবনায় উৎফুল্ল মিঃ আলম যদুবাবুর প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ রাজি হইয়া গেলেন। মাষ্টারেরা বলাবলি করিতে লাগিলেন, ব্যবস্থা ভালই হইয়াছে।

যদুবাবু বলিলেন—আজ দু' বছর ধরে আড়াই মাস খেটে এক মাসের পাচ্ছি—আজ এক টাকা, কাল দু টাকা, এ আর সহ্য হয় না—তার ওপর মাইনে গেল কমে। ইন্‌ক্রিমেণ্ট্ তো হোলই না আধ পয়সা আজ চৌদ্দ বছরের মধ্যে—

হেড্‌পণ্ডিত বলিলেন—আমার উনিশ বছরের মধ্যে—

জ্যোতির্ব্বিনোদ বলিলেন—আমার সতেরো বছরের মধ্যে—

বোঝা গেল, সকলেই বর্ত্তমান ব্যবস্থার উপর অসন্তুষ্ট। নতুন কিছু হইলেই

খুশি। সকলেরই উন্নতি হইবে, বাজার খরচ সচ্ছলভাবে করিতে পারিবেন, বাসায় ফিরিয়া পরোটা জলখাবার খাইতে পারিবেন, দু একটা জামা বেশি করাইতে পারিবেন, বাড়ীতে অনেকেরই বাসনপত্র কম, কিছু থালা বাটি কিনিবেন, কন্যার বিবাহের দেনা কেহ বা কিছু শোধ করিতে পারিবেন।

কাল হইতে স্কুলে ছেলেদের জন্য টিফিনের বন্দোবস্ত হইবে। 'ডি. পি. আই'-এর সার্কুলার অনুযায়ী ছেলেদের নিকট হইতে কিছু কিছু খরচা লইয়া স্কুল ছেলেদের টিফিনের সময় জলখাবারের আয়োজন করিবে। সাহেব ঠিক করিয়াছেন, লাল আটার রুটি আর ডাল, ঠাকুর রাখিয়া তৈরি করানো হইবে, প্রত্যেক ছেলেকে দুটি পয়সা দিতে হইবে খাবার বাবদ—দুখানা রুটি ও ডাল মাথা পিছু।

মিঃ আলম বলিলেন—শুনুন, মিটিং ভাঙবার আগে আর একটা কথা আছে। কাল থেকে টিফিন দেওয়া হবে ছেলেদের, ওর হিসেবপত্র আর ছেলেদের দেওয়া-থোওয়ার তদারক করতে হবে একজন টিচারকে, আপনাদের মধ্যে কে রাজি আছেন? সাহেব আমাকে লোক ঠিক করতে বলেছেন।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—কে আবার ওই হাঙ্গামা ঘাড়ে নেবে, থাকি টিফিনের সময় একটু শুয়ে—

হেড্পণ্ডিত বলিলেন—আমাদের শরৎ ভায়া বরং করো—ইয়ং ম্যান্, তুমি কি বিনোদ—

হিসাবপত্র করিতে হইবে এবং তিন শো ছেলেকে ডাল রুটি দেওয়ার ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হইবে বলিয়া কেহই রাজি হয় না। মিঃ আলম বলিলেন—তাই তো, একটা যা হয় ঠিক করে ফেলতে হবে—

যদুবাবু চুপ করিয়া ছিলেন। বলিলেন—তা তবে—যখন কেউ রাজি হয় না, তখন আর কি হবে, আমাকেই করতে হবে। সাহেবের অর্ডার—না মেনে তো উপায় নেই!

—আপনি নেবেন তা হোলে?

—তাই ঠিক রইল মিঃ আলম। কি আর করি, একটু কষ্ট হবে বটে, কিন্তু চাকুরী যখন করছি—

কর্ত্তব্য কার্য্যে এতখানি অনুরাগ যদুবাবুর বড় একটা দেখা যায় নাই, সুতরাং অনেকে বিস্মিত হইলেন।

মিঃ আলম বলিলেন—আপনারা নির্ভয়ে নেমে যান। সাহেব টুইশানিতে বার হয়েছে, মেমসাহেবও নেই। কেউ টের পাবে না।

সকলে ভয়ে ভয়ে নীচে নামিয়া গেল।

চায়ের মজ্‌লিসে রামেন্দুবাবু বলিলেন—আমাকে আপনারা এর মধ্যে কিন্তু টানবেন না।

সকলে বলিলেন—কেন, কেন, কি বলুন—

—মিঃ আলম হেড্‌মাষ্টার হোন, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই—কিন্তু সাহেবের বিরুদ্ধে এ ধরণের ষড়যন্ত্র আমি পছন্দ করিনে। এ ঠিক নয়—

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—তা ছাড়, আপনি কি ভেবেছেন, এ কখনো হবে? এ হোল 'কালনেমির লঙ্কাভাগ'।

বাহিরে আসিয়া সকলেরই মন হাওয়া-বার-হওয়া বেলুনের মত চুপসিয়া গিয়াছিল। এতক্ষণ বড় বড় কথা, প্রস্তাব গ্রহণ-প্রত্যাখ্যান প্রভৃতি ব্যাপারের মধ্যে থাকিয়া নিজেদের পার্লামেণ্টের মেম্বরের মত পদস্থ বলিয়া মনে হইতেছিল। সাহেব তাড়ানো, সাহেব বাঁচানো প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ কর্ম্মে ডিক্রি-ডিসমিসের মালিক বুঝি তাঁহারাই—বর্ত্তমানে ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীটের কঠিন পাষাণময় ফুটপাথে পা দিয়াই ঘোর তাঁহাদের কাটিতে সুরু করিয়াছে।

যদুবাবু, যিনি অতগুলি প্রস্তাব আনয়নকারী উৎসাহী মেম্বর, তিনিও টানিয়া টানিয়া বলিলেন,—হয় বলে তো বিশ্বাস হচ্ছে না, তবে ভাখো—সাহেবকে তাড়াবে কে?

শরৎবাবু বলিলেন, আপনি কখন্ কোন্‌দিকে থাকেন যদুদা, আপনাকে বোঝা ভার। এই মিঃ আলমকে গালাগাল না দিয়ে জল খান না, আবার দিব্যি ওকে হেড্‌মাষ্টার করার প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন—কেন, আমরা সকলে ঠিক করেছি রামেন্দুবাবুকে ছাড়া আর কাউকে হেড্‌মাষ্টার করা হবে না।

জ্যোতির্ব্বিনোদ বলিলেন—আমিও তাই বলি—

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—আমারও তাই মত—

যদুবাবু রাগিয়া বলিলেন—বেশ তোমরা! আমিও বলি, রামেন্দুবাবুই উপযুক্ত লোক! আমি ওখানে না বলে করি কি? আলম যখন ওরকম করে বল্লে, না বলি কি করে?

রামেন্দুবাবু বলিলেন—আপনাদের কারো লজ্জা বা কিছুর কারণ নেই। ক্ষেত্রবাবু ঠিক বলেছেন, এ সব কালনেমির লঙ্কাভাগ হচ্ছে। ক্লার্কওয়েল সাহেব যথেষ্ট উপযুক্ত লোক, যদি তিনি চলে যান, তা হোলে যে-কেউ হোতে পারেন, আমার কোনো লোভ নেই ওতে।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—তা নিয়ে এখন আর তর্কাতর্কি করে কি হবে। তবে আমার এই মত, সাহেবের যায়গায় যদি কেউ হেড্‌মাষ্টার হওয়ার উপযুক্ত থাকেন ষ্টাফের ভেতর, তবে রামেন্দুবাবু আছেন।

যদুবাবু বলিলেন—আমি কি বলেছি নয়?

—বলছিলেন তো দাদা, আমি সোজা কথা বলবো।

—না, এ তোমার অন্যায় ক্ষেত্র ভায়া। তুমি আমার কথা না বুঝে আগেই—

রামেন্দুবাবু হাসিয়া উভয়ের বিবাদ থামাইয়া দিলেন।

সে দিনকার চায়ের মজলিস শেষ হইল।

দিন তিনেক পরে জ্যোতির্ব্বিনোদ ছুটির ঘণ্টা পড়িতেই বাহিরে যাইতেছেন, যদুবাবু ফোর্থ ক্লাস হইতে ডাক দিয়া বলিলেন—কোথায় যাচ্ছ, ও জ্যোতির্ব্বিনোদ ভায়া?

—একটু কাজ আছে। কেন দাদা?

—না তাই বলছি, এখনি ফিরবে?

—ফিরতে দেরি হবে। শ্যামবাজারে যাবো একবার—

—ও!

কিন্তু কি কারণে ওয়েলেস্‌লির মোড় পর্য্যন্ত গিয়া জ্যোতির্ব্বিনোদের শ্যামবাজার যাওয়ার প্রয়োজন হইল না। সুতরাং তিনি ফিরিয়া তেতালায় নিজের ঘরে ঢুকিলেন—টিচার্স রুমের পাশেই ছোট ঘর, যাইবার সময় দেখিলেন,

যতুবাবু টিচার্স রুমে কি করিতেছেন। কৌতূহলী হইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—কি, একা এখানে বসে এখনও দাদা?

যতুবাবু চমকিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি কি যেন একটা ঢাকিতে চেষ্টা করিলেন, এবং পরে কথা বলিবার প্রাণপণ চেষ্টায় চোখ ঠিক্‌রাইয়া অস্পষ্টভাবে গোঙ্‌রাইয়া কি যেন বলিতে গেলেন।

জ্যোতির্ব্বিনোদ দেখিলেন, যতুবাবুর সামনে টেবিলের উপর শালপাতায় খান পাঁচ-ছয় লাল আটার রুটি ও কিছু ডাল—যতুবাবুর মুখ রুটি ও ডালে ভর্ত্তি, আশ্চর্য্য নয় যে, এ অবস্থায় তাঁহার মুখ দিয়া স্পষ্ট কথা উচ্চারিত হইতেছে না।

যতুবাবু ভীষণ আয়াসে ডালরুটির দলাকে জব্দ করিয়া কোনো রকমে গিলিয়া ফেলিলেন এবং স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া অপ্রতিভ মুখে বলিলেন—এই টিফিনের পরে এক আধখানা বাড়তি রুটি ছিল, তাই বলি ফেলে দিয়ে কি হবে—ঠাকুরকে বল্লাম দাও ঠাকুর—

—বেশ বেশ, খান না।

—তা ইয়ে—তুমি যদি খাও, কাল থেকে যদি বাড়তি থাকে, তোমার জন্তেও না হয়—

জ্যোতির্ব্বিনোদ কি ভাবিয়া বলিলেন—কেউ আবার লাগাবে মিঃ আলমের কানে—

যতুবাবু ষড়্‌যন্ত্র করিবার সুরে ও ভঙ্গিতে নীচু গলায় চোখ টিপিয়া বলিলেন —কেউ টের পাবে? তুমিও যেমন! যেখানে আধ মণ ময়দা মাখা হয় ডেলি, সেখানে ছ'খানা কি আটখানা রুটির হিসেব কে রাখছে? আর আমার হাতেই তো হিসেব। তুমি নাও—

জ্যোতির্ব্বিনোদও নির্ব্বোধ নন, তিনি বুঝিলেন, যতুবাবুর এ রুটি খাইতে হইলে ছুটির পরে নির্জ্জন টিচার্স রুম ভিন্ন আর স্থান নাই। সে রুমের পরেই জ্যোতির্ব্বিনোদের থাকিবার ক্ষুদ্র কুঠুরি—তাঁহাকে অংশীদার না করিলে যতুবাবু উহা একা আত্মসাৎ কি করিয়া করিবেন? সেই জন্তই যতুবাবু অত আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, জ্যোতির্ব্বিনোদ কোথায় যাইতেছে অর্থাৎ এখনই ফিরিবে কিনা।

ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন—তা যদি বাড়তি থাকে—তবে না হয়—

যদুবাবু উৎসাহের সঙ্গে বলিলেন—বাড়তি আছে—বাড়তি আছে—হয়ে যাবে। খান আষ্টেক করে রুটি তোমার জন্যে, তা সে এক রকম হবে এখন। জলখাবারটা বিকেল বেলার—বুঝলে না? পেটে খিদে মুখে লাজ—না ভায়া, ও কোনো কথা নয়।

তিন চার দিন বেশ খাওয়া দাওয়া চলিল দুজনের।

জ্যোতির্ব্বিনোদ দেখিলেন, যদুবাবু ক্রমশঃ রুটির সংখ্যা ও ডালের পরিমাণ বাড়াইতেছেন। একদিন শালপাতা খুলিলে দেখা গেল, বাইশখানা রুটি ও প্রায় সেরখানেক ডাল তাহার ভিতর।

জ্যোতির্ব্বিনোদ ভয় পাইয়া বলিলেন—এ নিয়ে কথা হবে দাদা। এত কেন?

—আরে নাও না খেয়ে। রাত্রের খাওয়াটাও এই সঙ্গে না-হয়—সে পয়সাটা তো বেঁচে গেল—এ পেনি সেভ্ড্ ইজ্ এ পেনি গট্ অর্থাৎ—

—কিন্তু দাদা, আমার শরীর খারাপ, আমি এত খেতে পারবো না যে।

—বেশ, বেশ, যা পারো খাও—না হয় যা থাকবে আমিই খাবো—ফেলা যাচ্ছে না।

এদিকে মিঃ আলমের ষড়যন্ত্র বেশ পাকিয়া উঠিল। মিঃ আলম কয়েকজন মেম্বরের বাড়ী গিয়া তাঁহাদের বুঝাইলেন, সাহেবকে না তাড়াইলে স্কুলের উন্নতি সম্ভব নয়। মিটিং-এর দিন পর্য্যন্ত ধার্য্য হইয়া গেল। স্থির হইল, ডাক্তার গাঙ্গুলী সে দিন সাহেবকে সরাইবার প্রস্তাব কমিটিতে উঠাইবেন—কমিটির অন্যতম স্বদেশী মেম্বর সাতকড়ি দত্ত, জনৈক লোহাপটির দালাল—সে প্রস্তাব সমর্থন করিবে।

রামেন্দুবাবু গোপনে ক্ষেত্রবাবুকে বলিলেন—মিঃ আলম এদিকে বেশ হেসে কথা বলে হেড্মাষ্টারের সঙ্গে—আর এদিকে এ রকম ষড়যন্ত্র করে—এ অত্যন্ত খারাপ। আমার মনে হয়, হেড্মাষ্টারকে ওয়ার্নিং দিয়ে দিলে ভাল হয়—

—কে দেবে?

—আমি দিতে পারতাম—কিন্তু আমার উচিত হবে না। আমি মিঃ আলমের মিটিং-এ প্রথম দিন ছিলাম—

—তাই কি? আর তো ছিলেন না। আপনিই গিয়ে বলুন।

—সেটা ভদ্রলোকের কাজ হয় না। আর কাউকে গিয়ে বলাতে পারেন তো বলান—

—আর কে যাবে? এক আপনি, নয় তো নারাণবাবু—

—বুড়ো মানুষকে আর এর মধ্যে জড়িয়ে লাভ নেই। হি ইজ্ টু গুড্ এ ম্যান ফর অল দিস্—নিরীহ বেচারী ওঁকে আর এ বয়সে কেন এর মধ্যে?

—আমি বলবো?

—আপনার উচিত হবে না। দু মুখো সাপের কাজ হবে।

—তবে লেট্ ফেট্ টেক্ ইট্স্ কোর্স—

—তাই হোক্।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ক্ষেত্রবাবু ও জ্যোতির্ব্বিনোদ রাত দশটার পরে হেড্ মাষ্টারের দোরে ঘা দিলেন।

সাহেব খয়রাগড়ের রাজকুমারকে পড়াইয়া সবে ফিরিয়াছেন। বলিলেন, —কে, নারাণবাবু?

ক্ষেত্রবাবু কাসিয়া বলিলেন—না স্যার, আমি—ক্ষেত্রবাবু।

—ও! ক্ষেত্রবাবু! এসো এসো। এত রাত্রে?

ক্ষেত্রবাবু ঘরে ঢুকিয়া সামনের চেয়ারে মেমসাহেবকে দেখিয়া বলিলেন—গুড্ ইভ্নিং মিস্ সিবসন্—

বুদ্ধিমতী মেমসাহেব প্রীতিসম্ভাষণ বিনিময়ান্তে অন্য ঘরে চলিয়া গেল। ক্ষেত্রবাবু সাহেবকে সব খুলিয়া বলিলেন।

সাহেব তাচ্ছিল্যের সুরে বলিলেন—এই! তা আমি রিজাইন দিতে প্রস্তুত আছি—তাতে যদি স্কুল ভাল হয়—হোক্।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—না স্যার, তা হোলে স্কুল একদিনও টিকবে না—

—না, যদি মেম্বরেরা আমার কাজে সন্তুষ্ট না হন, তবে আমার থাকার দরকার নেই।

—স্যার, আপনি যদি বলেন, তবে আমরাও অন্য অন্য মেম্বরের বাড়ী গিয়ে উল্টো তদ্বির করি, আপনাকে পছন্দ করে, এমন মেম্বর সংখ্যায় কম নয় কমিটিতে।

সাহেব নিতান্ত উদাসীন ভাবে বলিলেন—আমি এই স্কুল গড়ে তুলেছি, যখন এ স্কুলের ভার আমি নিই, তখন স্কুলে দেড় শো ছেলে ছিল। আমি হাতে নিয়ে চার শো দাঁড়ায় ছাত্রসংখ্যা। তারপর আবার কমে গেল। নতুন প্রণালীতে স্কুল চালাবো ভেবেছিলাম অক্সফোর্ড থেকে শিখে এসেছিলাম, আমার সব নোট্ করা আছে। এক গাদা নোট্—দেখতে চাও, দেখাবো একদিন। কিন্তু যদি কমিটি আমাকে না চায়, রিজাইন দিয়ে চলে যাবো। এই অঞ্চলে সবাই আমার ছাত্র—চোদ্দ বছর ধরে এই স্কুলে কত ছাত্র আমার হাত দিয়ে বেরিয়েছে। বুড়ো বয়সে খেতে না পাই, এর বাড়ী একদিন ব্রেকফাষ্ট খেলাম, আর-এক ছাত্রের বাড়ী একদিন ডিনার খাওয়ালে—এই রকম করে চলে যাবে—নারাণবাবু কোথায়?

—বোধ হয় এখন টুইশানিতে।

—ওই একজন সাধুপ্রকৃতির মানুষ। এ সব কথা নারাণবাবু জানে?

—আমাদের মনে হয় শোনেন নি। ওঁর কানে এ কথা কেউ ইচ্ছে করেই ওঠায় না।

—দেখে এসো তো। যদি এসে থাকে—ডেকে নিয়ে এসো।

নারাণবাবু কিছুক্ষণ পরে জ্যোতির্বিনোদের সঙ্গে ঘরে ঢুকিলেন।

সাহেব বলিলেন—শুনেছেন নারাণবাবু, আমাকে কমিটি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার পরামর্শ হচ্ছে।

নারাণবাবু বিস্মিত মুখে অবিশ্বাসের সুরে বলিলেন—কে বল্লে স্যার?

—জিগ্যেস্ করুন এঁদের। আমার বিশ্বস্ত লেফ্‌টেনান্ট্ মিঃ আলম এই চক্রান্ত করছে। এত্ তু ব্রুতি!

নারাণবাবু হাসিয়া বলিলেন—জগতে ব্রুটাসের সংখ্যা কম নেই স্যার। কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি যে, এতদিন আমি কিছুই শুনিনি এ কথা!

—কোথা থেকে শুনবেন? আপনি থাকেন আপনার কাজ নিয়ে।

—স্যার, আপনি নির্ভয়ে থাকুন। আপনার কিছু হবে না—

—ভয় কিসের? আমি রিজাইন্ দিতে রাজি আছি এই মুহূর্ত্তে—

—আমার মত শুনুন। কাউন্টার প্রোপ্যাগাণ্ডা একটা করতে হয়—

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—আমি তা বলেছি। আসুন আপনি, আমি, শরৎবাবু, গেম্ টিচার এঁরা সব মেম্বরদের বাড়ী বাড়ী যাই।

—আমার আপত্তি নেই।

হেড্ মাষ্টার বলিলেন—না, নারাণবাবুকে আমি কোথাও নিয়ে যেতে বলিনে। লিভ্ হিম্ এলোন—আমি আপনাদের যেতে বলিনে। আমি ও সব জিনিসকে বড় ঘৃণা করি। এটা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, রাজনীতির আসর নয়, এর মধ্যে দল-পাকানো, ষড়্যন্ত্র—এসবের স্থান নেই। না হয় চলেই যাবো—

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—স্যার, আমাদের অনুমতি দিন। আমরা দেখি—

নারাণবাবু বৃদ্ধ বটে, কিন্তু বেশ তেজী লোক, তাহা বোঝা গেল। তিনি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিলেন—একটা কথা বলে যাচ্ছি স্যার, আপনাকে কেউ তাড়াতে পারবে না এ স্কুল থেকে। কিন্তু একটা ভবিষ্যদ্বাণী করি, মিঃ আলম এ স্কুলে আর বেশি দিন নয়।

সাহেব বলিলেন—ভাল কথা, রামেন্দুবাবুর কি মত?

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—তিনি নিরপেক্ষ। তিনি কোনো দলেই যেতে রাজি নন।

—হি ইজ্ এ বর্ণ জেণ্টল্ম্যান—দুজন লোক দেখলাম এ স্কুলে, একজন সামনেই বসে, আর একজন ঐ রামেন্দুবাবু।

পরে হাসিয়া ক্ষেত্রবাবুদের দিকে চাহিয়া বলিলেন—মাই অ্যাপোলজি টু ইউ, আপনাদের ওপর কোনো মন্তব্য করিনি এতদ্দ্বারা।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—স্যার, আমাকে তিনটে টাকা দিন—আমি একবার এই রাত্রেই দু-একজন মেম্বরের বাড়ী যাই—ডাঃ সেনের বাড়ী যাওয়া বিশেষ দরকার। সেক্রেটারি বিপিনবাবু আমাদের দিকে আছেন। মিটিং-এর দেরি নেই—একটু চট্পট্ চেষ্টা করা দরকার—

সাহেব টাকা বাহির করিয়া দিলেন।

ক্ষেত্রবাবু বাহিরে আসিয়া নারাণবাবুকে ইঙ্গিতে তাঁহার সঙ্গে আসিতে বলিলেন—

হেড্‌মাষ্টার তখুনি দোরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া তিরস্কারের সুরে বলিলেন—ক্ষেত্রবাবু, আশা করি আপনি আমার আদেশ শুনবেন, আমি এখনও এ স্কুলের হেড্‌মাষ্টার মনে রাখবেন। নারাণবাবুকে কোথাও নিয়ে যাবেন না—আমার ইচ্ছা নয়, এই সরল-প্রাণ বৃদ্ধকে আপনারা এ সব কাজে জড়ান—আপনি একা চলে যান—

মিটিং-এর আগে ক্ষেত্রবাবুর দল মেম্বরদের বাড়ী বাড়ী গেলেন। যেখানেই যান, সেখানেই শোনা যায়, অপর পক্ষ কিছুক্ষণ আগে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

স্বদেশীভাবের লোক গাঙ্গুলীর কাছে ক্ষেত্রবাবুর দল অপমানিত হইলেন।

ডাঃ গাঙ্গুলী বলিলেন—মশাই, আপনারা কি রকম লোক জিগ্যেস্ করি? পান তো পঁচিশ ত্রিশ মাইনে। সাহেবের খোশামুদি করতে ইচ্ছে হয় এতে? একেবারে অপদার্থ সব! কি শিক্ষা দেবেন আপনারা ছেলেদের? নিজেদের এতটুকু আত্মসম্মান জ্ঞান নেই? সাহেবের হয়ে তদ্বির করতে এসেছেন, লজ্জা করে না? সাহেবকে এ মিটিংএ তাড়াবোই—তারপর আপনাদের মত অপদার্থ দু একজন টিচারকেও সরাতে হবে—তবে যদি এবার স্কুলটা ভাল হয় ইত্যাদি।

মিটিং-এর দিন ক্ষেত্রবাবু দল লইয়া আর একবার দুএকজন বিশিষ্ট মেম্বরের বাড়ী গেলেন। মেম্বরদের বিশ্বাস নাই, হয় তো ভুলিয়া বসিয়া আছে, ঘন ঘন মনে না করিয়া দিলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। সকলেই বলিল, তাহাদের মনে করাইয়া দিতে হইবে না।

ছ'টার সময় মিটিং। বেলা চারটার সময় হইতে উভয় দল আসিয়া স্কুলে বসিয়া রহিল। অথচ কেহ কাহারো প্রতি অসম্মান দেখাইল না। মিঃ আলম হেড্‌মাষ্টারের ঘরে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—খাতাপত্র কি কি দরকার আছে, মিটিংএ নিয়ে যাবার জন্যে—বলুন।

—বোসো মিঃ আলম, চা খাবে এক পেয়ালা?

—থ্যাঙ্ক্স্—এখন আর থাক্।

মিটিং বসিল। সাহেবের অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব। মিঃ আলমের দলের অত তদ্বির, অত অনুরোধ, অত ধরাধরি, সব বুঝি ভাসিয়া যায়। সাহেবকে সরাইবার সম্বন্ধে কোনো প্রস্তাব কেহ আনে না—কার্য্য-তালিকার মধ্যে এ প্রস্তাব নাই—সুতরাং 'বিবিধ' কতক্ষণে আসে, সেই অপেক্ষায় উভয়দল দুরুদুরু বক্ষে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ডাক্তার গাঙ্গুলী, যিনি অত লম্ফঝম্প করিয়াছিলেন সাহেব তাড়ানোর জন্য, তিনি মিটিংএর গতিক বুঝিয়া সরু মিহি সুরে প্রস্তাব আনিলেন যে সাহেবকে অত বেতন দিয়া এই গরীব স্কুলে রাখা পোষাইতেছে না, বিশেষতঃ নতুন ছাত্র যখন আশানুরূপ ভর্ত্তি হইতেছে না। অতএব সাহেবের বেতন কমানো হউক।

সে প্রস্তাব সমর্থন করিলেন অন্যতম স্বদেশী মেম্বর নৃপেন সেন। সভাপতি প্রস্তাব ভোটে ফেলিতে দেখা গেল, ডাঃ গাঙ্গুলী আর নৃপেন বাবু ছাড়া প্রস্তাবের পক্ষে আর কারও মত নাই—এমন কি, শিক্ষকদের প্রতিনিধি মিঃ আলম পর্য্যন্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিলেন।

ডাঃ গাঙ্গুলী মিঃ আলমকে ডাকিয়া আড়ালে বলিলেন—এটা কি রকম হোল মশাই? আপনি আমাদের নাচালেন, শেষে কিনা আপনি নিজে—

মিঃ আলম বিনীতভাবে যাহা বলিলেন, তাহা সত্যই অসঙ্গত নয়। তিনি এখনও ক্লার্কওয়েল সাহেবের অধীনে চাকুরী করেন, প্রকাশ্যে তিনি কোনো মতেই তাঁহার বিরুদ্ধে যাইতে পারেন না—বরং শিক্ষকদের প্রতিনিধি হিসাবে শিক্ষকের স্বার্থ বজায় রাখিয়া তিনি কর্ত্তব্য পালনই করিয়াছেন।

নৃপেন সেন বলিলেন—জানি, জানি—আপনাদের এই রকমই মর‍্যাল কারেজ। ঘেন্না হয়, বাঙালী জাতটা এই রকমেই উচ্ছন্নয় গেল। আপনারা কি শেখাবেন ছেলেদের? ছ্যাঃ ছ্যাঃ—

মিটিং অন্তে যে যাহার ঘরে চলিয়া গেল। ক্ষেত্রবাবুর দলকে সাহেব ডাকাইয়া বলিলেন—কই, যত শুনলাম তোমাদের মুখে—তার কিছুই তো নয়?

ক্ষেত্রবাবুও একটু আশ্চর্য্য হইয়াছেন। বলিলেন—তাই তো। কিছু বুঝতেও পারলাম না স্যার।

—যত শুনেছিলে তোমরা, আমার মনে হয় অতখানি সত্যি নয়। মিঃ আলম অত খারাপ মানুষ নয়।

—স্যার, আমাকে মাপ করবেন, আপনি অবিশ্যি মিঃ আলমকে সন্দেহ করেন না, সে খুব ভাল কথা। তবে আমার স্বচক্ষে দেখা এবং স্বকর্ণে শোনা স্যার—

—যাক্, সব ভাল যার শেষ ভাল। নারাণবাবুর কথাই খাটলো। বলেছিল, অপর পক্ষের চেষ্টা ব্যর্থ হবে।

কমিটির মেম্বরদের মধ্যে অনেকেই এই মিটিংএর পরে মিঃ আলমের উপর চটিয়া গেলেন। ফলে এক মাসের মধ্যে মিঃ আলমের মাহিনা আরও কাটিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হইল—কমিটিতে এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার কোনো-বাধা ছিল না—কিন্তু সাহেব এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যথেষ্ট আপত্তি করিলেন।

সে দিন সন্ধ্যায় মিটিংএর পরে ক্ষেত্রবাবু হেড্ মাষ্টারের ঘরে ঢুকিলেন।

সাহেব বলিলেন—বসুন, ক্ষেত্রবাবু। কি খবর?

—আজ স্যার আপনি মিঃ আলমের পক্ষে অতটা না দাঁড়ালেও পারতেন—

—কেন বলো তো?

—আপনার খুব বন্ধু নয় ও।

সাহেব হাসিয়া বলিলেন—ও! তা বলে আমি কি তার প্রতিশোধ নেবো ওভাবে? ওসব কাজ আমাদের দ্বারা হবে না। আমরা শিক্ষক—আমি চাই না ক্ষেত্রবাবু, যে স্কুলের মধ্যে এ ধরণের দলাদলি হয়। আমি চেয়েছিলাম স্কুলটাকে ভাল করতে। অক্সফোর্ড থেকে অনেক কিছু শিখে এসেছিলাম, নতুন প্রণালীতে শিক্ষা দেবো ছেলেদের। এখানে এসে সব মিথ্যে হতে চলেছে দেখছি। এখানকার হাওয়াতে দলাদলি ভাসে।

এই সব ঘটনার পর কিছুদিন দলাদলি ও ষড়্যন্ত্র ক্ষান্ত রহিল—আবার

মাস দুই পরে মিঃ আলম নতুন ভাবে ষড়্যন্ত্র সুরু করিল। এবার মেম-সাহেবের বিরুদ্ধে। স্কুলে অত টাকা খরচ করিয়া মেম রাখিবার কোনো কারণ নাই। বিশেষতঃ ছেলেদের স্কুলে মেয়েমানুষ শিক্ষয়িত্রী কেন? এবার মিঃ আলমের ষড়্যন্ত্র সফল হইল। স্বদেশী মেম্বরের দল টেবিল চাপড়াইয়া লম্বা বক্তৃতা করিল! ফলে মিস্ সিবসনের চাক্‌রী গেল। ছেলেরা মিলিয়া চাঁদা তুলিয়া মেমসাহেবের বিদায়-অভিনন্দনজ্ঞাপক সভা করিল। মিস্ সিবসন্ ছোট ছোট ছেলেদের সত্যই ভালবাসিত—বিদায়-সভায় বেচারী প্রতিভাষণ দিতে উঠিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

মেমসাহেব চলিয়া যাওয়াতে সাহেবের কষ্ট হইল খুব বেশি। সকলে বলে, বিলাত হইতে আসিবার সময় সাহেব মিস্ সিবসনকে সঙ্গে করিয়া আনেন, গরীবের ঘরের মেয়ে, ইণ্ডিয়ায় একটা চাক্‌রী জুটিয়া যাইবে, ইহাই ছিল উদ্দেশ্য।

এই স্কুলের ভার সাহেব যতদিন হইতে লইয়াছেন, মেমসাহেবেরও চাক্‌রী এখানে অতদিন।

চায়ের মজলিসে সে দিন মাষ্টারের সংখ্যা কিছু বেশি ছিল।

জ্যোতির্ব্বিনোদ বলিলেন—আজ আলমের মনস্কামনা পূর্ণ হোল—

ক্ষেত্রবাবু যতখানি সাহেবের পক্ষ হইয়া তদ্বির করিয়াছিলেন, মিস্ সিবসনের পক্ষ হইয়া তাহার অর্দ্ধেকও করেন নাই। মেমসাহেব যাওয়াতে তিনি ততটা দুঃখিত হন নাই, ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইবার কথা। তিনি বলিলেন—তা বটে—তবে আমার মত যদি জিগ্যেস্ কর—এ চালটা ওদের খুব গভীর—

শরৎবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—কি রকম?

—এতে সাহেবকেও তাড়ানো হোল—

সকলে একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন? কেন?

—সাহেব একা এখানে থাকতে পারবে না।

—তা ছাড়া মেম বেচারীই বা যায় কোথায় ? ও তো খুব গরীব ছিল শুনেছি—

—শুনছি মেম দার্জ্জিলিং গিয়ে থাকবে।

—খরচ ?

—দার্জ্জিলিং ল্যাকোয়েজ স্কুলে টিচার হবে। মিশনারি সোসাইটিকে সাহেব লিখেছিলেন ওর জন্যে, তারা সব ঠিক করে দিয়েছে।

মেমসাহেব যে খুব ভাল টিচার ও ভাল লোক—এ বিষয়ে সকলেই দেখা গেল একমত। স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মিস্ সিবসনকে খুব ভালবাসে, তাহারা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া নিজেদের ক্লাসের একটা গ্রুপ ফটো মেমসাহেবকে উপহার দিয়াছে।

একজন কে বলিল—ও ভালই হয়েছে, আমাদের মাইনে পঁচিশ ত্রিশ—আর মেমসাহেবের মাইনে আশী। অথচ তিনি ইনফ্যাণ্ট ক্লাসে পড়াবেন। কেন, আমরা কি বানের জলে ভেসে এসেছি ! তোমাদের স্লেভ্ মেণ্টালিটি কতদুর হয়েছে, তা বুঝতে পারছো না। এ কাজটা মিঃ আলম ঠিকই করেছে।

ক্ষেত্রবাবু বোধ হয় এইটুকু অপেক্ষা করিতেছিলেন। বলিলেন—আমারও তাই মত। এবার মিঃ আলমের এতটুকু অন্যায় হয় নি। তাই বুঝে এবার তদ্বিরও করিনি। এটা আলমের ন্যায্য কাজ।

চায়ের দোকান হইতে ক্ষেত্রবাবু বাসায় ফিরিলেন। অনিলা স্বামীকে চা করিয়া দিয়া বলিল—কি খাবার যে দেবো ! মুড়ি রোজ রোজ খেতে পারো কি ? ভেবেছিলাম একটু হালুয়া—

—হ্যাঁ, হালুয়া ! ঘি-খানি সব খরচ করে না ফেললে তোমার—

—তুমি তো আধ সের করে মাসে দেবে বলেছ, তার মধ্যেই আমি—

—গত মাসের মাইনের মধ্যে দশটি টাকা আজ পাওয়া গেল—এতে তুমি কত ঘি খাবে, আর কি করবে ?

অনিলা দুঃখ ও রাগের সুরে বলিল—আমি কি তোমার ঘি খাই ! ছেলে-

মেয়েরা মুড়ি চিবুতে পারে না রোজ, তাই কোনো দিন ওদের জন্যে একটু হালুয়া, কি দুখানা পরোটা—

ক্ষেত্রবাবু ঝাঁঝের সঙ্গে বলিলেন—না, কেন মুড়ি খেতে পারবে না? বিদ্যাসাগর মশায় যে না খেয়ে পরের বাসায় থেকে লেখাপড়া শিখেছিলেন, তবে ওসব হয়। যখন যেমন অবস্থা, তখন তেমনি থাকবে।

—আধ সের ঘি তুমি বরাদ্দ করেছ কিনা মাসে, আমি তাই শুনতে চাই।

—করেছিলাম। এমাস থেকে হয় তো খরচ কমাতে হবে। পাচ্ছি কোথায়? ঘির আইটেম্ই তুলে দিতে হবে।

অনিলা সামনে গালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল—হ্যাঁগা, সেই সাড়ে ন'টায় খেয়ে বেরোও আর পাঁচটা সাড়ে পাঁচটায় ফেরো। যদি কিছু না হয় ওতে, তবে ও ছাইপাঁশ চাক্‌রী কেন ছেড়ে দাও না।

—ছেড়ে তো দেবো—তার পর?

—ছেলে পড়াও যেমনি পড়াচ্ছো—তাতে হয় না? আর নয় তো চলো বাবার কাছে। ওদিকে অনেক কিছু জুটে যাবে। ডিহিরি-অন্-শোনে আমার সেই শৈলেন কাকা থাকেন, দেখেছো তো তাঁকে? এক মাড়োয়ারীর ফার্ম্মে কাজ করেন। ধরে পেড়ে বল্লে—সেখানে চাক্‌রী হতে পারে। যদি বলো তো বাবাকে লিখি।

—তা না হয় হোল। কলকাতা ছেড়ে যেতে কোথাও মন সরে না। এতদিন এখানে আছি—আর কি জানো, স্কুলের ওপরও বড় মায়া। আমার বলে নয়, সব মাষ্টারেরই। সুখে দুঃখে আজ বারো ষোলো বিশ বছর এক জায়গায় আছি। ওই কেমন একটা নেশা, স্কুলবাড়ীটা, ছেলেগুলো, ওই চায়ের দোকানের মজলিসটা—হেড্‌মাষ্টার—বেশ লাগে। যত কষ্টই পাই—তবুও যেতে পারি নে কোথাও যে, তাই এক এক সময় ভাবি—

—ভাবাভাবির কোনো দরকার নেই, চলো বেরুই। কলকাতার খরচ বেশি, অথচ খাওয়া হচ্ছে কি, একটু দুধ তোমার পেটে পড়ে না, একটু ঘি না—আমাদের গয়ার এগারো সের করে খাঁটি দুধ—

—বুঝি সবই। কিন্তু কোথাও গিয়ে থাকতে পারি নে যে—তোমাদের

গয়া কেন, আমার নিজের পৈতৃক গ্রামে চোদ্দ সের করে দুধ টাকায়। পাঁচ সিকে উৎকৃষ্ট গাওয়া ঘিয়ের সের—কিন্তু সে বার তোমার দিদিকে থাকতে নিয়ে গেলুম—মন টেকে না মোটে। ছেলেমেয়েদের মন মোটে টেকে না—সব কলকাতায় মানুষ। তোমার দিদি তো ছট্‌ফট্ করতে লাগলো—দেশে তা ছাড়া ম্যালেরিয়াও আছে—

এই সময় বাহির হইতে কে ডাকিল—ক্ষেত্রবাবু আছেন?

—কে ডাকছে ছাখো তো জানলা দিয়ে?

অনিলা দেখিয়া আসিয়া বলিল—একটা ছেলে। তোমার স্কুলের ছেলে নাকি, ছাখো না?

ক্ষেত্রবাবু বাহিরে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে আবার ঢুকিয়া বলিলেন—সেই তোমার অথর গো, সেই যে সে দিন বলছিলাম—অথর রাখাল মিত্তির! তিনি তাঁর ছেলের হাত দিয়ে চিঠি দিয়েছেন, তাঁর অসুখ, বড় কষ্ট পাচ্ছেন, আমি যেন গিয়ে দেখা করি—

অনিলা ব্যগ্রভাবে বলিল—আহা, তা যাও, যাও। কষ্ট পাচ্ছেন, সত্যি তো—অথর একজন—যাও—

ক্ষেত্রবাবু ছেলেটির পিছু পিছু ইটিলি সাউথ রোডের মধ্যে এক অন্ধ গলির ভিতরে গিয়া পড়িলেন। ছেলেটি তাঁহাকে একটা দরজার সামনে দাঁড় করাইয়া বলিল—আপনি দাঁড়ান, দরজা খুলে দি—

সে কোন্ দিক্ দিয়া চলিয়া গেল। ক্ষেত্রবাবু ভাবিলেন—আমি নিজেও ঠিক চৌরঙ্গীতে থাকি নে—কিন্তু একি গলি বাপ্—!

দরজা খুলিল। দরজার পাশে ক্ষুদ্র একটা রোয়াকের সামনে অন্ধকার এক ঘরে ছেলেটি তাঁহাকে লইয়া গেল। এত অন্ধকার যে, প্রথমে বোঝা যায় না—ঘরের মধ্যে কিছু আছে কি না। অন্ধকারের ভিতর হইতে একটা ক্ষীণ স্বর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—কে? ক্ষেত্রবাবু এসেছেন?

ক্ষেত্রবাবু দেখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া চোখ ঠিক্‌রাইয়া একটা বিছানা বা কিছুর অস্পষ্ট আভাস ও একটি শায়িত মনুষ্যমূর্ত্তি গোছ যেন

দেখিতে পাইলেন। আর অগ্রসর না হইয়া দাঁড়াইলেন, কিছু বাধিয়া ঠোকর খাইয়া পড়িয়া না যান।

ক্ষীণ স্বর চিঁ চিঁ করিয়া বলিল—ওই জানলার ওপরটাতে বসুন—ওরে একটা কিছু পেতে দে না ও রাধু—

—থাক্ থাক্, পেতে দিতে হবে না—আপনার কি হয়েছে ?

—আর কি হবে—জ্বর আর কাসি আজ পনেরো দিন। পড়ে আছি। উত্থানশক্তি রহিত—

—তাই তো দেখতে পাচ্ছি। বড় কষ্ট পাচ্ছেন তো!

এইবার ক্ষেত্রবাবু ঘরের ভিতরটা বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। ওই যে রাখালবাবু তাকিয়া ঠেস দিয়া মলিন বিছানায় কাৎ হইয়া আছেন, পাশে একটা ততোধিক মলিন লেপ, বিছানার এক পাশে দড়ির আলনাতে দু-চারখানা ময়লা ও আধময়লা কাপড় ঝুলিতেছে—বিছানার সামনে একটা তাক, তাকের ওপর অনেক বই ‘কাগজ। এক পাশে একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন। দেওয়ালে কয়েকখানি সস্তা ধরণের ক্যালেণ্ডার—বিভিন্ন পাঠ্য পুস্তক বিক্রেতাদের নাম ও বিজ্ঞাপন ছাপানো। ঘরের ও আসবাবপত্রের বীভৎস দারিদ্র্যে গরীব স্কুল মাষ্টার ক্ষেত্রবাবুও যেন শিহরিয়া উঠিলেন।

—কতদিন অসুখ বল্লেন ?

—তা আজ দিন-পনেরো—

—কেউ দেখছে ?

—না, দেখেনি। পয়সা নেই, সত্যি কথা বলতে কি ক্ষেত্রবাবু, আজ তিন দিন ঘরে এক পয়সাও নেই। ছেলেকে পাঠিয়েছিলাম রাধাকৃষ্ণ কর এণ্ড সন্সের দোকানে। আমার সেই—সেই—সেই—( রাখালবাবু একটু হাঁপ জিরাইলেন ) রচনার বইখানা দশ কপি পাঠিয়ে দিয়ে—একখানা চিঠি লিখে দিলাম, বলি—এখন বইগুলো রেখে দাম দাও—আমি পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট কমিশন দেবো—এখন আমার হাতে বড্ড টানাটানি যাচ্ছে—তা ব্যাটারা বই ফেরৎ দিয়েছে। ও বই নাকি কম বিক্রী—ও এখন বিক্রী হবে না। আপনি তো জানেন, চেৎলা স্কুলের হেড্ মাষ্টার—নব ব্যাকরণ-সুধা প্রথম ভাগ—

—আচ্ছা, আপনি একটু বিশ্রাম করুন—

—বিশ্রাম আমি করছি সারাদিনই। কিন্তু আমি বলি, দেখুন ক্ষেত্রবাবু, যারা জিনিস চেনে, তাদের কাছে জিনিসের কদর। চেৎলা স্কুলের হেড্ মাষ্টার নব ব্যাকরণ-সুধা দেখে বল্লে, মিত্তির মশাই, এমন বই একালে কে লিখছে আপনি ছাড়া। আপনাকে বলেছি বোধ হয় ক্ষেত্রবাবু, ব্যাকরণে ছাত্রবৃত্তিতে ফাষ্ট´ষ্ট্যাণ্ড করি, মেডেল আছে। দেখতে চান তো দেখাতে পারি।

—না, দেখাতে হবে কেন। আপনি ঠিকই বলছেন। তা চেৎলা স্কুলে বই ধরালে আপনার ?

—না। বল্লে, আগে যদি আসতেন, কা'কে বুঝি কথা দিয়ে ফেলেছে। আসছে বারে প্রমিজ্ করেছে ধরিয়ে দেবে। আর ওই শাঁকারিটোলা হাই স্কুলে রচনাদর্শখানা পাঠাতে বলেছিল—নমুনা—কিন্তু নমুনা পাঠিয়ে হয়রান। বই ধরাবেন না, নমুনা পাঠাও—!

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—ওসব আমরাও জানি। বই ধরাবার ইচ্ছে নেই, বই পাঠান—

রাখালবাবু উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিয়া পাশের তাকে হাত বাড়াইতে গেলেন।

—আপনাকে দেখাই, আর একখানা নীচের ক্লাসের ব্যাকরণ লিখছি—আপনাকে দেখাই—খাতাখানাতে লিখছিলাম—

কাসির বেগে রাখালবাবুর খাতা বাহির করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—থাক্ থাক্, এখন রাখুন।

বড় কষ্ট পাচ্ছি। কেউ নেই, কাকে বলি। তাই ছেলেটাকে প্রথমে আপনার স্কুলে পাঠাই, সেখানে দরোয়ান আপনার বাসার ঠিকানা বলে দিয়েছে—তাই বাসায় গিয়েছিল। এখন কি করি, একটা পরামর্শ দিন দিকি ক্ষেত্রবাবু ?

—তাই তো। খুবই বিপদ্। বাসাতে কে কে আছেন ?

—আমার স্ত্রী, দুটি ছোট ছোট ছেলে, এক বিধবা ভগ্নী, তাঁর একটি মেয়ে

—এই। রোজ দুটি করে টাকা হোলে তবে সংসার বেশ চলে। এক পয়সা আয় নেই, তার দু টাকা—কি করা যায় বলুন। খেতে পায়নি বাড়ীতে আজ দুদিন। আপনার কাছে খুলে বলতে লজ্জা নেই—

ক্ষেত্রবাবুর মনে যথেষ্ট দুঃখ ও সহানুভূতির উদ্রেক হইল। নিজেকে তিনি ঐ অবস্থায় ফেলিয়া দেখিলেন কল্পনায়। কিন্তু তিনি কি করিবেন। তাঁহার হাতে বাড়তি পয়সা এমন নাই, যাহা দিয়া তিনি এই দুঃস্থ বৃদ্ধ গ্রন্থকারকে সাহায্য করিতে পারেন। পরামর্শই বা তিনি কি দিবেন? একমাত্র পরামর্শ হইতেছে পয়সাকড়ির পরামর্শ। কিন্তু কে এই বৃদ্ধকে অর্থসাহায্য করিবে, সে কথাই বা তিনি কি করিয়া জানিবেন? বাধ্য হইয়া দুঃখের সঙ্গে ক্ষেত্রবাবু সে কথা জানাইলেন। তাঁহার এক্ষেত্রে করিবার কিছু নাই। কোনো পথই তিনি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেছেন না।

মুস্কিল হইল যে, এই সময় রাখাল মিত্তিরের ছেলেটি ভাঙা পেয়ালায় চা আনিয়া ক্ষেত্রবাবুর হাতে দিল। রাখালবাবুর স্ত্রী শুনিয়াছেন, তাঁহার স্বামীর একজন বিশিষ্ট প্রতিপত্তিশালী বন্ধু আসিবেন। চিঠি লইয়া ছেলে তাঁর কাছে গিয়াছে। তিনি আসিলেই দুঃখের একটা কিনারা হইবেই। এখন সেই ভদ্রলোকটি আসিয়াছেন শুনিয়া গৃহিণী তাড়াতাড়ি যথাসাধ্য অতিথি-সংকার করিয়াছেন। গরীবের ঘরে এই ভাঙা পেয়ালায় একটু চায়ের পিছনে যে কত ভরসা, নির্ভরতা, আবেদন নিহিত—ক্ষেত্রবাবু তাহা বুঝিলেন বলিয়াই চায়ের চুমুক যেন গলায় বাধিতেছিল। এখানে না আসিলেই হইত। পকেটে আছে মাত্র আট আনা পয়সা। তাই কি দিয়া যাইবেন? সেই বা কেমন দেখাইবে।

রাখালবাবু স্বয়ং এ দ্বিধা ঘুচাইয়া দিলেন।

—তা হোলে উঠলেন? আচ্ছা, কিছু কি আপনার পকেটে আছে? যা থাকে। বাড়ীতে খাওয়া হয়নি ওবেলা থেকে—দুটো একটা টাকা—এমন বিপদে পড়ে গেয়েছি—

ক্ষেত্রবাবু ছেলেটির হাতে একটা আট-আনি দিয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

সমস্ত সন্ধ্যাটা যেন বিস্বাদ হইয়া গেল। সামনেই একটা ছোট পার্ক, ছেলেমেয়েরা দোলনায় দোল খাইতেছে, লাফালাফি করিতেছে, আনন্দকলরব-মুখর পার্কের সবুজ ঘাসের ওপর দু-একটি অফিস-প্রত্যাগত কেরাণী বসিয়া বিড়ি টানিতেছে, সোঁদালি ফুলের ঝাড় দুলিতেছে রেলিংয়ের ধারের গাছে, আলু-কাব্লিওয়ালার চারি পাশে উৎসাহী অল্পবয়স্ক ক্রেতার ভিড় লাগিতেছে। ক্ষেত্রবাবু একখানা বেঞ্চের এক কোণে গিয়া বসিলেন। বেঞ্চির ওপর দুইটি লোক বসিয়া ঘরভাড়া আদায় করার অসুবিধা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলিতেছে।

ক্ষেত্রবাবু ভাবিলেন, রাখালবাবুও তাঁহার মত স্কুলমাষ্টার ছিলেন একদিন। আজ অক্ষম ও পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন—তাই এই দুর্দ্দশা। বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, টুইশানিও জোটে না আর। স্কুলমাষ্টারের এই পরিণাম।

বেশি দূর যাইতে হইবে না—তাঁদের স্কুলেই রহিয়াছেন নারাণবাবু—তিন কুলে কেহ নাই, আজীবন পূতচরিত্র, আদর্শ শিক্ষক, কিন্তু স্কুলের চোর-কুঠুরীর ঘরে নির্জ্জন আত্মীয়হীন জীবন যাপন করিতেছেন আজ আঠারো বছর কি বাইশ বছর, কে খবর রাখে? আজ যদি চাকুরী যায়, কাল আশ্রয়টুকুও নাই। ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্ক অবস্থায় ক্ষেত্রবাবু টুইশানিতে চলিয়াছেন, কে পিছন হইতে বলিল—স্যার, ভাল আছেন?

ক্ষেত্রবাবু পিছন ফিরিয়া চাহিলেন—একটি সুবেশ তরুণ যুবক। বেশ দামী সুট পরনে, চোখে কাঁচকড়ার চশমা—মৃদু হাসিয়া বলিল—চিনতে পারছেন না স্যার?

—না, কই ঠিক—তুমি আমাদের স্কুলের...?

—হ্যাঁ স্যার। অনেক দিন আগে, এগারো বছর আগে—পাশ করি। আমার নাম সুরেশ।

—সুরেশ বসু?

—না স্যার, সুরেশ মুখার্জ্জি, সে বার সেই সরস্বতীপুজোর সময়ে আমাদের বারে ভাঁড়ার লুঠ করে ছেলেরা, মনে আছে? হেড্মাষ্টার ফাইন্ করেছিলেন সব ছেলেদের। মনে হচ্ছে স্যার?

—হ্যাঁ, একটু একটু মনে হচ্ছে যেন। তোমাদের ছেলেবেলার কথা হিসেবে এসব যত মনে থাকে, আমাদের তত মনে রাখবার ব্যাপার নয় বাবা। বুঝতেই পারছো, কি কর এখন ?

—আজ্ঞে স্যার, রাঁচিতে চাক্‌রী করি, এঞ্জিনিয়ার।

—ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছিলে বুঝি বাবা ?

—আজ্ঞে, শিবপুর থেকে পাশ করে বিলেত যাই। আজ তিন বছর বিলেত থেকে ফিরে গভর্ণমেণ্ট সার্ভিস করছি রাঁচিতে—পি. ডবলিউ. ডিতে এসিষ্ট্যাণ্ট এঞ্জিনিয়ার—

—কি নাম বল্লে, সুরেশ মুখার্জ্জি ? এখন চেনা চেনা মুখ বলে মনে হচ্ছে। অনেকদিনের কথা—আর কত ছেলে আসে যায়, কাজেই সব মনে রাখা—

—নিশ্চয় স্যার, ঠিক কথা। পুরোনো মাষ্টারদের মধ্যে কে কে আছেন স্যার ? যদুবাবু আছেন ?

—হ্যাঁ, শ্রীশবাবু, থার্ড পণ্ডিত আছেন, নারাণবাবু আছেন—

—নারাণবাবু আজও আছেন স্যার ? উঃ, অনেক বয়স হোল তাঁর। তিনি কি স্কুলের সেই ঘরেই থাকেন—আচ্ছা, একবার দেখা করে আসবো। বড্ড ইচ্ছে হয়—চাকরটা আছে ? কেবলরাম ?

—হ্যাঁ, আছে বই কি। যেও না একদিন স্কুলে।

যুবকটি পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। ক্ষেত্রবাবু সগর্ব্বে একবার চারি দিকে চাহিলেন—লোকে দেখুক, এমন একজন সুট-পরা তরুণ যুবক তাঁহার পায়ের ধূলা লইতেছে। তাহাকে বেশ সুন্দর দেখিতে, সাহেবের মত চেহারা—কবে হয় তো ইহাকে পড়াইয়াছিলেন মনে নাই, তবুও তো তাঁহাদের স্কুলের ছাত্র। আজ দু পয়সা করিয়া খাইতেছে। বিলাত-ফেরৎ, এসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার—এরকম হয়তো কত ছাত্র কত দিকে আছে, সকলের সন্ধান তো জানা নাই !

এইটুকু ভাবিয়াই সুখ। এই ছাত্রের দল তাহাদের বাল্যজীবনের শত সুখস্মৃতির আধার তাহাদের স্কুল ও স্কুলের শিক্ষকদের ভুলে নাই ; কেহ আছে

বর্ম্মায়, কেহ আছে সিমলায়, কেহ বা কুমায়ুন, শিলং, মসলিপত্তনে। তবুও দেশের আশা-ভরসাস্থল পুত্রপ্রতিম এই সব তরুণ দল একদিন তাঁহাদেরই হাতে চড়টা চাপড়টা খাইয়া ইংরাজি ব্যাকরণের নিয়ম শিখিয়াছে, বীজ-গণিতের জটিল রহস্য বুঝিয়াছে—ভাবিয়াও আনন্দ হয়।

ক্ষেত্রবাবু পাশের গলিতে ঢুকিয়া টুইশানি-পড়া ছাত্রের বাড়ী কড়া নাড়িলেন।

চৈত্র মাস। ঈষ্টারের ছুটি আজই হইয়া গেল। যদুবাবু মেসে ফিরিয়া দেখিলেন, অবনী চিঠি লিখিয়াছে—তিনি যদি এই মাসের মধ্যে বৌদিদিকে এখান হইতে লইয়া না যান, তবে সে বৌদিদিকে কলিকাতায় আনিয়া যদুবাবুর মেসে রাখিয়া যাইবে।

মাত্র পাঁচটি টাকা হাতে—স্কুলের টাকা এ মাসে সামান্যই পাওয়া গিয়াছিল—কোন্ কালে খরচ হইয়া গিয়াছে মেসের দু মাসের দেনা মিটাইতে। সামান্য কিছু স্ত্রীকে পাঠাইয়াছিলেন। এ পাঁচটা টাকা টুইশানির অগ্রিম আদায়ী আংশিক মাহিনা। স্ত্রীকে রাখিবার কোনো অসুবিধা হইত না বেড়াবাড়ী, যদি নিজের বাড়ীঘর সেখানে থাকিত—কিন্তু পৈতৃক বাড়ী ভূমিসাৎ হওয়ার পরে যদুবাবু সেখানে আর যান নাই, সেই হইতেই পথে পথে, বাসায়। আজ দেড় বৎসরের উপর, স্ত্রীকে বেড়াবাড়ী পরের সংসারে ফেলিয়া রাখিয়াছেন—ইচ্ছা করিয়া কি? তাহা নয়। নিরুপায় হিসাবে।

এখন স্ত্রীকে গিয়া ওখান হইতে সরাইতেই হইবে।

নতুবা ইতর অবনীটা সত্য সত্যই হয় তো স্ত্রীকে একদিন মেসে আনিয়া হাজির করিবে। লোকটা কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞানহীন কিনা।

সাত পাঁচ ভাবিয়া যদুবাবু টিকেট কাটিয়া সিরাজগঞ্জ-প্যাসেঞ্জারে রাত্রে রওনা হইলেন এবং শেষ রাত্রে বগুলা নামিয়া, ষ্টেশনে রাত কাটাইয়া, পরদিন সকালে সাত ক্রোশ হাঁটিয়া বেলা আড়াইটার সময় গলদ্‌ঘর্ম্ম ও অভুক্ত অবস্থায় বেড়াবাড়ী পৌঁছিলেন।

অবনী বলিল—আসুন, দাদা—তা একেবারে ঘেমে—এঃ, ওরে নিতে

কাপালীকে ডেকে এনে গাছ থেকে দুটো ডাব পাড়ার ব্যবস্থা কর—হাত পা ধুয়ে নিন—তারপর ভাল সব ?

যদুবাবু ঠাণ্ডা হইলেন। স্ত্রীকে দেখিয়া কিন্তু চমকিয়া উঠিলেন। অবনীর বিধবা দিদি ক্ষান্ত বলিল—বৌ প্রায় কেবল জ্বরে ভুগেছে ওদিকে—এই মাসখানেক ফাগুনে হাওয়া পড়ে একটু ভাল আছে। তাও দু'বার পড়লো। ঘোর মেলেরিয়া এ সব দিকে। দেখ না, ওই অবনীর ছেলেমেয়েগুলো ভুগে ভুগে হাড্ডি-সার। না একটু ওষুধ, না চিকিচ্ছে—কোথায় পাবে ? সামান্যা আয়, এদিকে সকালে উঠে দু'কাঠা চালের খরচ। বসো, একটা ডাব কেটে আনি ভাই—

যদুবাবুর স্ত্রী কাঁদিতে লাগিল। বেচারীর ভাগ্যে আজ প্রায় এক বছর পরে তাঁহার দর্শনলাভ ঘটিল।

যদুবাবু বলিলেন—কেঁদো না। এঃ, তোমার চেহারা দেখতে বড্ডই—

—হ্যাঁ, বড্ডই ! মরে যাচ্ছিলাম কার্ত্তিক মাসে। মরে বেঁচে উঠেছি—আচ্ছা, মানুষ কি করে এমন হতে পারে ? এত করে চিঠি দিলাম, একবার চোখের দেখা—

—তুমি তো বল্লে চোখের দেখা। হাতে পয়সা না থাকলে তো আর—

—হ্যাঁ গো, যদি মরেই যেতাম, তা হোলে একবার তোমার সঙ্গে দেখাটাও যে হোত না।

—সে সবই বুঝলাম। আমার অবস্থাটা তোমরা দেখবে না তো ? তোমাদের কেবল—

যদুবাবুর স্ত্রী ঝাঁঝের সহিত বলিল—অমন কথা বোলো না। মুখে পোকা পড়বে। আমি যেমন নীরবে সয়ে গেলাম, এমন কেউ সহ্যি করবে না, তা বলে দিচ্ছি। রাত্রে জ্বরে পুড়েছি, শুধু মন হাঁপিয়েছে—মরে গেলে তোমাকে একটিবার চোখের দেখাটা হোল না বুঝি—তাও কাউকে আমি বিরক্ত করিনি—

চারিদিক্ চাহিয়া স্বর নীচু করিয়া বলিল—আর এমন চামার ! এমন চামার ! এক পয়সার সাবু না, এক পয়সার মিছরী না। বরং তুমি যে টাকা

পাঠাতে মাসে মাসে, তা থেকে কেবল আজ দাও এক টাকা, কাল দাও আট আনা—ওই অবনী ঠাকুরপো। না দিলেও চক্ষুলজ্জা, ওদের বাড়ী, ওদের ঘরে জায়গা দিয়েছে। জায়গা দিয়েছে কি অম্‌নি। ওই টাকাটা সিকেটা তো আছেই—আর এদিকে বাক্যির জ্বালা কি! এক একদিন ইচ্ছে হোত—এই সত্যি বলছি দুপুরবেলা—ব্রাহ্মণের সামনে মিথ্যে বলিনি—যে, গলায় দড়ি দিয়ে মরি—

এই সময়ে অবনীর বিধবা দিদি (তিনি যদুবাবুরও বড়) ডাব কাটিয়া আনিয়া বলিলেন—বৌ, এক গ্লাস জল নিয়ে এসো—আর এই রেকাবীতে দুখানা বাসোতা—কোথায় কি পাবো বলো ভাই। বাসোতা দুখানা খেয়ে একটু জল—আমি গিয়ে ভাত চড়াই।

যদুবাবুর স্ত্রী জলহাতে আসিয়া বলিল—ঠাকুরঝি লোকটা এই বাড়ীর মধ্যে ভাল লোক। নইলে বৌ—ও বাবাঃ—খুরে নমস্কার—বলিয়া উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া, জলের গ্লাসটা যদুবাবুর সম্মুখে নামাইয়া রাখিল।

বৈকালের দিকে অবনী বলিল—দাদার কি এখন গুড্ ফ্রাইডের ছুটি?

—হ্যাঁ।

—কদিন?

—মঙ্গলবার খুলবে। ওই দিনই ওকে নিয়ে যাবো ভাবছি।

—তাই নিয়ে যান। এখানে বৌদিদির শরীরও টিকছে না, মনও টিকছে না। তাই কখনো টেঁকে? আপনি রইলেন পড়ে কলকাতায়, উনি রইলেন এখানে। ছেলে নেই, পিলে নেই। আপনার বৌমার কাছে কেবল কান্নাকাটি করেন, দুঃখু করেন। নিয়ে যান, সেই ভালো। তা ছাড়া আমাদের এখানে অসুবিধে। ঘরদোর নেই—দুখানি মাত্র ঘর। আবার আমার ছোট ভগ্নীপতি শিশির নাকি আসবে শুনছি ছেলেমেয়ে নিয়ে—কতদিন আসেনি। তারা এলেই বা কোথায় থাকি? তাই বলি, দাদাকে চিঠি লিখি, দাদা এসে ওঁকে নিয়েই যান্—

—না, তুমি যা করেছ, যথেষ্ট উপকার করেছ। এতদিন কে রাখে। যাই, একটু বেড়িয়ে আসি—

এ বেড়াবাড়ী গ্রামের বাহিরে খুব বড় বড় মাঠ—আধ মাইল, কি তারও কম দূরে চূর্ণী নদী। নদীর ধারে খেজুর গাছ, নিম গাছ ও ভাঁট সেওড়ার বন। এখন নিমফুলের সময়, চৈত্রের তপ্ত বাতাসে নিমফুলের সুবাস মাখানো, ঘেঁটুফুলের দল কিছুদিন আগে ফুটিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে—এখন শুধু রাঙা রাঙা সুঁটির মেলা ভাঁটগাছের মাথায় মাথায়। উত্তর দিকের মাঠে প্রকাণ্ড একটা কচিপাতা-ভরা বটগাছের শীর্ষদেশ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া। কিছুদিন আগে সামান্য বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, চষা ক্ষেতের মাঝে মাঝে জল জমিয়াছিল, এখনো আধশুকনো কাদায় তার চিহ্ন আছে। একটা তুঁতগাছের তলায় অনেক শুকনো তুঁতফল পড়িয়া আছে। যদুবাবু একটা তুঁতফল কুড়াইয়া মুখে দিলেন—মনে পড়িল, বাল্যকালে এই সময় তুঁতফল খাওয়ার সে কত আগ্রহ। কোথায় গেল সে সব সুখের দিন। বাবা গোয়াড়ি কোর্টে কাজ করিতেন, শনিবারে শনিবারে গ্রামের বাড়ীতে আসিতেন, হাঁড়ি-ভর্ত্তি খাবার আনিতেন ছেলেমেয়ের জন্য। তাঁহাদের বাড়ীতে মোংলা বলিয়া এক গোয়ালা ছোঁড়া থাকিত। সরভাজা খাইবার লোভে সে ছুটিয়া গিয়া রাস্তায় দাঁড়াইত—কর্ত্তা হাঁড়ি-হাতে আসিতেছেন, না শুধু হাতে আসিতেছেন—দেখিবার জন্য।

নদীতে ডিঙি-নৌকায় জেলেরা মাছ ধরিতেছে। যদুবাবু বলিলেন—কি মাছ রে?

—আজ খয়রা আছে কর্ত্তা।

—দিবি চার পয়সার, যাব? অনেক দিন দেশের খয়রা মাছ খাইনি। টাটকা খয়রা মাছটা—

যদুবাবু অবনীর দিদির হাতে মাছ দিয়া বলিলেন—ও দিদি, এই নাও। দেশের খয়রা মাছ কত কাল খাইনি—

রাত্রে পাড়ায় এক জায়গায় সত্যনারায়ণের সিন্নি উপলক্ষ্যে যদুবাবু অবনীর সঙ্গে তাহাদের বাড়ী গেলেন। বাড়ীর কর্ত্তা যদুবাবুকে যথেষ্ট খাতির করিয়া বসাইল, তামাক সাজিয়া আনিল নিজের হাতে। তাহার বড় ছেলের একটা চাকুরী হইতে পারে কি না কলিকাতায়? ছেলেটিকে ডাকিয়া আনিয়া

পরিচয় করাইয়া দিল। ম্যাট্রিক ত্'বার ফেল করিয়া সম্প্রতি আজ বছর খানেক বসিয়া আছে। পুর্ব্বেকার অভিজ্ঞতা হইতে যতুবাবু সাবধান হইয়াছিলেন, আবার কলিকাতার মেসে, কি বাসায় জুটিয়া উৎপাত করিতে সুরু করিলেই চক্ষু স্থির। পাড়াগাঁয়ের লোককে বিশ্বাস নাই। সুতরাং তিনি বলিলেন, তিনি চেষ্টা করিবেন, তবে এখন কিছু বলিতে পারেন না—আজকাল কত বি. এ. এম. এ. পাশ ফ্যা ফ্যা করিতেছে, তার ম্যাট্রিক।

রাত্রে স্ত্রীকে বলিলেন—তা হোলে আর একটা মাস এখানে—

—না, তা হবে না। আমায় নিয়ে যাও এবার—

—কিন্তু কোথায় নিয়ে যাই বলো তো?

—তা তুমি বোঝো।

যতুবাবু মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিলেন—তুমি বোঝো! বুঝি কি, সেটা আমায় দেখিয়ে দাও। কলকাতায় কি বাসা ঠিক করে রেখে এসেছি যে, তোমায় নিয়ে ওঠাবো? উঠবে কোথায়? শেয়ালদা ইষ্টিশানে বসে থাকবে?

যতুবাবুর স্ত্রী কাঁদিতে লাগিল।

—আঃ, কি মুস্কিলেই পড়েছি বিয়ে করে। ঝাড়া হাত-পা থাকলে আজ আমার ভাবনা কি? তোমার ভাবনা ভাবতে ভাবতেই প্রাণ গেল।

যতুবাবুর স্ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—আমার ভাবনা কি ভাবতে হচ্ছে তোমায়? ফেলে রেখেছ এখানে আজ দেড় বছর—জ্বরে ভুগে ভুগে আমার শরীরে কিছু নেই—তাও তোমাকে কি কিছু বলেছি? মুখনাড়া আর খোঁটা তুটি বেলা হজম করতে হোত যদি আমার মত, তবে বুঝতে। এতেও তোমার কাছে ভাল হোলাম না—তার চেয়ে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরি, তুমি ঝাড়া হাত-পা হও, আপদ্ চুকে যাক্।

—আচ্ছা থামো থামো, রাত তুপুরে কান্নাকাটি ভাল লাগে না। ঘুম আসছে। ওরা শুনতে পাবে—এক ঘর, এক দোর—দেখি যা হয়—

—তুমি এবার না নিয়ে গেলে অবনী ঠাকুরপো শুনবে নাকি? স্বামি-স্ত্রীতে পরামর্শ হয়েছে এবার আমাকে তোমার সঙ্গে ওরা পাঠিয়ে দেবেই।

ওদের বাড়ীতে জায়গা হচ্ছে না—ওর ভগ্নীপতি নাকি আসবে শুনছি এ মাসের শেষে। সত্যিই তো, ঘরদোর নেই, ওদের অসুবিধে হয় বই কি। এত দিন তো রাখলে।

—হ্যাঁ, রেখেছে তো মাথা কিনেছে কি না? ভারি করেছে! আর আমার মেসে গিয়ে যে সাত দিন থেকে এলো, আজ সিনেমা রে, কাল ইয়ে রে— তখন?

—তুমি বুঝি অবনী ঠাকুরপোকে টাকা দাওনি সে বার, সে কি খোঁটা আর তোমার নামে কি সব কথা, আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে স্বামি-স্ত্রীতে দিনরাত। আমি বলি, আর তো আমার সহ্যি হয় না, একদিকে চলেই যাই, কি, কি করি। এত কষ্ট গিয়েছে সে সময়—

—আচ্ছা, থাক্ সে-সব কথা—এখন রাত হয়েছে ঘুম আসছে—সারাদিন খাটুনি আর রাত্তির কালে ভ্যাজ ভ্যাজ ভাল লাগে না—

যদুবাবু বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িলেন—তাঁহার স্ত্রী নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল। কিছুকাল পরে বলিল—ঘুমুলে নাকি? ওগো?

যদুবাবু বিরক্তির সুরে বলিলেন—আঃ, কি?

—তোমার পায়ে পড়ি, আমায় এবার এখানে [illegible] যেও না। আমি আর সহ্যি করতে পারছি নে—তুমি বোঝো। কখনো তো তোমায় এমন করে বলিনি—কেবল ওই ঠাকুরঝির জন্যে এখানে এতদিন থাকতে পেরেছি। নইলে কোন কালে এতদিন—একবার রটিয়ে দিলে, তুমি নাকি বিয়ে করেছ, আমার ছেলেপিলে হোল না বলে। বলে, দাদা সেইজন্যেই বৌদিদিকে ত্যাগ করে আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে রেখে গিয়েছে। সে কতো কথা! আমি ভেবে কেঁদে মরি। শুধু ঠাকুরঝি আমায় বোঝাতো,—বৌ, তার কি এখন বিয়ের বয়েস আছে যে, বিয়ে করবে? তুমি ওসব শুনো না।

—তুমিও কি ভাবো নাকি আমার বিয়ের বয়েস নেই?

—বয়েস থাকলে কি হবে, একটা বিয়ে করে তাই খেতে দিতে পারে না, দুটো বিয়ে করে তোমার উপায় হবে কি? কুঁজোর সাধ হয় চিৎ হয়ে শুতে—

এই কথায় যদুবাবুর পৌরুষের অভিমান ভীষণভাবে আহত হওয়ায় তিনি আর কোন কথা না বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন এবং বোধ হয় অনেকক্ষণ পরেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

চুনি এবার থার্ড ক্লাসে উঠিল। চেহারা আরও সুন্দর হইয়াছে, ওষ্ঠে গোঁপের ঈষৎ রেখা দেখা দিয়াছে।

নারাণবাবু পড়াইতে গিয়া তাহার সঙ্গে গল্প করেন নানা বিষয়ে—চুনিকে ছাড়িয়া যেন উঠিতে ইচ্ছা হয় না। চুনির মধ্যে একটি সুদুর্লভ রহস্য ও বিস্ময়ের ভাণ্ডার যেন গুপ্ত আছে—নারাণবাবু নানা কথায় ও প্রশ্নে সেই রহস্য ভাণ্ডারের সন্ধান খুঁজিয়া বেড়ান। চুনি আসিবামাত্র নারাণবাবু কেমন আত্মহারা হইয়া যান—ভাল করিয়া পড়াইতেও যেন পারেন না, কেবল তাহার সহিত গল্প করিতে ইচ্ছা করে। অথচ চুনি তাঁহাকে কি দিতে পারে, তাঁহাকে সে রাজা করিয়া দিবে না—নারাণবাবু তাহা ভালই জানেন—তবুও কেন এমন হয়, কে জানে? মাষ্টার পড়াইতে আসিয়া ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকায়, উঠিতে পারিলে বাঁচে—অথচ নারাণবাবুর উঠিতে ইচ্ছা করে না—রাত্রি বেশি হইয়া যায়, চুনি পান্না ঘুমে ঢুলিয়া পড়ে, কলিকাতার কলকোলাহল নীরব হইয়া আসে, নারাণবাবু ধমক দিয়া বলেন—এই চুনি, এই পান্না—ঢুলছিস্ নাকি? পান্না চমকিয়া উঠিয়া বইয়ের পাতায় মন দিবার চেষ্টা করে, চুনি সলজ্জ স্বরে বলে—ঘুম আসছে স্যার—রাত অনেক হোল—

চুনির মায়ের স্বর খোলা দ্বারপথে ভাসিয়া আসে—বলি, আজ তোদের কি হবে না নাকি? সারা রাত বসে ভ্যাজর ভ্যাজর করলেই বুঝি ভাল পড়ানো হয়?

পরে ঈষৎ নেপথ্য হইতে শ্রুত হইল সেই একই কণ্ঠের স্বর—বুড়ো মাষ্টারটা বসে বসে করে কি এত রাত পর্য্যন্ত? এত করে বলি ওঁকে, বুড়ো মাষ্টার বদলে ফেল—বুড়ো দিয়ে কি লেখাপড়া হয়?

চুনি লাফাইয়া উঠিয়া বাড়ীর মধ্যে মাকে হয় তো বা মারিতে ছোটে।

নারাণবাবু ধমক দিয়া চীৎকার করিয়া বলেন—এই চুনি—কোথায় যাস্? পালা যা তো—তোর দাদাকে ধরে নিয়ে আয়—

কিছুক্ষণ পরে চুনি ছুটাছুটিতে ঘর্ম্মাক্ত রাঙা মুখে আসিয়া বসিয়া হাঁপাইতে লাগিল।

—কোথায় গিয়েছিলি?

—কোথাও না স্যার।

—এই সব জ্ঞান হচ্ছে তোমার—না?

—না স্যার। আপনি তাই সহ্য করেন, আপনার খেয়াল নেই কোনো দিকে। আমাদের বাড়ীতে আসেন, তা আমাদের কত ভাগ্যি। রোজ রোজ মা এরকম করবে, আমি—

—ছিঃ, মা'র সম্বন্ধে কোনো কথা বলতে নেই ছেলের। মায়ের বিচার কি ছেলে করবে? আমারই দেরি হয়ে গিয়েছে আজ—উঠি বরং—

—না স্যার, বসুন না আপনি।

চুনির মার কণ্ঠস্বর পুনরায় দ্বারপথে শ্রুত হইল—খাবিনে পোড়ারমুখো ছেলে? বামুনি কি এত রাত পর্য্যন্ত তোমাদের ভাত নিয়ে বসে থাকবে নাকি?

নারাণবাবু লজ্জিত কৈফিয়তের সুরে অন্তরালবর্ত্তিনীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—হ্যাঁ, বৌমা—আমি এই যে যাই—যাচ্ছি—একটু দেরি হয়ে গেল আজ—

ঈষৎ নম্রসুরে উদ্দেশে উত্তর আসিল—ভাত নিয়ে থাকতে হয় ঠাকুরঝি, তাই বলি। নইলে মাষ্টার পড়াচ্ছে, পড়াক্ না—আমি কি বারণ করি?

নারাণবাবু গলির ভিতর দিয়া চলিয়া আসিলেন, মনে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ, চুনি তাঁহার দিকে হইয়া মাকে মারিতে গিয়াছিল—তাঁহাকে চুনি তবে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে, ভক্তি করে। কেন এ আনন্দ রাখিবার জায়গা নাই, বৃদ্ধ নারাণবাবু তা বুঝিতে পারেন। তাঁর কেহ আপনার জন নাই এ বিশাল দুনিয়ায়—তবু চুনি আছে, বড় হইলে সে তাঁকে দেখিবে।

স্কুলবাড়ীর বড় ছাদে রাত্রে আহারাদির পর নারাণবাবু পায়চারি করেন

বহুকালের অভ্যাস। আকাশের নক্ষত্ররাজি এই তেতালার ছাদ হইতে বেশ দেখা যায় বলিয়াই নারাণবাবু এই সময়ে উন্মুক্ত আকাশতলে বেড়াইতে ভালবাসেন। ডাকিলেন—ও জগদীশ ভায়া—খাওয়া দাওয়া হোল?

টিচারদের ঘরের পাশে ক্ষুদ্র টিনের একখানি চালায় জ্যোতির্ব্বিনোদ মাছ ভাজিতেছিলেন, উত্তর দিলেন—না দাদা, এই ছেলে পড়িয়ে এসে রান্না চড়িয়েছি। ও দাদা—আজ কি হয়েছিল জানেন?

বলিতে বলিতে জ্যোতির্ব্বিনোদ বাহিরে আসিলেন।

—আজ ওই লাল বাড়ীর সেই যে ছেলেটা ছাদে উঠে ডন্ কসতো, সে আজ নতুন বৌ নিয়ে বাড়ী এসেছে—পাড়াগাঁয়ের বাড়ীতে বিয়ে হয়েছিল—আজ বৌ নিয়ে এল।

নারাণবাবু আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন—কেমন বৌ হোল?

—খাসা বৌ হয়েছে—ওরই মত ফর্সা—দুজনে ছাদে বেড়াচ্ছিল, খুব হাসিখুসি—

—আহা, তা হোক, তা হোক—

—যাই দাদা, মাছ কড়ায়, পুড়ে গেল—

কি জানি কেন, নারাণবাবুর হঠাৎ মনে পড়িল একটা ছবি। চুনি বিবাহ করিয়া বৌ আনিয়াছে, যেমন চমৎকার রূপবান্ ছেলে, তেমনি লক্ষ্মীপ্রতিমার মত বধূ। পুত্রবধূর সাধ তাঁহার মিটিয়াছে। চুনি বলিয়াছে, আমার বৌ স্যার, আপনার সেবা করবে না তো কার সেবা করবে? চুনি পুরীতে বৌকে লইয়া বেড়াইতে গিয়াছে, সঙ্গে তাঁহাকে লইয়া গিয়াছে, কারণ, তাঁহার শরীর খারাপ। পুত্রের কর্ত্তব্য করিয়াছে সে।

চুনির বৌ বলিতেছে—বাবা, আপনার পায়ে কি এবেলা তেল মালিশ করতে হবে?

স্বপ্নাচ্ছন্ন অতীত দিবসগুলির কুয়াসা ভেদ করিয়া কত অস্পষ্ট মুখ উঁকি মারে। দুপুরের সময় টিফিনের ছুটিতে কিংবা বেলা পড়িলে কত বার তিনি এই রকম ছাদে বেড়াইতেন, এই ছাদটিতে উঠিলেই সেই সব পুরোনো দিন, তাহাদের সঙ্গে জড়িত কত মুখ মনে পড়ে।

একখানি মুখ মনে পড়ে—সুন্দর মুখখানি ডাগর চোখে নিষ্পাপ দৃষ্টি, আট ন' বছরের ছেলে, নাম ছিল সুদেব। মুখের মধ্যে লেবেনচুষ পু'রয়া দিত, তখন নারাণবাবুর মাথার চুলে সবে পাক ধরিয়াছে, টিফিনের সময় রোজ পাকা চুল আটগাছি দশগাছি তুলিয়া দিত।

বলিত—আপনাকে ছেড়ে কোনো স্কুলে যাবো না স্যার।

তারপর আর ভাল মনে হয় না—অগণিত ছাত্রসমুদ্রে দূর হইতে দূরান্তরে তার অপসৃয়মাণ মুখ কখন্ যে হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল, তার হিসাব মনের মধ্যে খুঁজিয়া মেলে না আর। জীবনের পথ বহু পথিকের আসা-যাওয়ার পদচিহ্নে ভরা, কোথাও স্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট।

ঘরে আসিয়া শুইবার ইচ্ছা হইল না, নারাণবাবু আবার ডাকিলেন—ও জগদীশ, কি করলে রান্না বান্না?

জ্যোতির্ব্বিনোদ অন্নপিণ্ডরুদ্ধস্বরে বলিলেন—খেতে বসেছি দাদা—

—আচ্ছা, খাও খাও—

এই স্কুলবাড়ীর ছোট ঘরটিতে কত কাল বাস। কত সুপরিচিত পরিবেশ, কত দূর অতীতের স্মৃতিভরা মাস, বৎসর, যুগ। আশপাশের বাড়ীর গৃহস্থ-জীবনের কত সুখ, আনন্দ, সঙ্কট তাঁর চোখের উপর ঘটিয়া গিয়াছে। মনে মনে তিনি এই অঞ্চলের পাড়াসুদ্ধ ছেলে মেয়ে, তরুণী কন্যা বধূদের বুড়ো দাদু, যদিও তাহাদের মধ্যে কেহই তাঁহাকে জানে না, চেনে না। আদর্শ শিক্ষক অনুকূলবাবুর স্মৃতিপূত এই বিদ্যালয়গৃহ, এ জায়গা যে কত পবিত্র—কি যে [illegible] একদিন হইয়া গিয়াছে, তার খোঁজ রাখেন শুধু নারাণবাবু।

আজ মনে এত আনন্দ কেন?

কি অপূর্ব্ব আনন্দ, একটা তরুণ মনের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি আজ তিনি আকর্ষণ করিতে পারিয়া ধন্য হইয়াছেন। অনুকূলবাবু বলিতেন—স্যাখো নারাণ, একটা বেলগাছে বছরে কত বেল হয় দেখেছ? একটা বেলের মধ্যে কত বিচি থাকে, প্রত্যেক বিচিটি থেকে এক এক মহীরুহ জন্মাতে পারে—কিন্তু তা জন্মায় না। একটা বেলগাছের যাট সত্তর বৎসরব্যাপী জীবনে অত বিচি থেকে গাছ জন্মায় না—অন্ততঃ দুটি বেলচারা মানুষ হয়, বড় হয়—আবার

বহু বেলফল দেয়। বহু অপচয়ের হিসেব কষেই এই পৃষ্টির ইঞ্জিনিয়ারিং দাঁড় করিয়ে রেখেছেন ভগবান্। তার মধ্যেই অপচয়ের সার্থকতা। স্কুলের সব ছেলে কি মানুষ হয়? একটা স্কুল থেকে ষাট বছরে দুটো-একটা মানুষ বার হোলেও স্কুলের অস্তিত্ব সার্থক। এই ভেবেই আনন্দ পাই নারাণ। প্রত্যেক শিক্ষক, যিনি শিক্ষক নামের যোগ্য—এই ভেবেই তাঁর আনন্দ ও উৎসাহ। দেশের সেবায় সব চেয়ে বড় অর্ঘ্য তাঁরা যোগান—মানুষ।

জ্যোতির্ব্বিনোদ নারাণবাবুর সামনে বিড়ি খান না। আড়ালে দাঁড়াইয়া ধূমপান শেষ করিয়া ছাদের এধারে আসিয়া বলিলেন—দাদা, এখনও খান নি? রাত অনেক হয়েছে।

—না, খাবো না, শরীরটা আজ তেমন ভাল নেই—

—কি হয়েছে দাদা? দেখি, হাত দেখি? তাই তো, আপনার যে জ্বর হয়েছে। ছাদে ঠাণ্ডা লাগিয়ে বেড়াবেন না, বেশ গা গরম। চলুন, নীচে দিয়ে আসি।

বসো বসো। ও একটু আধটু গা-গরমে কিছু আসবে যাবে না—আকাশের নক্ষত্র চেন? তুমি তো জ্যোতিষ নিয়ে ব্যবসা করো। এষ্ট্রনমি জানো? ওই যে এক একটা নক্ষত্র দেখছো—এক একটা সূর্য্য। আমি যদি বলি, এই পৃথিবীর মত বহু হাজার পৃথিবী ওই সব নক্ষত্রের মধ্যে আছে—তা হোলে তুমি কি তার প্রতিবাদ করতে পারো?

—আজ্ঞে না দাদা, প্রতিবাদ তো দূরের কথা—আমি কথাটা বলবো না—আপনি যত ইচ্ছে বলে যান। যখন ও নিয়ে কখনো মাথা ঘামাই নি—আপনি যেমন জ্যোতিষ আলোচনা করেন নি কখনো—বলেন, ও সব মিথ্যে।

—মিথ্যে বলিনে, আনসায়েন্টিফিক্ বলি।

—ওই একই কথা দাদা। দু পয়সা করে খাই—কাজেই বিশ্বাস করি।

নারাণবাবু ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িলেন। রাত্রে ভয়ানক পিপাসা, সমস্ত গায়ে ব্যথা। ঘুমের ঘোরে আর জ্বরের ঘোরে কত কি অস্পষ্ট স্বপ্ন দেখিলেন—চুনির মুখ, তাঁর ছেলে নাই, কেহ কোথাও নাই—কেন, এত ছাত্র আছে—চুনি আছে—শিয়রে চুনি বসিয়া তাঁহার সেবা করিতেছে।

পরদিন নারাণবাবু সকালে বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারিলেন না। দু চার দিন গেল, তবুও জ্বর কমে না। ক্ষেত্রবাবু ও রামেন্দুবাবু প্রায়ই আসিয়া বসিয়া থাকেন। হেড্‌মাষ্টার প্রথমে নিজের ঔষধের বাক্স হইতে বাইওকেমিক দিলেন—তারপর ডাক্তার ডাকাইলেন। জ্যোতির্ব্বিনোদ কোথা হইতে নিজের দেশের এক কবিরাজ আনিলেন। ছাত্রেরা কেহ কেহ দেখিয়া গেল। পালা করিয়া রাত জাগিতেও লাগিল।

সকালে স্কুলের মাষ্টারেরা দেখিতে আসিয়া খবরের কাগজে একটা খুনের সংবাদ শুনাইয়া গিয়াছিল। নারাণবাবু শুইয়া ভাবিতেছিলেন, মানুষে কি করিয়া খুন করে? একবার তিনি এই স্কুলের ঘরেই রাত্রে আলো জ্বালিয়া পড়িতেছিলেন, ডেও পিঁপড়ের দল আসিয়া জুটিল লণ্ঠনের আশেপাশে—চাপড় মারিয়া গোটা তিনেক ডেও পিঁপড়ে মারিয়াছিলেন। তারপর সে কি দুঃখ তাঁর মনে! একটা ডেও পিঁপড়ে আধ-মরা অবস্থায় ঠ্যাং নাড়িয়া চিৎ হইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছিল—সেটাকে বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কিছুতেই সেটাকে বাঁচানো গেল না। নারাণবাবুর মনে হইল, তিনি জীবহত্যা করিয়াছেন—দুঃখ ও অনুতাপে নিজেকে অতি নীচ বলিয়া বিবেচনা হইল। কি জানি, মানুষকে বিচার করার ভার মানুষের উপর নাই—তিনি যে খুনী নহেন, তাহা কে বলিবে?

নারাণবাবু শুইয়া যেন সমস্ত জীবনের একটা ছবি চোখের সামনে খেলিয়া যাইতে দেখিতে পান। তারাজোল গ্রামের উত্তরে প্রকাণ্ড তালদীঘি, তার পাড়ে ঘন তালের বন, কোন কালে রাঢ় অঞ্চলের ঠ্যাঙাড়ে ডাকাতেরা সেই দীঘির পাড়ে মানুষ মারিত। কাঁটাজঙ্গলের ঝোপ, আঁচোড় বাসক ফুলের গাছ নিবিড় হইয়া উঠিয়া মানুষের উগ্র লোলুপতার লজ্জা শ্যামল শান্তি ও বনকুসুমের গন্ধে ঢাকিয়া দিয়াছে। চীনা পর্য্যটক আই সিং যেমন বলিয়াছেন—মন ও অন্তঃকরণের তৃষ্ণা হইতেই দুঃখ আসে, পুনর্জ্জন্ম আসে—কিন্তু তৃষ্ণা দূর কর, লোভকে ঢাকিয়া মনে শান্তিস্থাপন কর। ভ্রমসমুদ্রে মানবাত্মার পরিভ্রমণ শেষ হইবে। না, কী যেন ভাবিতেছিলেন—তারাজোল গ্রামের তালদীঘির কথা। মনের মধ্যে উল্টাপাল্টা ভাবনা আসিতেছে।

পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের সেই হুগলী জেলার অন্তঃপাতী ক্ষুদ্র গ্রামখানি আজ আবার স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়াছে, মুখুয্যেবাড়ীর ছেলে ছুনু ছিল সঙ্গী, ছুনুর সঙ্গে বাঁশতলায় বাঁশের শুকনা খোলা কুড়াইয়া আনিয়া নৌকা করিতেন। একবার তেতুলগাছে উঠিয়া তেঁতুল পাড়িতে গিয়া হাত ভাঙিয়াছিলেন, সাত ক্রোশ হাঁটিয়া দামোদরের বন্যা দেখিতে গিয়া পথে এক গ্রামে কামারবাড়ী রাত্রে তিনি ও তাঁর দুইজন বালক সঙ্গী চিঁড়া দুধ খাইয়া তাহাদের দাওয়ায় শুইয়া ছিলেন—যেন কালিকার কথা বলিয়া মনে হইতেছে। কতকাল তারাজোল যাওয়া হয় নাই।

কেহ নাই আপনার লোক সে গ্রামে। বহুদিন আগে পৈতৃক বাড়ী ভাঙিয়া চুরিয়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছে—আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর আগে তিন দিনের জন্য তারাজোল গিয়া প্রতিবেশীর বাড়ী কাটাইয়া আসিয়াছিলেন—আর যান নাই। তখনই বাল্যদিনের সে বাড়ীঘর জঙ্গলাবৃত ইষ্টকস্তূপে পরিণত হইয়াছিল দেখিয়াছিলেন—হঁ্যা, প্রায় ত্রিশ বৎসর হইবে।

নারাণবাবু মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন—

জ্যোতির্ব্বিনোদ ও যদুবাবু একসঙ্গে ঘরে ঢুকিলেন।

যদুবাবু বলিলেন—কেমন আছেন দাদা? এই দুটো কমলালেবু—ওহে জ্যোতির্ব্বিনোদ, দাও না রস করে—

শ্রীশবাবু উঁকি মারিয়া বলিলেন—কে ঘরে বসে?

যদুবাবু বলিলেন—এই আমরাই আছি—এসো শ্রীশ ভায়া।

—দাদা কেমন?

—এই একটু কমলালেবুর রস খাওয়াচ্ছি—

নারাণবাবুর তৃষিত দৃষ্টি দোরের দিকে চাহিয়া থাকে। দুদিন, তিন দিন, কোনো দিনই চুনিকে দেখিতে পান না। চুনি আসে না কেন? বোধ হয় সে শোনে নাই তাঁহার অসুখের কথা।

সকলে চলিয়া যায়। গভীর রাত্রি। টিম্‌টিম্ করিয়া আলো জ্বলিতেছে।

উত্তর মাঠে গ্রামের বাঁশবনের ও পারে দুটি লোক আকন্দগাছের পাকা ও ফাটা ফল সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতেছে—তুলা বাহির করিয়া খেলা করিবে।

তিনি আর ছুনু। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পুর্ব্বের তারাজোল গ্রাম। ছুনু বাঁচিয়া নাই—প্রায় পঁচিশ বৎসর পুর্ব্বে মারা গিয়াছিল।...

—কে ?

—আমি কমলেশ স্তার, আমাদের নাইট ডিউটি আজ—বিমলও আসছে।

নারাণবাবু বলিলেন—হ্যাঁ কমলেশ, চুনিকে চিনিস ?

—না স্তার।

—থার্ড ক্লাসে পড়ে—ভাল নামটা কি যেন। দীপ্তি বোধ হয়—

—হ্যাঁ স্তার—

—কাল একবার বলবি বাবা—

নারাণবাবু হাঁপাইতে লাগিলেন। কথা বলিবার শ্রম সহ্য হয় না।

—বলবো স্তার—আপনি বেশি কথা বলবেন না—গরম জলটা করি। বালিশটা—

পরদিন সকাল হইতে নারাণবাবু আর মানুষ চিনিতে পারেন না। কমলেশ ও বিমল চুনিকে গিয়া বলিল। চুনি মহাব্যস্ত, আজ তাহাদের পাড়ার ম্যাচ, তাহাকে ব্যাকে খেলিতে হইবে। আচ্ছা, খেলার পর বরং—রাত্রেই সে চেষ্টা করিয়া দেখিবে।

চুনি আসিয়াছিল—কিন্তু নারাণবাবু আর তাহাকে চিনিতে পারেন নাই। লোকে বলিতেছিল, তাঁহার জ্ঞান নাই। সে কথা আসলে ঠিক নয়। তিনি তখন তারাজোল গ্রামের মাঠে, বনে, দামোদরের বাঁধে বাল্যসঙ্গী ছুনু আর গদাই নাপিতের সঙ্গে আকন্দগাছের ফলের তুলা সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত ছিলেন, পঞ্চাশ বৎসর আগের দিনগুলির মত। চুনির কণ্ঠস্বরও তাঁহাকে সেখান হইতে ফিরাইতে পারিল না।

কখনও বা অনুকূলবাবু তাঁহাকে বলিতেছিলেন—নারাণ, মানুষ তৈরি করতে হবে। তুমি আর আমি দুজনে যদি লাগি—বৌবাজারে এই স্কুলের একটা ব্রাঞ্চ খুলবো সামনের বছর থেকে—তুমি হবে এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হেড্ মাষ্টার —সব বেলফলের বিচি থেকে কি চারা হয় ? বহু অপচয়ের অঙ্ক হিসেবে ধরেই ভগবানের এই সৃষ্টি। ভগবানের গৃহস্থালী কৃপণের গৃহস্থালী নয় নারাণ।...

স্কুল মাষ্টারের মধ্যে সবাই তাঁহার খাটিয়া বহন করিয়া নিমতলায় লইয়া গেলো। হেড্ মাষ্টার নিজের পয়সায় ফুল কিনিয়া দিলেন। অনেক ছাত্রও সঙ্গে গেল। শুধু ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুল নয়, আশেপাশে দুই তিনটি স্কুলও এই আদর্শ শিক্ষাব্রতীর মৃত্যুতে একদিন করিয়া বন্ধ রহিল।

যদুবাবু বাজার করিয়া বাসায় ফিরিলেন। স্কুলের সময় হইয়া গিয়াছে। স্ত্রীকে বলিলেন—মাছটা ভেজে দাও, ন'টা বেজে গিয়েছে—আজ একজামিন আরম্ভ হবে কি না? ঠিক টাইমে না গেলে সাহেব বকাবকি করবে।

শীতকালের বেলা। বার্ষিক পরীক্ষা সুরু হইবে বলিয়া যদুবাবু সকালে উঠিয়া বাসায় অতি ক্ষুদ্র দাওয়াটাতে দাড়ি কামাইতে বসিয়াছিলেন—দাড়ি কামানো শেষ করিয়া বাজারে গিয়াছিলেন।

দৈর্ঘ্যে সাত ফুট, প্রস্থে সাড়ে তিন ফুট ঘর—দাওয়ার এক পাশে রান্নাঘর। ঘরের জানালা খুলিলে পিছনের বাড়ীর ইঁট বাহির করা দেওয়াল চোখে পড়ে। ভাগ্যে শীতকাল, তাই রক্ষা—সারা গরমকাল ও বর্ষাকালের ভীষণ গুমটে অধিকাংশ দিন রাত্রে ঘুম হইত না। তাই সাড়ে আট টাকা ভাড়া।

ভাত খাইতে খাইতে যদুবাবু বলিলেন—বাসা বদলাবো, এখানে মানুষ থাকে না—তার ওপর অবনীটা এ বাসার ঠিকানা জানে। ও যদি আবার এসে জোটে—

যদুবাবুর স্ত্রী বলিল—তা অবনী ঠাকুরপো তোমার স্কুলে যাবে—স্কুল তো চেনে। বাসা বদলালে কি হবে—কি বুদ্ধি!

—ওগো, না না। স্কুলে আমাদের যার তার ঢোকবার যো নেই—দরওয়ানকে বলে রেখে দেবো, হাঁকিয়ে দেবে—এ বাড়ীর ভাড়াটাও বেশি।

—এর চেয়ে সস্তা আর খুঁজো না। টিকতে পারবে না সে বাসায়। এখানে আমি যে কষ্টে থাকি। তুমি বাইরে কাটিয়ে এসো, তুমি কি জানবে?

—কলকাতার বাইরে ডায়মণ্ডহারবার লাইনে গড়িয়া কি সোনারপুরে বাসা ভাড়া পাওয়া যায়—সস্তা, কিন্তু ট্রেণভাড়াতে মেরে দেবে।

স্কুলে যাইতে কিছু বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। মিঃ আলম ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া

বলিলেন—ক্লাসে পেপার দেওয়া হয় নি—এত দেরি করে এলেন প্রথম দিনটাতেই ?

একটু পরেই হেড্‌মাষ্টারের টেবিলের সামনে গিয়া যদুবাবুকে দাঁড়াইতে হইল।

সাহেব বলিলেন—যদুবাবু, বড়ই দুঃখের কথা—কাজে আপনার আর মন নেই দেখা যাচ্ছে—

—না স্যার, বাড়ীতে অসুখ—

—ওসব ওজর এখানে চলবে না—মাই গেট ইজ ওপ্‌ন্—যদি আপনার না পোষায়—

—স্যার, এবার আমায় মাপ করুন—আর কখনো এমন হবে না।

ব্যাপার মিটিয়া গেল। যদুবাবু আসিয়া হলে পরীক্ষারত ছেলেদের খবরদারি আরম্ভ করিলেন।

—এই দেবু, পাশের ছেলের খাতার দিকে চেয়ে কি হচ্ছে ?

একটি ছেলে উঠিয়া বলিল—তিনের কোশ্চেনটা স্যার একটু মানে করে দেবেন ?

—কই, দেখি কি কোশ্চেন—এ আর বুঝতে পারলে না ? বুড়ো ধাড়ি, তবে পড়াশুনোর দরকার কি ?

—স্যার, এ ধারে ব্লটিং পেপার পাই নি—একখানা দিয়ে যাবেন—

হেড্‌মাষ্টার একবার আসিয়া চারি দিক্ ঘুরিয়া দেখিয়া গেলেন। গেম টিচার পাশের ঘরে চেয়ারে বসিয়া একখানা নভেল পড়িতেছিল, হেড্‌মাষ্টারকে হলে ঢুকিতে দেখিয়া বইখানা টেবিলে রক্ষিত ছেলেদের বইয়ের সঙ্গে মিশাইয়া দিল। পিছনের বেঞ্চিতে দুটি ছেলে পাশাপাশি বসিয়া বই দেখিয়া টুকিতেছিল, হেড্ মাষ্টারকে পাশের হলে ঢুকিতে শুনিয়া বইখানা একজন ছেলে তাহার সার্টের তলায় পেটকোঁচড়ে বেমালুম গুঁজিয়া ফেলিল।

জিনিষটা এবার গেম্ মাষ্টারের চোখ এড়াইল না—কারণ, তাহার দৃষ্টি আর নভেলের পাতায় নিবদ্ধ ছিল না, ধীরে ধীরে কাছে গিয়া ছেলেটির

পিঠে হাত দিয়া গেম্ টিচার কড়াস্বরে হাঁকিল—কি ওখানে? দেখি, বার করো—

ছেলেটির মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। সে বলিল—কিছু না স্যার—

—দেখি কেমন কিছু না—

বলা বাহুল্য, বই নিছক জড়পদার্থ, যেখানে রাখো, সেখানেই থাকে। টানিতেই বাহির হইয়া পড়িল, ছেলেটি বিষণ্ণমুখে দাঁড়াইয়া এদিক্ ওদিক্ চাহিতে লাগিল। তাহার অপকার্য্যের সাথী পাশের ছেলেটি তখন একমনে খাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিতান্ত ভালমানুষের মত লিখিয়া চলিয়াছে।

দণ্ডায়মান ছাত্রটি হঠাৎ তাহার দিকে দেখাইয়া বলিল—স্যার, ক্ষিতীশও তো এই বই দেখে লিখছিল—

ক্ষিতীশ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—আমি! আমি টুকছিলাম?

গেম্ মাষ্টার বইখানি ক্ষিতীশকে দেখাইয়া বলিলেন—এই বই দেখে তুমিও টুকছিলে?

ক্ষিতীশ অবাক্ হইয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া বইখানির দিকে চাহিয়া রহিল, যেন জীবনে সে এই প্রথম সে-বইখানা দেখিল।

—আমি স্যার টুকবো বই দেখে! আমি!

তাহার মুখের ক্ষুব্ধ, অপমানিত ও বিস্মিত ভাব দেখিয়া মনে হয়, যেন গেম্ মাষ্টার তাহাকে চুরি বা ডাকাতি কিংবা ততোধিক কোন নীচ কার্য্যে অপরাধী স্থির করিয়াছেন।

সুতরাং সে বাঁচিয়া গেল। তাহার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ নাই—এক আসামী ছাত্রের উক্তি ছাড়া—গেম্ মাষ্টার কিছু দেখেন নাই। আসামী হেড্ মাষ্টারের টেবিলের সম্মুখে নীত হইল—সেখানেও সে তাহার সঙ্গীর নাম করিতে ছাড়িল না।

হেড্মাষ্টার হাঁকিলেন—বি এ স্পোর্ট, আর ইউ নট্ অ্যাশেমড্ অফ নেমিং ওয়ান অফ ইওর ক্লাস মেট্স্—কাম এ্যাণ্ড হ্যাভ্ ইট্—

সপাসপ্ বেতের শব্দে আশেপাশের ঘরের ও হলের ছাত্রেরা ভীত ও চকিত দৃষ্টিতে হেড্‌মাষ্টারের আপিস ঘরের দিকে চাহিল।

ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা পড়িল।

পাহারাদার শিক্ষকেরা হাঁকিলেন—ফিফ্‌টিন্ মিনিট্‌স্ মোর—

একটি ছেলে ও-কোণে দাঁড়াইয়া বলিল—স্যার, আমাদের ক্লাসে দেরিতে কোশ্চেন্ দেওয়া হয়েছে—

যদুবাবুই এজন্য দায়ী। তিনি হাঁকিয়া বলিলেন—এক মিনিটও সময় বেশি দেওয়া হবে না—

কারণ, তাহা হইলে আরও খানিকক্ষণ তাঁহাকে সে ক্লাসের ছেলেগুলিকে আগ্‌লাইয়া বসিয়া থাকিতে হয়। ছেলেরা কিন্তু অনেকেই আপত্তি জানাইল। মিঃ আলমের কাছে আপীল রুজু হইল অবশেষে। আপীলে ধার্য্য হইল, সেই ক্লাসের ছেলেরা আরও পনেরো মিনিট বেশি সময় পাইবে। যদুবাবুকে অপ্রসন্নমুখে আরও কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইল।

কেরাণী প্রত্যেক টিচারের কাছে স্লিপ্ পাঠাইয়া দিল—মাহিনা আজ দেওয়া হইবে, যাইবার সময় যে যার মাহিনা লইয়া যাইবেন।

প্রায় সব টিচারই সারা মাস ধরিয়া কিছু কিছু লইয়া আসিয়াছেন—বিশেষ কিছু পাওনা কাহারো নাই। কাটাকাটি করিয়া কেহ বারো টাকা, কেহ পনেরো টাকা হাতে করিয়া বাড়ী ফিরিলেন। ইহার মধ্যে যদুবাবুর অভাব সর্ব্বাপেক্ষা বেশি, তাঁহার পাওনা দাঁড়াইল পাঁচ টাকা কয়েক আনা।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—চা খাবেন নাকি যদুদা? চলুন—

যদুবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—আর চা! যা নিয়ে যাচ্ছি এ দিয়ে স্ত্রীর একজোড়া কাপড় নিয়ে গেলেই ফুরিয়ে গেল।

দুজনে চায়ের দোকানে গিয়া ঢুকিলেন।

ক্ষেত্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—কি খাবেন যদুদা? আর এখন তো স্কুলের মধ্যে আপনিই বয়সে বড়, নারাণবাবু মারা যাওয়ার পরে।

—দেখতে দেখতে প্রায় দু বছর হয়ে গেল। দিন যাচ্ছে না জল যাচ্ছে। মনে হচ্ছে সে দিন মারা গেলেন নারাণদা।

—হেড্ মাষ্টারকে বলে নারাণবাবুর একটা ফটো, কি অয়েলপেন্টিং—

—পাগল হয়েছ ভায়া, পুওর স্কুল, মাষ্টারদের মাইনে, তাই আজ পনেরো বছরের মধ্যে বাড়া তো দূরের কথা, ক্রমে কমেই যাচ্ছে—তাও দু মাস খেটে এক মাসের মাইনে নিতে হয়। এ স্কুলে আবার অয়েলপেন্টিং ঝুলনো হবে নারাণবাবুর— পয়সা দিচ্ছে কে ?

দোকানের চাকর সামনে দু পেয়ালা চা ও টোষ্ট্ রাখিয়া গেল। যদুবাবু বলিলেন—না না—টোষ্ট্ না—শুধু চা—

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—খান দাদা, আমি অর্ডার দিয়েছি, আমি পয়সা দেবো ওর।

—তুমি খাওয়াচ্ছ ? বেশ বেশ—তা হোলে একখানা কেক্ও অমনি—

দুইজনে চা খাইতে খাইতে গল্প করিতেছেন, এমন সময়ে খবরের কাগজের স্পেশাল লইয়া ফিরিওয়ালাকে ছুটিতে দেখা গেল—কি একটা মুখে চীৎকার করিয়া বলিতে বলিতে ছুটিতেছে। ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—কি বলছে দাদা ? কি বলছে ?

দোকানী ইতিমধ্যে কখন্ বাহিরে গিয়াছিল—সে একখানা কাগজ আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল—দেখুন না পড়ে বাবু—জাপান, ইংরাজ আর মার্কিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে—

দুজনেই একসঙ্গে বিস্ময়সূচক শব্দ করিয়া কাগজখানা উঠাইয়া লইলেন। যদুবাবুই চশমাখানা তাড়াতাড়ি বাহির করিয়া পড়িয়া বিস্ময়ের সঙ্গে বলিলেন—অ্যাঁ—এ কি ! এই তো লেখা রয়েছে জাপান এ্যাটাক্স্ পার্ল হারবার—এ কি ! গ্রেট্ ব্রিটেন আর মার্কিন—

যদুবাবু 'গ্রেট্ ব্রিটেন' কথাটা বেশ টানটোন দিয়া লম্বা করিয়া গালভরা ভাবে উচ্চারণ করিলেন।

—উঃ ! গ্রেট ব্রিটেন আর ইউনাইটেড ষ্টেট্স্ অব আমেরিকা !

ক্ষেত্রবাবু, 'ইউনাইটেড ষ্টেট্স্ অব আমেরিকা' কথাটা উচ্চারণ করিতে ঝাড়া এক মিনিট সময় লইলেন। দুজনেই বেশ পুলকিত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন হঠাৎ। কেন, তাহার কোনো কারণ নাই। একঘেয়ে

দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে যেন বেশ একটা নূতনত্ব আসিয়া গেল—নারাণবাবুর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই ইউরোপে যুদ্ধ বাধিয়াছে—এবং এতদিন, আজ প্রায় দুই বৎসর চায়ের আসর নিত্যনূতন যুদ্ধের খবরে মশগুল হইয়া ছিল—কিন্তু আজ এ আবার এক নতুন ব্যাপারের অবতারণা হইল তাহার মধ্যে।

যদুবাবু বলিলেন—আরে, চলো চলো—স্কুলে ফিরে যাই—এত বড় খবরটা দিয়ে যাই সকলকে—

—তা মন্দ নয়, চলুন যদুদা। ওহে, তোমার কাগজখানা একটু নিয়ে যাচ্ছি—দিয়ে যাবো এখন ফেরৎ—

যে স্কুলের বাড়ী ছুটির পরে কারাগারের মত মনে হয়—ইঁহারা মহা উৎসাহে কাগজখানা হাতে করিয়া সেই স্কুলে পুনরায় ঢুকিলেন। মিঃ আলম, শ্রীশবাবু, জ্যোতির্ব্বিনোদ, হেড্‌পণ্ডিত, রামেন্দুবাবু প্রভৃতির এ বেলা ডিউটি। তাঁহাদের মধ্যে সকলেই বিভিন্ন ঘরে পাহারাদারি করিতেছেন—উৎসাহের আতিশয্যে উভয়ে কাগজখানা লইয়া গিয়া একেবারে হেড্‌মাষ্টারের টেবিলে ফেলিয়া দিলেন।

হেড্‌মাষ্টার বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—কি ?

—দেখুন স্যার—জাপান হাওয়াই দ্বীপ আর পার্ল হারবার হঠাৎ আক্রমণ করেছে—মিটমাটের কথা হচ্ছিল—হঠাৎ—

হেড্‌মাষ্টার যেন কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। বলিলেন—কই দেখি ?

খবরটা বিদ্যুদ্বেগে স্কুলের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া গেল। ছেলেরা অনেকে টিচারদের নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিল। স্কুলের অটুট শৃঙ্খলা ভঙ্গ হইয়া বিভিন্ন ঘরে ছেলেদের উত্তেজিত কণ্ঠের প্রশ্ন ও মধ্যে মধ্যে দু একজন শিক্ষকের কড়া সুরে হাঁকডাক শ্রুত হইতে লাগিল।

—এই ! ষ্টপ্‌ দেয়ার ! উইল ইউ ?

—ইউ রমেন—ডোণ্ট বি টকিং—

—হু টক্‌স্‌ দেয়ার ?

ইত্যাদি ইত্যাদি।

যদুবাবু ও ক্ষেত্রবাবু স্কুল হইতে বাহির হইলেন--কিন্তু চায়ের দোকানে কাগজ ফেরৎ দেওয়া হইল না—কারণ, স্কুলের টিচারদের ব্যূহ ভেদ করিয়া কাগজখানা বাহির করিয়া আনা গেল না।

পড়াইতে গিয়া যদুবাবু আজ আর ছেলেকে ক্লাসের পড়া বলিয়া দিতে পারিলেন না। ছেলের বাবা ও কাকাকে জাপানের ও প্রশান্ত মহাসাগরের ম্যাপ দেখাইতে কাটিয়া গেল।

বাসায় ফিরিবার গলিতে বৃদ্ধ প্রতিবেশী মাখন চক্রবর্ত্তী রোয়াকের উপর অন্যান্য উৎসাহী শ্রোতাদের মধ্যে বসিয়া আন্তর্জাতিক রাজনীতির গুহ্য তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন, যদুবাবুকে দেখিয়া বলিলেন—কে, মাষ্টার মশায়? কি ব্যাপার শুনলেন? খিদিরপুরে পাঁচ শো জাপানী গুপ্তচর ধরা পড়েছে জানেন তো?

—সে কি! কই, তা তো কিছু শুনিনি। না বোধ হয়—

চক্রবর্ত্তী মশায় বিরক্তির স্বরে বলিলেন—না কি করে জানলেন আপনি? সব পিঠমোড়া করে বেঁধে চালান দিয়েছে লালবাজারে। যারা দেখে এল, তারা বল্লে।

—কে দেখে এল?

—এই তো এখানে বসে বলছিল—ওই ওপাড়ার—কে যেন—কে হে, স্থরেশ বলে গেল?

শেষ পর্য্যন্ত শোনা গেল, কথাটা কে বলিয়াছে, তাহার খবর কেহই দিতে পারে না।

যদুবাবু বাসায় আসিয়া স্ত্রীকে বলিলেন—শুনেছ, আজ জাপানের সঙ্গে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধ বেধেছে?

—সে কোথায় গো?

—বুঝিয়ে বলি তবে শোনো—ম্যাপ বোঝো? দাঁড়াও, এঁকে দেখাচ্ছি।

—ওগো—আগে একটা কথা বলি শোনো। অবনী ঠাকুরপো এসেছে আজ—

যদুবাবুর উৎসাহ ও উত্তেজনা এক মুহূর্ত্তে নিবিয়া গেল। বলিলেন—অ্যাঁ! অবনী? কোথায় সে?

—আমায় বল্লে, চা করে দাও বৌদি। চা করে দিলাম, তারপর তোমার আসবার দেরি আছে শুনে স'ন্ধের সময় কোথায় বেরুলো—

—তা তো বুঝলাম। শোবে কোথায় ও? বড্ড জ্বালালে দেখছি। এইটুকু তো ঘর—ওই বা থাকে কোথায়, তুমি আমিই বা যাই কোথায়? রাঁধচ কি?

—কি রাঁধবো, তুমি আজ বাজার করবে বল্লে এবেলা। বাজার তো আনলে না, আমি ভাত নামিয়ে বসে আছি। দুটো আলু ছিল, তাতে দিয়েছি—আর কিচ্ছু নেই।

—নেই তো আমি কি জানি? কি আমি কাউকে আসতে বলেছি এখানে?

—তা বল্লে কি হয়।' আসতে কেউ বলেনি, তুমিও না, আমিও না—কিন্তু উপায় কি? নিয়ে এসো কিছু।

যদুবাবু নিতান্ত অপ্রসন্নমুখে বাজার করিতে চলিলেন। তাঁহার মনে আর বিন্দুমাত্র উত্তেজনা ছিল না—এ কি দুর্দ্দৈব! অবনী আবার কোথা হইতে আসিয়া জুটিল?

রাত্রি ন'টার পরে অবনী একগাল হাসিয়া হাজির হইল।

—এই যে দাদা, একটু পায়ের ধূলো—ভাল আছেন বেশ?

—হ্যাঁ ভাল। তোমরা সব ভাল? বৌমা, ছেলেপিলে? নন্তু ভাল? আমি শুনলাম তোমার বৌদিদির মুখে যে, তুমি এসেছ। শুনে তারি খুশি হোলাম। বলি—বেশ, বেশ। কতদিন দেখাটা হয়নি—আছ তো দু একদিন?

—তা দাদা, আমি তো আর পর ভাবিনে। এলাম একটা চাকরী টাকরী দেখতে। সংসার আর চলে না। বলি—যাই, দাদার বাসা রয়েছে। নিজের বাড়ীই। সেখানে থাকি গে, একটা হিল্লে না করে এবার আর হঠাৎ বাড়ী ফিরছি নে। কিছুদিন ধরে কলকাতায় না থাকলে কিছু হয় না।

অবনীর মতলব শুনিয়া যদুবাবুর মুখের ভাব অনেকটা ফাঁসীর আসামীর মত দেখাইল। তবুও ভদ্রতাসূচক কি একটা উত্তর দিতে গেলেন, কিন্তু গলা দিয়া ভাল সুর বাহির হইল না।

আহারাদির পর যদুবাবুর স্ত্রী বলিল—আমি বাড়ীওয়ালার পিসীর সঙ্গে গিয়ে না হয় শুই—তুমি আর অবনী ঠাকুরপো—

যদুবাবু চোখ টিপিয়া বলিলেন—তুমি পাথুরে বোকা। কষ্ট করে শুতে হচ্ছে এটা অবনীকে দেখাতে হবে—নইলে ও আদৌ নড়বে না। কিছু না—ওই এক ঘরেই সব শুতে হবে।

যদুবাবুর আশা টিকিল না। সেই ভাবে হাত পা গুটাইয়া ছোট ঘরে শুইয়া অবনী তিন দিন দিব্য কাটাইয়া দিল।—যাওয়ার নামগন্ধ করে না।

একদিন বলিল—দাদা, চলুন আজ বৌদিদিকে নিয়ে সব সুদ্ধু টকি দেখে আসি। পয়সা রোজগার করে তো কেবল সঞ্চয় করছেন—কার জন্যে বলতে পারেন? ছেলে নেই, পুলে নেই।

যদুবাবু হাসিয়া বলিলেন—তা তোমার বৌদিদিকে তুমি নিয়ে গিয়ে দেখাও না কেন?

—হ্যাঃ, আমার পয়সা কড়ি যদি থাকবে—

অবনী একেবারে নাছোড়বান্দা। অতি কষ্টে যদুবাবু আপাততঃ তাহার হাত এড়াইলেন। কয়েক দিন কাটিয়া গেল। যুদ্ধের খবর ক্রমশই ঘনীভূত। বৈকালে চায়ের মজলিসে ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—শুনেছেন একটা কথা। রেঙ্গুনে নাকি কাল বোমা পড়েছে—

জ্যোতির্ব্বিনোদ বলিলেন—বল কি ক্ষেত্র ভায়া?

—কাগজে এখনো বেরোয় নি—তবে এই রকম গুজব—

শ্রীশবাবু চায়ের পেয়ালা হাতে আড়ষ্ট হইয়া থাকিয়া বলিলেন—আমার ছোট ভগ্নীপতি যে থাকে সেখানে—তাহোলে আজই একটা তার করে—

যদুবাবু ও জ্যোতির্ব্বিনোদ দুজনেই ব্যস্তভাবে বলিলেন, হ্যাঁ ভায়া, দাও—এখুনি একটা তার করা আবশ্যক—

—দাদা, আমার হাতে একেবারে কিচ্ছু নেই—কত লাগে রেঙ্গুনে তার করতে, তাও তো জানিনে—

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—তার জন্যে কি, আমরা সবাই মিলে দিচ্ছি কিছু কিছু—তার তুমি করে দাও ভায়া—দেখি, কার কাছে কি আছে।

যদুবাবু বিপন্নমুখে বলিলেন—আমার কাছে একেবারেই কিন্তু—হাতে কিচ্ছু নেই—

—আচ্ছা, না থাকে না থাক্। আমরা দেখছি—দেখি হে, বিনোদ ভায়া—

সকলের পকেট কুড়াইয়া সাড়ে তিন টাকা হইল। শ্রীশবাবু তাহাই লইয়া ডাকঘরে চলিয়া গেলেন।

যদুবাবু বলিলেন—তাই তো হে, এ হোল কি—[illegible] তো কখনো ভাবিওনি—

ক্ষেত্রবাবু ও জ্যোতির্ব্বিনোদ দুইখানিতে বাহির হইয়া গেলেন। গলির মোড়ে ইংরাজি কাগজের সদ্যপ্রকাশিত সংস্করণ লইয়া ফিরিওয়ালা ছুটিতেছে—ভারি খবর বাবু—ভারি কাণ্ড হয়ে গেল—

ক্ষেত্রবাবু পকেট হাতড়াইলেন—পয়সা আছে দুটি মাত্র। তাহাই দিয়া কাগজ একখানা কিনিয়া দেখিলেন—কাগজে বিশেষ কিছুই খবর নাই। রেঙ্গুনের বোমার তো নামগন্ধও নাই তাহাতে—তবে জাপানী সৈন্য ব্রহ্মের দক্ষিণে টেনাসেরিম প্রদেশে অবতরণ করিয়াছে বটে।

মনটা ভাল নয়, পয়সার টানাটানি। পুনরায় চা এক পেয়ালা খাইলে অবসাদগ্রস্ত মন একটু চাঙ্গা হইত। কিন্তু তার উপায় নাই—এমন সময়ে রামেন্দুবাবুর সঙ্গে দেখা।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—কি, আজ যে চায়ের মজলিসে ছিলেন না।

—না, সাহেবের সঙ্গেই দরকার ছিল। এই তো স্কুল থেকে বেরুলাম।

—যুদ্ধের খবর দেখেছেন। খুব খারাপ।

—কি রকম?

—শুনলাম নাকি রেঙ্গুনে বোমা পড়েছে।

—তা আশ্চর্য্যি নয়! কিন্তু গুজব রটে নানারকম এসময়ে—কাগজে কিছু লিখেছে এবেলা?

যদুবাবুকে কাহার সহিত যাইতে দেখিয়া দুজনেই ডাকিয়া বলিলেন—ওই যে, ও যদু দা, শুনে যান—

যদুবাবুর সঙ্গে অবনী। বাজার করিয়া অবনীকে দিয়া বাসায় পাঠাইয়া দিবেন বলিয়া যদুবাবু তাহাকে লইয়া বহির হইয়াছেন।

—এটি কে যদু দা?

—এ—ইয়ে আমার খুড়তুতো—দেশ থেকে এসেছে—

—বেশ, বেশ। কার কাছে পয়সা আছে? রামেন্দুবাবু?

—আছে। কত?

—সবাই চা খাওয়া যাক্—হবে?

—খুব হবে। চলুন সব।

যদুবাবু বলিলেন—রামেন্দু ভায়ার কাছে চার আনা পয়সা বেশি হতে পারে? বাজার করতে যাচ্ছি কিনা!

রামেন্দুবাবু সকলকে ভাল করিয়া চা ও টোষ্ট খাওয়াইলেন। যদুবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—দাদা, আর কি খাবেন বলুন—কেক্ একখানা দেবে?

—না, ভায়া—বরং একখানা মামলেট্—

—ওহে, বাবুকে একটা ডবল ডিমের মামলেট্ দিয়ে যাও—

চায়ের দোকান হইতে বাহির হইয়া সকলে যে যার টুইশানিতে বাহির হইলেন। যদুবাবু পথে যাইতে যাইতে হঠাৎ দেখিলেন, প্রজ্ঞাব্রত ওপারের ফুটপাত দিয়া যাইতেছে। সে এবার ম্যাট্রিক দিয়া স্কুল হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে, কলেজে ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়ে। কয়েকটি সমবয়সী বন্ধুর সঙ্গে বোধ হয় মাঠের দিকে খেলা দেখিতে যাইতেছে।

যদুবাবু ডাকিলেন—ও প্রজ্ঞাব্রত, ও প্রজ্ঞাব্রত—

প্রজ্ঞাব্রত এদিকে চাহিয়া দেখিল—এবং কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন মুখে ও অনিচ্ছার সহিত এপারে আসিয়া বলিল—কি স্যার?

যদুবাবু সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন—ছেলেটির কি সুন্দর উন্নত

চেহারা, খেলোয়াড়ের মত সাবলীল দেহভঙ্গী, গায়ে সিল্কের হাফ-সার্ট, কাবুলী ধরণের পায়জামার মত করিয়া কাপড় পরা, পায়ে লাল শুঁড়ওয়ালা চটি। স্কুলের নীচের ক্লাসের সে প্রজ্ঞাব্রতই আর নাই।

—ভাল আছ বাবা?

—হ্যাঁ স্যার।

—যাচ্ছ কোথায়?

প্রজ্ঞাব্রত এমন ভাব দেখাইল যে, যেখানেই যাই না কেন—তোমার সে খোঁজে দরকার কি? মুখে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উত্তর দিল—এই একটু ওদিকে—

—হ্যাঁ বাবা, একটা কথা বলবো ভাবছিলাম। তোমাদের বাড়ী একবার যাবো আজই ভেবেছিলাম—তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে। তোমার ভাই দেবব্রতকে আজকাল পড়াচ্ছে কে?

—শিববাবু বলে এক ভদ্রলোক। আপিসে চাকরী করেন—আমাদের বাড়ীর সামনের মেসে থাকেন—

—ক'টাকা দাও?

—দশ টাকা বোধ হয়—কি জানি, ও সব খবর আমি ঠিক জানি নে।

—আমি বলছিলাম কি, আমায় টুইশানিটা করে দাও না কেন। স্কুলের মাষ্টার ভিন্ন ছেলে পড়াতে পারে? আমি তোমাদের স্নেহ করি নিজের ছেলের মত—আমি যেমন পড়াবো—এমনটি কারো দ্বারা হবে না, তা বলে দিচ্ছি—

—কিন্তু এখন তো আমরা সব চলে যাচ্ছি কলকাতা থেকে।

যদুবাবু বিস্ময়ের স্বরে বলিলেন—কলকাতা থেকে? কেন?

—শোনেন নি, জাপানীরা কবে এসে বোমা ফেলবে—এর পরে—রাস্তা ঘাট সব বন্ধ হয়ে যাবে হয় তো। আমরা বুধবারে বাড়ীসুদ্ধ সব যাচ্ছি শিউড়ি, আমার দাদামশায়ের ওখানে। আমাদের পাড়ার অনেকে চলে যাচ্ছে।

—তাই নাকি

প্রজ্ঞাব্রত অধীর ভাবে বলিল—কেন, আপনি কাগজ দেখেন না? হাওড়া ষ্টেশনে গেলেই বুঝবেন, লোক অনেক চলে যাচ্ছে। আচ্ছা, আসি স্যার—

—আচ্ছা বাবা, বেঁচে থাক বাবা।

প্রজ্ঞাব্রত চলিয়া গিয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।—দেখ দেখি বিপদ্! যাইতেছি বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াইতে, রাস্তার মাঝখানে ডাকিয়া অনর্থক সময় নষ্ট—কে এখন বুড়ামানুষের সঙ্গে বকিয়া মুখ ব্যথা করে। মানুষের একটা কাণ্ডজ্ঞান তো থাকা দরকার, এই কি ডাকিয়া গল্প করিবার সময় মশায়?

যদুবাবু কিন্তু অন্য রকম ভাবিতেছিলেন। প্রজ্ঞাব্রতের কথায় তিনি একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। কলিকাতা হইতে লোক পালাইতেছে জাপানী বিমানের ভয়ে? তবে কি জাপানী বিমান এত নিকটে আসিয়া পড়িল?

ছোট একটা টুইশানি ছিল। ভাবিতে ভাবিতে যদুবাবু ছাত্রের বাড়ী গিয়া উঠিলেন। দুটি ছেলে, রিপন স্কুলে পড়ে—ইহাদের জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে যদুবাবু এক সময়ে কলেজে পড়িয়াছিলেন, সেই সুপারিশেই টুইশানি। যদুবাবু গিয়া দেখিলেন, বাহিরের ঘরে আলো জ্বালা হয় নাই। ডাকিলেন—ও হরে, নরে—ঘর অন্ধকার কেন?

হরেন নামক ছাত্রটি ছুটিয়া দরজার কাছে আসিয়া বলিল—স্যার?

—আলো জ্বালিস্ নি যে বড়?

—স্যার, আজ আর পড়বো না—

—কেন রে?

—আমাদের বাড়ীর সবাই কাল সকালের গাড়ীতেই দেশে চলে যাচ্ছে—মা, জেঠীমা, দুই দিদি, সবাই যাবে। জিনিষপত্র বাঁধাছাঁদা হচ্ছে, বড় ব্যস্ত সবাই। আজ আর—আপনি চলে যান স্যার।

অন্য দিন টুইশানির পড়া হইতে রেহাই পাইলে যদুবাবু স্বর্গ হাতে পাইতেন—কিন্তু আজ কথাটা তেমন ভাল লাগিল না।

যদুবাবু বলিলেন—তোরাও যাবি নাকি?

—একজামিনের এখনও দুদিন বাকি আছে—একজামিন হয়ে গেলে আমরাও যাবো।

—কোথায় যেন তোদের দেশ?

—গড়বেতা, মেদিনীপুর।

—আচ্ছা, চলি তা হোলে।

আজ খুব সকাল। সবে সন্ধ্যা হইয়াছে। এ সময় বাড়ী ফেরা অভ্যাস নাই। বিশেষতঃ এখনি সে কোটরে ফিরিতে ইচ্ছাও করে না—তার উপর অবনী রহিয়াছে, জ্বালাইয়া মারিবে।

ক্রীক্ লেনে এক বন্ধুর বাড়ী ছুটি-ছাটার দিন যদুবাবু সন্ধ্যাবেলা গিয়া চা-টা-আস্‌টা খান, গল্প-গুজব করেন। ভাবিতে ভাবিতে সেখানেই গিয়া পৌঁছিলেন।

বন্ধু বাহিরের ঘরে বসিয়া নিজের ছেলেদের পড়াইতেছেন। যদুবাবুকে দেখিয়া বলিলেন—এসো ভায়া। বসো—আজ অসময়ে যে? ছেলে পড়াতে বেরোও নি?

—সেখান থেকেই আসছি—

একটু চা করতে বলে আয় তো তোর কাকাবাবুর জন্যে। আমার আবার বাড়ীর সবাই কাল যাচ্ছে মধুপুর। সব ব্যস্ত রয়েছে। বাঁধা-ছাঁদা—

যদুবাবুর বুকের মধ্যে ছাঁৎ করিয়া উঠিল। বলিলেন—কেন? কেন?

—সবাই বলছে, জাপানীরা যে-কোনো সময়ে নাকি এয়ার রেড্ করতে পারে—তাই মেয়েদের সরিয়ে দিচ্ছি।

যদুবাবুর মনে বড় ভয় হইল, জিজ্ঞাসা করিলেন—কে বল্লে?

—বল্লে কেউ না। কিন্তু গতিক সেই রকমই—এর পরে রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে যাবে।

—বল কি!

—তাই তো সবাই বলছে। কলকাতা থেকে অনেকে যাচ্ছে চলে। হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে দেখ লোকের ভিড়।

যদুবাবু আর সেখানে না দাঁড়াইয়া বাড়ী চলিয়া আসিলেন। বাসার দরজায় দেখিলেন, দুখানি ঘোড়ার গাড়ী দাঁড়াইয়া। বাড়ীওয়ালার বড় ছেলে ধরাধরি করিয়া বিছানার মোট ও ট্রাঙ্ক গাড়ীর মাথায় উঠাইতেছে।

যদুবাবু বলিলেন—এ সব কি হে যতীন, কোথায় যাচ্ছ ?

যতীন বাইশ তেইশ বছরের ছোকরা, কলেজে পড়ে। বলিল—ও, আমরা দেশে যাচ্ছি মাষ্টার মশায়। সকলে বলছে, কলকাতাটা এ সময় সেফ্ নয়··· তাই মা আর বৌদিদিদের—

—তুমি, তোমার বাবা, এরাও নাকি ?

—আমি পৌছে দিয়ে আবার আসবো। কি জানেন, পুরুষ মানুষ আমরা —দৌড়ে একদিকে পালাতেও পারবো। হাই এক্সপ্লোসিভ্ বম্ব্ পড়লে এ বাড়ীঘর কিছু কি থাকবে ভাবছেন ? বোমার ঝাপ্টা লেগেই মানুষ দম ফেটে মারা যায়। সে সব অবস্থায়—

যদুবাবুর পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। বলিলেন—বলো কি—

—বলি তো তাই। গবর্ণমেণ্ট বলছে, একখানা করে পেতলের চাক্তিতে নামধাম লিখে প্রত্যেকে পকেটে করে যেন বেড়ায়। এয়ার রেডের পরে ওইখানা দেখে ডেড্ বডি সনাক্ত করা—

যদুবাবুর তালু শুকাইয়া গিয়াছে। এখনই যেন তাঁহার মাথায় জাপানী বোমা পড় পড় হইয়াছে।

বলিলেন—আচ্ছা যতীন, তোমরা তো ইয়ং ম্যান, পাঁচ জায়গায় বেড়াও। তোমার কি মনে হয়—বোমা কি শীগ্গির পড়তে পারে ?

—এনি মোমেণ্ট পড়তে পারে। আজ রাতেই পড়তে পারে। রেড্ করবার কি সময় অসময় আছে ?

—তাই তো !

যদুবাবু নিজের ঘরে ঢুকিতেই তাঁহার স্ত্রী তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন—হ্যাঁ গা, হিম হয়ে তো বসে আছ—এদিকে ব্যাপার কি শোননি ? আজ রাত্রে নাকি জাপান বোমা ফেলবে কলকাতায়। বাড়ীওয়ালারা সব পালাচ্ছে—পাশের বাড়ীর মটরের বৌ আর মা চলে গিয়েছে দুপুরের গাড়ীতে। আমি কাঠ হয়ে বসে আছি—তুমি কখন্ ফিরবে। কি হবে, হ্যাঁ গা, সত্যি সত্যি আজ কিছু হবে না কি ?

যদুবাবু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলিলেন—হ্যাঃ—ভারি—কোথায় কি, তার ঠিক নেই।

ভাবিলেন, মেয়েদের সামনে সাহস দেখানই উচিত—নতুবা মেয়েমানুষ হাউমাউ করিয়া উঠিবে।

—হ্যাঁ গা, বাইরে আজ এত অন্ধকার কেন?

—আজ ব্ল্যাক-আউট একটু বেশি। রাস্তার অনেক গ্যাসই নিবিয়ে দিয়েছে।

—তবুও তুমি বলছ—কোনো ভয় নেই?

এমন সময় অবনী আসিয়া ডাকিল—দাদা ফিরেছেন?

—হ্যাঁ, এসো।

—আচ্ছা, দাদা—আজ রাস্তা এত অন্ধকার কেন?

—ও, আজ রাত দশটার পরে কম্‌প্লিট্‌ ব্ল্যাক-আউট। মানে—রাস্তার সব আলো নিবুনো থাকবে।

—কেন?

—তুমি কিছু শোনোনি? যুদ্ধের খবর?

—না—কি?

যদুবাবুর মাথায় একটা বুদ্ধি আসিয়া গেল। বলিলেন—শোনোনি তুমি? জাপানীরা যে, যে-কোনো সময় এয়ার রেড্‌—মানে বোমা ফেলতে পারে। সব লোক পালাচ্ছে—আজ বাড়ীওয়ালা চলে গেল—আমার ছাত্রেরা চলে গেল—সব পালাচ্ছে। হয় তো আজ রাত্রেই ফেলতে পারে বোমা—কে জানে? এখন একটা কথা। তুমি তোমার বৌদিদিকে কাল নিয়ে যাও দেশে। আমি তো এখানে আর রাখতে সাহস করিনে—

অবনী পাড়াগেঁয়ে ভীতু লোক। তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। দাদার বাসায় স্ফূর্ত্তি করিতে আসিয়া এ কি বিপদে পড়িয়া গেল সে—

বলিল—হ্যাঁ দাদা—আজ কাগজে কি দেখলেন? জাপান কি কাছাকাছি এলো?

—তা কাছাকাছি বই কি। মোটের ওপর আজ রাতেই বোমা পড়া বিচিত্র নয়—জেনে রাখো।

—তাই তো!

—তুমি তা হোলে কাল সকালেই তোমার বৌদিদিকে নিয়ে যাও—

—তা—তা দেখি।

অবনী গুম্ খাইয়া গিয়া আপন মনে কি খানিকটা ভাবিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল—হ্যাঁ দাদা, সত্যি সত্যি আজ রাতে কিছু হতে পারে?

—কথার কথা বলছি। হতে পারবে না কেন—খুব হতে পারে। বাধা কি? তুমি বোসো—আমি দু ভাঁড় দই নিয়ে আসি।

যদুবাবুর স্ত্রী কি কাজে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া দেখিল, অবনী নিজের ছোট্ট টিনের স্যুটকেশ্‌টি খুলিয়া কাপড়চোপড় বাহিরে নামাইয়া আবার তুলিতেছে। তাহাকে দেখিয়া বলিল—বৌদিদি, আমার গামছাখানা কোথায়?

আহারাদির পরে যদুবাবু অবনীর সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। এখানে তিনি স্ত্রীকে আর রাখিতে চান না। কাল দুপুরে অবনী তাহাকে লইয়া যাক

অবনী নিমরাজি হইল।

সকালে উঠিয়া ঘরের দোর খুলিয়া দালানে পা দিয়া যদুবাবু দেখিলেন, অবনীর বিছানাটি গুটানো আছে বটে, কিন্তু সে নাই। অবনীকে ডাকিয়া তুলিতে হয়—অত সকালে তো সে ওঠে না! কোথায় গেল?

অবনী আর দেখা দিল না। টিনের স্যুটকেশ্‌টি কখন্ সে রাত্রে মাথার কাছে রাখিয়াছিল, ভোরে উঠিয়া গিয়াছে—কি রাতেই পালাইয়াছে—তাহারই বা ঠিক কি?

পরদিন স্কুলে শিক্ষকদের মধ্যে একটা উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য দেখা গেল। ক্ষেত্রবাবুর বাসার আশেপাশে যাহারা ছিল, সকলেই নাকি কাল বাসা ছাড়িয়া পালাইয়াছে। ক্ষেত্রবাবু স্ত্রীকে লইয়া তেমন বাসায় কি করিয়া থাকেন। যদুবাবুর বিপদ্ আরও বেশি, তাঁহার যাইবার জায়গা নাই। জ্যোতির্ব্বিনোদের

বাড়ী হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, কলিকাতায় আর থাকিবার আবশ্যক নাই, এখনি চলিয়া এস, প্রাণ বাঁচিলে অনেক চাকুরী মিলিবে। হেড্‌মাষ্টার মিটিং করিলেন—অভিভাবকেরা চিঠি লিখিতেছে, স্কুলের প্রমোশন তাড়াতাড়ি দেওয়া হউক—ছেলেরা সব বাহিরে যাইবে—এ অবস্থায় মাষ্টারদের কাছে যে সমস্ত পরীক্ষার খাতা আছে, সেগুলি যত শীঘ্র হয়, দেখিয়া ফেরৎ দেওয়া উচিত।

মিঃ আলম বলিলেন—অনেক ছেলে ট্রান্সফার চাইছে, কি করা যায়?

সাহেব বলিলেন—একে স্কুলে ছেলে নেই, এর উপর ট্রান্সফার নিলে স্কুল টিকবে না। তার চেয়েও বিপদ্ দেখছি, মাইনে তেমন আদায় হচ্ছে না। বড়দিনের ছুটির আগে মাইনে দেওয়া যাবে না।

যদুবাবু উদ্বিগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—দেওয়া যাবে না স্যার?

—না।

—নভেম্বর মাসের মাইনে হয় নি এখনও। আমরা কি করে চালাবো স্যার, একটু বিবেচনা করুন। দু মাসের মাইনে যদি বাকি থাকে—

সাহেব হাসিয়া বলিলেন—আমায় বলা নিষ্ফল, আমি ঘর থেকে আপনাদের মাইনে দেবো না তো? না পোষায় আপনার, চলে যাওয়াতে আমি বাধা দেবো না—মাই গেট ইজ অল্‌ওয়েজ ওপ্‌ন্—

রামেন্দুবাবুকে সব মাষ্টারে মিলিয়া ধরিল। অন্ততঃ নভেম্বর মাসের দরুন কিছু না দিলে চলে কিসে? যদুবাবু কাতর স্বরে জানাইলেন, তিনি সম্পূর্ণ নিরুপায়, এ বিপদ্‌কালে কোথায় গিয়া উঠিবেন ঠিক নাই, হাতে পয়সা নাই, টুইশানির মাহিনা আদায় হয় কি না হয়, টুইশানি থাকিবে কি না, তাহারও স্থিরতা নাই—কারণ, ছেলেরা অন্যত্র যাইতেছে। কতদিনে তারা আসিবে কে জানে? টুইশানি না থাকিলে একেবারেই অচল।

রামেন্দুবাবুকে সাহেব বলিলেন—অবস্থা কি রকম বলে মনে হয়?

—কিছুই বুঝতে পারছি নে স্যার।

—এবার জানুয়ারী মাসে নতুন ছাত্র বেশি পরিমাণে ভর্ত্তি না হোলে স্কুল চলবে না। তারপর এই গোলমাল—

—ও কিছু না স্যার, জানুয়ারী মাসে সব ঠিক হয়ে যাবে।

—হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে। এ একটা হুজুগ—কি বল? ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের রাজ্যে আবার বাইরের শত্রুর ভয়!

—হুজুগ বই কি স্যার। পিওর হুজুগ। ও কিছু না। একটা কথা—

—কি?

—মাষ্টারদের মাইনে কিছু কিছু দিতেই হবে স্যার।

—কোথা থেকে দেবো? মাইনে আদায় নেই। তবে নিতান্ত ধরছে—দাও কিছু কিছু। আর একটা কথা, যে সব ছেলে ট্রান্সফারের দরখাস্ত করেছে, তাদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে অভিভাবকদের অনুরোধ করতে হবে, যেন তাদের ছাড়িয়ে না নিয়ে যায়। ক্লাস এইটের একটা ছেলে, নাম সুধীর দত্ত—তার বাড়ী সন্ধ্যার পরে একবার যেও।

সন্ধ্যায় সুধীর দত্তের বাড়ী রামেন্দুবাবু অভিভাবককে ধরিতে যাইয়া বেশ দু'কথা শুনিলেন। ছেলেটি এবার প্রমোশন পায় নাই। ছেলের অভিভাবক চটিয়া খুন, ছেলে তিনি ও স্কুলে আর রাখিতে চান না। তিনি স্কুল ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন—অনুরোধ বৃথা।

রামেন্দুবাবু বলিলেন—কেন, কি অসুবিধে হোল এ স্কুলে বলুন—আমি গ্যারাণ্টি দিচ্ছি, তা দূর করে দেওয়া হবে।

—পড়াশুনো কিছু হয় না মশাই আপনাদের স্কুলে। ওদের ক্লাসে যদুবাবু বলে একজন মাষ্টার পড়ান, একেবারে ফাঁকিবাজ। কিছু করান না ক্লাসে।

—আপনি ও রকম নাম করে বলবেন না। ছেলেদের মুখে শুনে বিচার করা সব সময়ে ঠিক নয়। এবার আমি বলছি, ওর পড়াশুনো আমি নিজে দেখবো।

—তা, ওরা তো কাল যাচ্ছে নবদ্বীপে। ওর মাসীর বাড়ী। কবে আসবে ঠিক নেই। হ্যাঁ মাষ্টারবাবু, এ হাঙ্গামা কত দিন চলবে বলতে পারেন?

—বেশি দিন চলবে বলে মনে হয় না।

—সুধীরকে জানুয়ারী মাসে ক্লাসে উঠিয়ে দেন যদি, তবে ট্রান্সফার এবার না হয় থাক্‌।

—তাই হবে। ওকে ক্লাস নাইনে উঠিয়ে দেওয়া যাবে।

রামেন্দুবাবু হৃষ্টমনে ফিরিতেছিলেন ; কারণ, কর্তব্য নিখুঁত ভাবে সম্পাদন করিবার একটা আনন্দ আছে। পথের ধারে এক স্থানে দেখিলেন, অনেকগুলি লোক জটলা করিয়া উঁচু মুখে কি দেখিতেছে। রামেন্দুবাবু গিয়া বলিলেন—কি হয়েছে মশায় ?

একজন আকাশের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—দেখুন তো স্যার, ওই একখানা এরোপ্লেন—ওখানা যেন কি রকমের না ?

রামেন্দুবাবু কিছু দেখিতে পাইলেন না। বলিলেন—কই মশায়, কিছু তো—

দুই তিন জন অধীর ভাবে বলিল—আঃ, দেখতে পেলেন না ? এই ইদিকে সরে আসুন—ঐ—ঐঃ—

তবু রামেন্দুবাবু দেখিতে পাইলেন না—একটা নক্ষত্র তো ওটা—

সবাই বলিয়া উঠিল—ওই মশায়, ওই। নক্ষত্র দেখেছেন তো একটা ? ওই। ও নক্ষত্র নয়—জাপানী বিমান।

রামেন্দুবাবু সাহসে ভর করিয়া বলিলেন—কিন্তু নক্ষত্র তো আরও অনেক—

লোকগুলি রামেন্দুবাবুর মূঢ়তা দেখিয়া দস্তুরমত বিরক্ত হইল। একজন বলিল—আচ্ছা, ওটা কি নক্ষত্র ? নীল মত আলো দেখলেন না ? চোখের জোর থাকা চাই। ও হোল সেই—বুঝলেন ? চুপি চুপি দেখতে এসেছে—

আর একজন চিন্তিত মুখে বলিল—তাই তো, এ যে ভয়ানক কাণ্ড হোল দেখছি—

পূর্ব্বের লোকটি বলিল—কলকাতায় থাকা আর সেফ্‌ নয় জানবেন আদৌ—

সবাই তাহাতে সায় দিয়া বলিল—সে তো আমরা মানি। যে-কোন সময়, এনি মোমেণ্ট বোমা পড়তে পারে।

রামেন্দুবাবু সে স্থান হইতে সরিয়া পড়িলেন।

পরদিন স্কুলে মাষ্টারদের মধ্যে যথেষ্ট ভয় ও চাঞ্চল্য দেখা গেল। যে, যে পাড়ায় থাকেন, সেই সেই পাড়া প্রায় খালি হইতে চলিয়াছে, মাষ্টারদের মধ্যে অনেকের যাইবার স্থান নাই।

যদুবাবু চায়ের মজলিসে বলিতেছিলেন—সবাই তো যাচ্ছে, আমি যে কোথায় যাই।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—আমারও তাই দাদা। আমার গ্রামে বাড়ীঘর সারানো নেই—কত কাল যাইনি। সেখানে গিয়ে ওঠা যাবে না।

—তবুও তোমার তো আস্তানা আছে ভায়া—আমার যে তাও নেই। চিরকাল বাসায় বাসায় থেকে বাড়ীঘর সব গিয়েছে—এখন যাই কোথায়?

জ্যোতির্বিবনোদ বলিল—আমার বাড়ী থেকে টেলিগ্রাম এসেছে, চিঠির পর চিঠি আসছে—বাড়ী যাবার জন্যে। বাড়ী থেকে লিখছে, চাকরী ছেড়ে দিয়ে চলে এসো।

হেড্ পণ্ডিত বলিলেন—কাল শেয়ালদা ইষ্টিশানে কি ভিড় গিয়েছে হে! গাড়ীতে উঠতে পারি নে—বুড়ো মানুষ, কত কষ্টে যে ঠেলে ঠুলে উঠলাম—

স্কুল বন্ধ হোলে যে বাঁচি। সাহেবকে সবাই মিলে বলা যাক, স্কুল বন্ধ করবার জন্যে।

সারারাত্রি ধরিয়া গাড়ীঘোড়ার শব্দ শুনিয়া যদুবাবু বিশেষ 'নার্ভাস' হইয়া উঠিয়াছিলেন। পাড়াসুদ্ধ লোক বিছানা বোঁচকা বাঁধিয়া হয় হাওড়া, নয় শেয়ালদ' ষ্টেশনে ছুটিতেছে—কে বলিতেছিল, ঘোড়ার গাড়ীর ভাড়া অসম্ভব ধরণে বৃদ্ধি পাইতেছে।

জ্যোতির্বিবনোদ বলিল—কোনো ভয় নেই দাদা। বোঁচকা মাথায় নিয়ে ঠেলে উঠবো ইষ্টিশানে—আমরা বাঙাল মানুষ, কিছু মানিনে।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—আস্‌সিংড়ি চলে যাই ভাবছি—ভাঙা ঘরে গিয়ে আপাতত উঠি। এখানে থাকলে এর পরে আর বেরুতে পারবো না—

যদুবাবু সভয়ে বলিলেন—তাই তো, কি যে করি উপায়!

—কালই সাহেবকে আগে গিয়ে ধরা যাক—স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হোক।

ক্ষেত্রবাবু চায়ের দোকান হইতে বাহির হইয়া ধর্ম্মতলার মোড়ে আসিলেন। দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে দু-তিনখানি ঘোড়ার গাড়ী ছাদের ওপর বিছানার মোট চাপাইয়া শেয়ালদ' ষ্টেশনের দিকে চলিয়া গেল। ক্ষেত্রবাবু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন—আস্‌সিংড়ি গ্রামে যাইবেন বটে—কিন্তু সেখানে বাড়ীঘরের অবস্থা কি রকম আছে, তাহার ঠিক নাই। আজ পাঁচ ছ'বছর পূর্ব্বে নিভাননী বাঁচিয়া থাকিতে সেই একবার গিয়াছিলেন—তাহার পর আর যাওয়া ঘটে নাই। কোনো খবরও লওয়া হয় নাই—কারণ, এতদিন প্রয়োজন ছিল না।

একটিমাত্র টুইশানি অবশিষ্ট ছিল, সেখানে গিয়া দেখা গেল, আজ বৈকালে তাহারাও দেশে চলিয়া গিয়াছে। বাড়ীর কর্ত্তা আপিসে চাকুরী করেন। বলিলেন—মাষ্টার মশায়, আপনার এ মাসের মাইনেটা আর এখন দিতে পারছি নে—খরচপত্র অনেক হয়ে গেল কিনা! জানুয়ারী মাসে শোধ করবো—

—আমায় না দিলে হবে 'না বোস মশায়—ফ্যামিলি আমাকেও দেশে নিয়ে যেতে হবে—

—তা তো বুঝতে পারছি। এখন কিছু হবে না—

ক্ষেত্রবাবুর রাগ হইল। এখানে দুমাসের কমে এক মাসের মাহিনা কোনো দিনই দেয় না—তাও আজ পাঁচ টাকা, কাল দুটাকা। নিতান্ত নিরুপায় বলিয়াই লাগিয়া থাকা। কিন্তু এই বিপদের সময় এত অবিবেচনার কাজ করিতে দেখিলে মানুষের মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—না বোস্ মশায়, এ সময় আমায় দিতেই হবে। দুমাস ধরে ছাত্র পড়ালাম, ছেলে ক্লাসে উঠলো—এখন বলছেন আমার মাইনে দেবেন না! তা হয় না—

বসু মহাশয়ও চটিয়া উঠিয়া বলিলেন—মশাই, এত কাল তো পড়িয়েছেন—মাইনে পান নি কখনো বলতে পারেন কি? যদি এ মাসটাতে ঠিক সময়ে নাই দিতে পারি—

—ঠিক সময়ে কোনো দিনই দেন নি বোস মশায়—ভেবে দেখুন। তাগাদা করলে কোনো মাসেই দেন নি—

—বেশ মশাই, না দিয়েছি তো না দিয়েছি। মাইনে পাবেন না এখন। আপনি যা পারেন, করুন গিয়ে—

ক্ষেত্রবাবু ভদ্রস্বভাবের লোক, টুইশানির মাহিনা লইয়া একজন বৃদ্ধ ব্যক্তির সহিত ঝগড়া করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার হইল না। কিছু না বলিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া আসিলেন। কলিকাতায় বাড়ী আছে, আপিসে মোটা চাকুরীও করেন শোনা যায়—অথচ এই তো সব বিচার! ছিঃ—

অন্যমনস্ক ভাবে গলির মোড়ে আসিতেই ব্ল্যাক-আউটের কলিকাতায় কাহার সঙ্গে ঠোকাঠুকি হইল।

ক্ষেত্রবাবু বলিয়া উঠিলেন—মাপ করবেন মশাই, দেখতে পাইনি—ছুটো গ্যাসই নিবিয়েছে—

লোকটি বলিল—কে, ক্ষেত্রবাবু নাকি?

—ও! রাখালবাবু?

—আমিই। ভালই হোল, দেখা হোল এ ভাবে। আপনাদের স্কুলে কাল যাবো ভাবছিলাম—

—ভাল আছেন মিত্তির মশায়?

—আমাদের আবার ভাল মন্দ। বই দিয়ে এসেছি পাঁচ-ছটা স্কুলে—এখন ধরায় যদি, তবে বুঝতে পারি। আপনাদের স্কুলে আমার সেই নব ব্যাকরণবোধখানা ধরানোর কি করলেন? চমৎকার বই। ক্লাস ফাইভ আর ফোরের উপযুক্ত বই। সন্ধি আর সমাস যে ভাবে ওতে দেওয়া—বইয়ের লিষ্ট হয়েছে আপনাদের?

—এখনও হয় নি।

—কেন, প্রোমোশন হয় নি? তবে বইয়ের লিষ্ট হয় নি কেমন কথা?

—না, প্রমোশন হবে বুধবারে। শুক্রবারে ছুটি হবে।

—আমার বইয়ের কি হোল?

—হেড্মাষ্টারের কাছে দেওয়া হয়েছে—কি হয়, বলতে পারি নে।

—আমার যে এদিকে অচল ক্ষেত্রবাবু। এই অবস্থায় প্রায় দেড় শো টাকা ধার করে বই ছাপালাম। প্রেসের দেনা এখনও বাকি। দপ্তরীর দেনা তো

আছেই। বাসাভাড়া তিন মাসের বাকি। বই যদি না চলে, তবে খেতে পাবো না ক্ষেত্রবাবু। আপনারাই ভরসা।

—বুঝলাম সবই রাখালবাবু। কিন্তু এ তো আর আমার হাতে নয়! আমি যতদূর বলবার বলেছি।

কথার মধ্যে সত্যের কিছু অপলাপ ছিল। ক্ষেত্রবাবু বলেন নাই। রাখাল মিত্তিরের বই আজকাল অচল, তবুও হয় তো চলিত—কিন্তু বড় বড় প্রকাশকের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া বই চালানো রাখাল মিত্তিরের কর্ম্ম নয়। তাহারা লাইব্রেরির জন্য বিনা মূল্যে কিছু বই দেয়, প্রাইজের সময় বই কিনিলে মোটা কমিশন দেয়।

রাখাল মিত্তির ক্ষেত্রবাবুর পিছু ছাড়ে না। বলিল, আসুন না আমার ওখানে, একটু চা খাবেন—

শেষ পর্য্যন্ত যাইতেই হইল—নাছোড়বান্দা রাখাল মিত্তিরের হাতে পড়িলে না গিয়া উপায় নাই। সেই ছোট একতালার কুঠুরী। এই অগ্রহায়ণ মাসেও যেন গরম কাটে না। একখানা নীচু কেওড়া কাঠের তক্তপোষের ওপর মলিন বিছানা। কেরোসিন কাঠের একটা আলমারি-ভর্ত্তি বই। ঘরখানা আগোছালো, অপরিষ্কার, মেজের ওপরে পড়িয়া আছে দুটো ময়লা ছেঁড়া জামা ছেলেপুলেদের—এক বোঝা আঠা, একটা আলকাতরা-মাখানো মালসা।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—কি বই রাখালবাবু, আলমারিতে ?

—দেখবেন ? এ সব বই—এই দেখুন—

রাখালবাবু সগর্ব্বে বই নামাইয়া দেখাইতে লাগিলেন।

এই দেখুন প্রকৃতিবোধ অভিধান। পুরোনো বইয়ের দোকান থেকে তিন টাকায়—আর এই দেখুন মুগ্ধবোধ—মশাই, সংস্কৃত ব্যাকরণ না পড়লে কি ভাষার ওপর দখল দাঁড়ায় ? সহর্ণৈর্ঘঃ থেকে আরম্ভ করে সব সূত্র তিনটি বছর ধরে মুখস্থ করে মুখ ভোঁতা হয়ে গিয়েছে, তাই আজ দু-এক পয়সা করে খাচ্ছি। রাখাল মিত্তিরের ব্যাকরণের ভুল ধরে, এমন লোক তো দেখিনে। গোয়ালটুলি স্কুলের হেড্‌পণ্ডিত সে দিন বল্লে—মিত্তির মশাই, আপনার

ব্যাকরণ পড়লে ছেলেদের সন্ধি আর সমাস গুলে খাওয়া হয়ে গেল। পড়া চাই—পেটে বিদ্যে না থাকলে—

—আপনার বই ধরিয়েছে নাকি ?

—না, হেড্‌মাষ্টার বল্লে, শশিপদ কাব্যতীর্থের ব্যাকরণ আর বছর থেকে রয়েছে ক্লাসে। এ বছর যুদ্ধের বছরটা, বই বদলাতে গার্জেনরা আপত্তি করে—তাই এবছর আর হোল না। সামনের বছর থেকে নিশ্চয়ই দেবে।

একটি বারো তেরো বছরের রোগা মেয়ে, একটা থালায় দুটি আংটা-ভাঙা পেয়ালা বসাইয়া চা আনিল। রাখালবাবু বলিলেন—ও পাঁচি,—এটি আমার ভাগ্নী, আমার যে বোন এখানে থাকে, তার মেয়ে—প্রণাম করো মা, উনি ব্রাহ্মণ—

—আহা, থাক থাক—এসো মা—হয়েছে—কল্যাণ হোক—বেশ মেয়েটি—

—অসুখে ভুগছে। বর্দ্ধমানে দেশ, কেউ নেই—এবার এক জ্ঞাতি কাকা নিয়ে গিয়েছিল, ম্যালেরিয়ায় ধরেছে। যাও মা, দুটো পান নিয়ে এসো তোমার মামীমার কাছ থেকে—চা মিষ্টি হয়েছে ? চিনি নেই, আখের গুড় দিয়ে—

—না না, বেশ হয়েছে।

দুধচিনিবিহীন বিস্বাদ চা, তামাকমাখা গুড়ের গন্ধ, এক চুমুক খাইয়া বাকিটুকু গলাধঃকরণ করিতে ক্ষেত্রবাবুর বিশেষ কসরৎ করিতে হইল।—

রাখালবাবু বলিলেন—তা তো হোল, কি হাঙ্গামা বলুন দিকি। পাড়া যে খালি হয়ে গেল অর্দ্ধেক—

—আপনাদের এ পাড়াতেও—

—হ্যাঁ মশাই, আশেপাশে লোক নেই। সব পালাচ্ছে। পাশের বাড়ীর ঘোষালেরা আজ সকালে সব পালালো...এখন ওরা বড়লোক, এই দিন-কতক আগেও পুতুলের বিয়েতে হাজার টাকা খরচ করেছে। ফুলশয্যের তত্ত্ব করেছিল, দশ জন ঝি চাকর মাথায় করে নিয়ে গেল, যায় রূপোর দান-সামগ্রী, খাট বিছানা এত্তোক! ওদের কথা বাদ দিন—এখন আমরা যাবো কোথায় ?

—সেই ভাবনা তো আমারও, ভাবছি তো। গরীব স্কুল মাষ্টার—

—গরীব তো বটেই, যাবার জায়গাও তো নেই।

—আপনার দেশে বাড়ীঘর—

রাখালবাবু হাসিয়া বলিলেন—দেশই নেই, তার বাড়ীঘর। দেশ ছিল ন'দে জেলায় কাঁচড়াপাড়া নেমে যেতে হয়। ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে গিয়েছিলাম—সে সব কিছু নেই। বড় হয়ে আর যাইনি—এই কলকাতাতেই—

—আমারও তো তাই···

পাঁচী পান আনিয়া রাখিয়া গেল।

—অনেক পয়সা খরচ করে বই ছাপালাম, চার পাঁচ শো টাকা দেনা এখনও বাজারে। এই হাঙ্গামাতে যদি বই বিক্রী কমে যায়—তবে তো পথে বসতে হবে—আপনাদের ভরসাতেই—

—কিছুই বুঝছিনে, কি যে হবে—

—আমাদের এখানে কিছু হবে না—কি বলেন? যুদ্ধ হচ্ছে ফিলিপাইনে আর হংকংএ—তার এখানে কি?

—সিঙ্গাপুর ডিঙিয়ে আসা অত সোজা নয়।

—তবে লোক পালাচ্ছে কেন?

—প্যানিক,—ভয়—প্যানিক একেই বলে। আচ্ছা উঠি, রাত হোল মিত্তির মশায়।

—আর একটু বসবেন না? আচ্ছা, তা হোলে—হ্যাঁ, একটা কথা। আনা-আষ্টেক পয়সা হবে?

পকেটে যাহা কিছু খুচরা ছিল, তক্তপোষের উপর রাখিয়া ক্ষেত্রবাবু বাহিরের মুক্ত বাতাসে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া যেন বাঁচিলেন।

'স্পেশাল টেলিগ্রাফ' কাগজ বাহির হইয়াছে, কাগজওয়ালা ফুটপাথ ধরিয়া ছুটিতেছে। ক্ষেত্রবাবু একজনের হাত হইতে কাগজ লইয়া দেখিলেন—

হংকং অবরুদ্ধ।···চীনসমুদ্রে ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ ধ্বংস!

ক্ষেত্রবাবু কেমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন।

পরদিন স্কুলে হেড্‌মাষ্টার সব মাষ্টারকে আপিসে ডাকিলেন। জরুরী মিটিং।

হেড্‌মাষ্টার এ বছরের পরীক্ষার লম্বা রিপোর্ট লিখিয়াছেন, সকলকে পড়িয়া শোনাইলেন। প্রত্যেক শিক্ষকের নিকট হইতে রিপোর্ট লওয়া হয়, পরীক্ষার কাগজ দেখার পরে। সেই সব রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া হেড্‌মাষ্টার নিজে রিপোর্ট লিখিয়া অভিভাবকদের মধ্যে ছাপাইয়া বিলি করেন। তাঁহার ধারণা, ইহাতে স্কুলে ছেলে বাড়িবে।

রিপোর্ট পড়িয়া সকলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—কি রকম হয়েছে?

সকলেই বলিলেন, চমৎকার রিপোর্ট হইয়াছে, এমনধারা হয় না।

—থার্ড ক্লাসের ইংরাজি নিতেন কে?

যদুবাবু বলিলেন—আমি স্যার—

—ভীষণ খারাপ ফল এবার আপনার সাবজেক্টে—আপনি লিখিত কৈফিয়ৎ দেবেন—

—যে আজ্ঞে স্যার—

—ক্লাস সেভেনের ইতিহাস কে নেয়?

শ্রীশবাবু বলিলেন—আমি স্যার—

—সকলের চেয়ে ভাল ছেলে মোটে ষাট পেয়েছে।

—স্যার, প্রশ্ন বড় কঠিন হয়েছিল—সিলেবাস ছাড়া প্রশ্ন হোলে কি করে ছেলেরা—

—না। এমন কিছু কঠিন নয়। প্রশ্নপত্র সব আমি আর মিঃ আলম দেখে দিয়েছি। কমিটিতে এ কথা আমায় রিপোর্ট করতে হবে। লিখিত কৈফিয়ৎ দেবেন—আর এবার বাড়ী বাড়ী গিয়ে একটু ক্যান্‌ভাস করা দরকার হবে ছুটির পরে। নইলে ছেলে হবে না।

ক্ষেত্রবাবু উঠিয়া ভয়ে ভয়ে বলিলেন—কিন্তু স্যার, এদিকে শহর যে খালি হয়ে গেল—

সাহেব তাচ্ছিল্যের স্বরে বলিলেন—কে বল্লে?

যদুবাবু ও শ্রীশবাবু দাঁড়াইয়া বলিলেন—সেই রকমই দেখা যাচ্ছে স্যার। ক্ষেত্রবাবু ঠিক বলেছেন—

গেম্ মাষ্টার বিনোদবাবু বলিলেন—আমাদের পাড়াতে তো আর লোক নেই—

জগদীশ জ্যোতির্ব্বিনোদ বলিল—আমি এক জায়গায় ছেলে পড়াই, তারা চলে গিয়েছে—তাদের পাড়া খালি—

সাহেব, মিঃ আলমের দিকে চাহিয়া বলিলেন—কি মিঃ আলম, আপনি কি দেখেছেন? এই রকম হয়েছে নাকি?

মিঃ আলম উঠিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—না স্যার। এখানে ওখানে দু-একটা বাড়ী খালি হয়েছে বটে। কিছুই নয়—

ক্ষেত্রবাবু প্রতিবাদের স্বরে বলিলেন—কিছু না কি রকম মিঃ আলম? হাওড়া ষ্টেশনে নাকি বেজায় ভিড় হচ্ছে—কুলি আর ঘোড়ার গাড়ীর দর বেজায় বেড়েছে—

—ও সব গুজব। কই, আমি তো রোজ বেড়াই—কিছু দেখিনি—

এমন সময় রামেন্দুবাবু বাহির হইতে একখানা খবরের কাগজ লইয়া ঘরে ঢুকিয়া সাহেবের টেবিলে রাখিয়া বলিলেন—দেখুন স্যার—হংকং যায় যায়—জাপানীরা সিঙ্গাপুরে দূর-পাল্লার কামানের গোলা ছুঁড়েছে—

হেড্ মাষ্টারের কড়া ডিসিপ্লিনের নিগড় বুঝি ছুটিল! ক্ষেত্রবাবু ও শ্রীশবাবু টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া খবরের কাগজ পড়িতে গেলেন। সমবেত শিক্ষকদের মধ্যে একটা গুঞ্জনধ্বনি উত্থিত হইল।

—তাই ত!

—তাই ত

—দেখো না ভায়া কাগজটা—

—সিঙ্গাপুর বিপন্ন!

—ব্যাপার কি?

সাহেব কাগজ হাতে তুলিয়া পড়িয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—বাজে গুজব! সিঙ্গাপুর পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভেদ্য—

মিঃ আলম বলিলেন—বাজে গুজব—হেঃ—

সাহেব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কাগজখানা একদিকে সরাইয়া বলিলেন—যাক্ এসব। তা হোলে বাড়ী বাড়ী ক্যানভাসিংএর জন্যে কে কে রাজি আছেন বলুন। সকলের সাহায্যই আমি চাই—যদুবাবু? ক্ষেত্রবাবু? মিঃ আলম?

ইঁহারা সকলেই দাঁড়াইয়া উঠিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুলের ডিসিপ্লিন পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইল। জাপানী বোমার হুজুগে পড়িয়া সে কঠোর ডিসিপ্লিনের ভিত্তি সামান্য একটু নড়িয়া উঠিয়াছিল মাত্র—তাহাও অতি অল্পক্ষণের জন্য।

হেড্ পণ্ডিত বলিলেন—স্যার, ছুটি ক'দিন হচ্ছে—

সাহেব গম্ভীরস্বরে বলিলেন—পণ্ডিত, ছুটি বেশি দিন দিতে চাই না। দোসরা জানুয়ারী খুলবে। কিন্তু তার আগে ক্যানভাসিং করবার জন্যে চার-পাঁচজন টিচারকে এখানে থাকতে হবে। আমি তাদের নামে সার্কুলার করবো।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—আমাদের মাইনেটা স্যার—

—স্কুল খুললে দেওয়া হবে।

যদুবাবু মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিলেন—কিছু না দিলে স্যার, আমরা দাঁড়াই কোথায়? হাতে কিছু নেই—

—যার না পোষাবে, তিনি চলে যেতে পারেন—মাই গেট্—

যদুবাবু শিক্ষক কর্ত্তৃক তিরস্কৃত স্কুলের ছাত্রের মত ঘাড় নীচু করিয়া পুনরায় আসনে বসিয়া পড়িলেন।

হেড্ মাষ্টার বলিলেন—আমি ছুটির ক'দিন মিঃ আলম, রামেন্দুবাবু আর ক্ষেত্রবাবুকে চাই। তাঁরা রোজ আসবেন আপিসে। নতুন বছরের রুটিনে অনেক অদলবদল করতে হবে। সিলেবাস্ তৈরি করতে হবে প্রত্যেক ক্লাসের। আপনারা তিন জন আমাকে সাহায্য করবেন। যদুবাবু?

যদুবাবু আবার দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

—আপনিও আসবেন—আপনাকে ক্লাস টাস্কের একটা চার্ট করতে হবে গ্রীষ্মের ছুটি পর্য্যন্ত—

যদুবাবুর মুখ শুকাইয়া গেল। আমতা আমতা করিয়া বলিলেন—আমি তাঁর, আমার শালীর, মানে বিয়ে—দেশে—যেতে হবে সেখানে। আমিই সব দেখাশুনো করবো—

হঠাৎ মনে পড়িল, পৌষ মাসে বিবাহ হয় না হিন্দুর, এ কথা সাহেব না জানিলেও অন্যান্য মাষ্টারেরা সবাই জানে—হয় তো আলমও জানে। আলম সাহেবকে বলিয়া দিতেও পারে।

তাই তাড়াতাড়ি সামলাইয়া লইয়া বলিলেন—বিয়ে এই সামনের বুধবারে, কিন্তু ছুটিতে আমার না গেলে—

—ইয়েস্, ইয়েস্—আই আণ্ডারষ্ট্যাণ্ড—

সভা ভঙ্গ হইল। সাহেবের ঘর হইতে বাহির হইয়া যদুবাবু রামেন্দুবাবুকে পাকড়াও করিলেন।

—ও রামেন্দুবাবু, আমায় গোটা দশেক টাকা দিতে বলুন সাহেবকে। করে দিতেই হবে। না হলে মারা যাবো। হাতে কিছু নেই। টুইশানির ছেলে পালিয়েছে—কোথায় পয়সা পাই বলুন তো?

ক্ষেত্রবাবু বাড়ী ফিরিতেই অনিলা ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিল—এসেছ? শোনো—সব পালাচ্ছে। পাড়া ফাঁক হয়ে গেল যে? সোমবার থেকে নাকি হাওড়ার পুল খুলে দেবে, রেলগাড়ী বন্ধ করে দেবে—

—কে বল্লে?

—কে বল্লে আবার—সবাই বলছে, তোমার ছুটির ক'দিন দেরি? এর পর যাওয়া যাবে না কোথাও—ঘোড়ার গাড়ীর ভাড়া নাকি দশ টাকা করে হয়েছে—বোমা নাকি শীগ্গির পড়বে। সিঙ্গাপুর ব্লকেড্ করেছে, দেখেছ তো?

ক্ষেত্রবাবুর ভয় হইয়া গেল। তাই তো, ঘোড়ার গাড়ীর ভাড়া চড়িয়া গেলে কি করিয়া কলিকাতা ত্যাগ করিবেন?

বলিলেন—কিন্তু কোথায় যাওয়া যায় বল তো? জায়গা তো দেখছি এক আলসিংড়ি। কতকাল সেখানে যাইনি। নিভা বেঁচে থাকতে একবার

গরমের ছুটিতে সেখানে গিয়েছিলাম। বাড়ীঘর এতদিনে ইটের স্তূপ হয়েছে পড়ে। বেজায় জঙ্গল সে গাঁয়ে।

—চল, গয়া যাই—

—পয়সা? অত টাকা কোথায়? স্কুলে এক পয়সা দিলে না—

—আমার বাক্সে পাঁচ-ছ'ট. টাকা আছে—আর কিছু ধার করো—

—কে দেবে ধার? সে বাজার নয়।

—কিন্তু যা হয় করো তাড়াতাড়ি। এর পর আর কলকাতা থেকে বেরুনো যাবে না, সবাই বলছে।

—রান্না হয়ে থাকে, দাও—আমি একবার যদুদার বাসা থেকে আসি—দেখে আসি, কি করছে ওরা।

যদুবাবু বাসায় পা দিতেই তাঁহার স্ত্রী বলিল—ওগো, কি হবে গো—সবাই চলে যাচ্ছে, কি করবে করো। কোন্ দিন ঝুপ্ করে বোমা পড়বে, তখন—

—দাঁড়াও, একটু স্থির হতে দাও। চা করো, আগে খাই—তারপর সব শুনছি।

চা করিয়া যদুবাবুর গৃহিণী কাঁসার গ্লাসে আঁচল জড়াইয়া লইয়া আসিল।

যদুবাবু বলিলেন—কেন, পেয়ালা?

—সে ওবেলা ধুতে গিয়ে হাত থেকে পড়ে গুঁড়ো হয়ে গেল।

যদুবাবু রাগিয়া উঠিলেন।

—তা ভাঙবে বই কি, তোমাদের তো ভেবে খেতে হয় না। জিনিসপত্র নষ্ট করলেই হোল—লাগে টাকা, দেবে গৌরী সেন। একটা পেয়ালার দাম কত আজকালকার বাজারে, তার খোঁজ রাখো?

এমন সময়ে বাহিরে ক্ষেত্রবাবুর গলা শোনা গেল।

—ও যদুদা, বাসায় আছেন নাকি?

যদুবাবু তাড়াতাড়ি চা-সুদ্ধ কাঁসার গ্লাসটা স্ত্রীর হাতে দিয়া বলিলেন—এটা নিয়ে যাও—নিয়ে যাও। দেখে ফেলবে—বলবে কি?

গলার স্বর বাড়াইয়া বলিলেন—এসো ক্ষেত্র ভায়া—এসো এসো—

—কি হচ্ছে ?

—এই সবে এলাম ভাই। সবে মিনিট দশেক। তারপর কি মনে করে ? বোসো এইটেতে- -

—বৌদিদি কোথায়—ও বৌদিদি—বলি, একটু চা-টা না হয় করেই খাওয়ান—

যদুবাবু হাসিয়া বলিলেন—চা খাবে কি ভাই—পেয়ালা ভেঙে বসে আছে তোমার বৌদিদি—কাঁসার গেলাসে চা খাচ্ছিলাম, তা তোমাকে কি আর তাতে—

—খুব দেওয়া যাবে। তাতেই দিন না বৌদিদি—

—দাও তা হোলে ওগো, ওই চা-ই দিয়ে যাও—ক্ষেত্র ভায়া আমাদের ঘরের লোক।

চা আসিল। চা খাইতে খাইতে ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—তা তো হোলো। এখন কি উপায় করা যাবে বলুন দিকি ? কলকাতার যা অবস্থা। লোক সব পালাচ্ছে—

—হেড্ মাষ্টার তা বুঝবেন না। তাঁর মতে কোনো বিপদের কারণ নেই। আবার বাড়ী বাড়ী ঘুরে ক্যান্‌ভাসিং করতে হবে ছেলের জন্যে। ছেলে কোথায় ? কলকাতা শহর তো ফাঁকা হয়ে গেল—

—তা কি আর সাহেবকে বোঝানো যাবে দাদা ? কাল থেকে ক্যান্-ভাসিংএ না বেরুলে সাহেব রাগ করবে। আপনারও তো ডিউটি আছে—

—তাই তো, কি করা যায় ভাবছি, মুস্কিল, আসলে কি হয়েছে জানো ভায়া, হাতে নেই পয়সা। রামেন্দু ভায়াকে ধরেছি, সাহেবকে বলে গোটা-দশেক টাকা আমায় না দেওয়ালে চলবে না।

—কোথায় যাবেন ভাবছেন ?

—কোথায় যে যাই ! হাতে পয়সা নেই, দেশঘর নেই। তোমার তবুও তো দেশে বাড়ীঘর আছে, আমার যাবার স্থান নেই। এক আছে জ্ঞাতি-ভাইয়ের বাড়ী, বেড়াবাড়ী বলে গ্রাম, তা সেখানে তারা যে রকম ব্যবহার

করেছে—পরের বাড়ী, কোনো জোর তো সেখানে খাটে না? তুমি কোথায় যাবে ভাবছো?

—আমারও সেই একই অবস্থা। আস্‌সিংড়িতে—মানে আমাদের দেশে—কতকাল যাইনি। বাড়ীঘর এতদিনে ভূমিসাৎ। নয় তো একগলা জঙ্গল, সাপ ব্যাঙের আড্ডা হয়ে আছে। মেয়েছেলে নিয়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়াই কি করে? আমার স্ত্রী বলছিল গয়াতে—শ্বশুরবাড়ী—

—সেই সব চেয়ে ভালো আমার মতে। তাই কেন যাও না?

—পয়সা? পয়সা কোথায়? স্কুলে খাটবো, আর দুমাস পরে এক মাসের মাইনে নেবো—এই তো অবস্থা। জানেন তো সবই—

—আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় ভায়া? জাপানীরা কি এতদূর আসবে? সিঙ্গাপুর নিতে পারবে?

—কি করে বলবো? তবে আমার এক জানাশোনা গবর্ণমেণ্ট অফিসার বলছিল, সিঙ্গাপুর হঠাৎ নিতে পারবে না। ওখানে যুদ্ধ হবে দারুণ—এবং সে যুদ্ধ কিছুকাল চলবে।

—তবে কলকাতাতে ফেলতে পারে—কি বলো?

—ফেলতে পারে। সাহেব যাই বলুক, কলকাতা খুব সেফ্ হবে না—

—স্কুলটাতে দুদিন বেশি ছুটির কথা বলে দেখলে হয় না?

—সাহেবকে তা বলা যাবে না। সাহেব ভিজবে না।

ক্ষেত্রবাবু আর কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়া বিদায় লইলেন। ব্ল্যাক-আউটের কলিকাতা, ঘুটঘুটে অন্ধকার—কাল হইতে আলো আরও কমাইয়া দিয়াছে। মোড়ের কাছে এক জায়গায় ঘোড়ার গাড়ীর আড্ডা। ক্ষেত্রবাবুর কৌতূহল হইল, গাড়ীর ভাড়া কেমন হাঁকে একবার দেখিবেন।

রাস্তা পার হইতে ভয় করে। অন্ধকারের মধ্যে দূরে বা নিকটে বহু আলো তাঁহার দিকে আসিতেছে, ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে বোঝা যায় না, সেগুলি মোটরগাড়ীর আলো, না রিক্‌সার আলো। অন্ধকারে বোঝা যায় না, কত বেগে সেগুলি এদিকে আসিতেছে। ক্ষেত্রবাবু সন্তর্পণে রাস্তা পার হইয়া গাড়ীর আড্ডার কাছে গিয়া বলিলেন—ওরে গাড়োয়ান, ভাড়া যাবি?

একখানা গাড়ীর ছাদে একটা লোক শুইয়া ছিল। উঠিয়া বলিল, কাঁহা যানে হোগা বাবুজি?

—হাওড়া ইষ্টিশানে—

—আভি জায়েগা?

—হাঁ, এখুনি—

—ক' আদমি আছে?

—তিন চার জন আছে—মালপত্তর। কত ভাড়া নিবি?

—এক বাত বোলেগা বাবুজি? চার রূপেয়া।

—কত?

—চার রূপেয়া বাবুজি। কাল ইস্‌সে আউর বাঢ়েগা বাবুজি। কাল পান্-ছ' রূপেয়া হোগা। দিন দিন বাঢ়তে যাতা হ্যায়—যাবেন আপনি? সওয়ারি কোথা থেকে যাবে?

ক্ষেত্রবাবু কি একটা অজুহাত দেখাইয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়িলেন। তাঁহার হাত-পা যেন অবশ হইয়া আসিতেছে—সম্মুখে যেন ঘোর বিপদ্ ঘনাইয়া আসিতেছে, প্রলয় অথবা মৃত্যু, স্ত্রীপুত্র লইয়া এই ব্ল্যাক-আউটের ঘুটঘুটে অন্ধকারাচ্ছন্ন কলিকাতা শহরে তিনি বোতলের মধ্যে ছিপিআঁটা অবস্থায় বুঝি মারা পড়িলেন! ঘোড়ার গাড়ীর ভাড়া দিনে দিনে যদি অসম্ভব অঙ্কের দিকে ছোটে—তবে তাঁর মত গরীব স্কুল মাষ্টার তো নিরুপায়।

মোড়ের মাথায় বিষ্ণু ভট্‌চাজের সাথে অন্ধকারে প্রায় মাথা ঠুকিয়া গেল। পরস্পরকে চিনিয়া পরস্পরে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বিষ্ণু হাওড়ায় রেলওয়ে মালগুদামে কাজ করে, বলিল—ওঃ, জানেন ক্ষেত্রদা, কি কাণ্ড আজ হাওড়া ষ্টেশনে। প্রত্যেক ট্রেণ ছাড়ছে, লোকে লোকারণ্য। লোক গাড়ীতে উঠতে পাচ্ছে না—দশ টাকা, পনেরো টাকা করে কুলিরা নিচ্ছে। আবার শুনছি, হাওড়া ব্রিজ দিয়ে গাড়ী ঘোড়া যাওয়া বন্ধ করে দেবে। এত ভিড় যে, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড একেবারে জাম্—ই. আই. আরের গাড়ীতে ওঠবার উপায় নেই।

—তুমি এখনো আছ যে?

—আমি আর কোথায় যাবো? ফ্যামিলি পাঠিয়ে দিয়েছি বীরভূম। মামাশ্বশুর-বাড়ী।

ক্ষেত্রবাবু বাসায় ঢুকিলেন। অনিলা বলিল—কি হোল গো? যদুবাবু কি বল্লে?

—বলবে আর কি। সব একই অবস্থা। সেও ভাবছে কোথায় যাবে—যাবার জায়গা নেই—

—গয়া যাবে?

—যাবো কি, ই. আই. আরেয় গাড়ীতে নাকি যাওয়ার উপায় নেই—

—তবে কি করবে? স্কুল তো এখনও বন্ধ হোল না—

—বন্ধ হোলে কি হবে? আমার ছুটির মধ্যে ডিউটি পড়েছে—আমার যাবার যো নেই—

অনিলা স্বামীর হাত ধরিয়া মিনতির সুরে বলিল—ওগো, আমার মুখের দিকে চেয়ে তুমি চাকরী ছেড়ে দাও—এই বোমার হিড়িকে তোমাকে এখানে ফেলে রেখে আমার কোথাও গিয়ে শান্তি হবে না—ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে চাইতে হবে লক্ষীটি—শুধু তোমার আমার কথা ভাবলে হবে না।

ক্ষেত্রবাবুর মনে হইল, তাঁহার মাথার উপরে ভীষণ বিপদ্ সমাগত। স্ত্রীর গলার সুরে, নিজের মুখের কথায় যেন কোন মহা ট্র্যাজেডির ইঙ্গিত দিতেছে, সে ট্র্যাজেডির বেড়াজাল এড়াইয়া কোথাও পালাইবার পথ নাই।

সারারাত্রি বড় রাস্তা দিয়া ঘড়-ঘড় করিয়া ঘোড়ার গাড়ী আর ঠুনঠুন করিয়া রিক্‌সা ছুটিতেছে—ক্ষেত্রবাবু বিনিদ্র চক্ষে সারারাত্রি ধরিয়া শুনিয়াই চলিলেন। অনিলা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, ছেলেমেয়েরা ঘুমাইতেছে, সম্মুখে কি বিপদ্, ইহাদের সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই নাই। কি করিয়া উদ্ধত জাপানী বোমার হাত হইতে ইহাদের বাঁচাইবেন? বাঁচাইতে পারিবেন কি শেষ পর্য্যন্ত? হাতে টাকা পয়সা কোথায়?

সারারাত্রি ক্ষেত্রবাবু বিছানায় এপাশ ওপাশ করিলেন।

পরদিন স্কুলের প্রমোশন। সাহেব খুব সকালে উঠিয়া অভিভাবকদের পড়িয়া শোনাইবার জন্য যে রিপোর্ট লিখিয়াছেন, তাহা আর একবার পড়িয়া দেখিতে বসিলেন। আজ ছেলেদের প্রমোশনের পর অভিভাবকদের সভায় এই রিপোর্ট পড়া হইবে,—প্রতি বৎসর হইয়া থাকে, অভিভাবকদের নিমন্ত্রণ করা হয়, এবারেও হইয়াছে।

"বড়ই আনন্দের কথা, সপ্তম শ্রেণীর ইংরাজি পরীক্ষার ফল এবার যথেষ্ট আশাপ্রদ, যদিও ক্লাসের সর্ব্বোচ্চ নম্বর শতকরা বাহান্ন, তবুও এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, প্রত্যেক উত্তরের খাতাখানি আমাকে যথেষ্ট সন্তোষ দান করিয়াছে। ক্লাসের ছেলেদের মধ্যে হরিচরণ এবার গ্রামারে বিশেষ উন্নতি করিয়াছে, যদিও ক্রিয়াপদের যথার্থ প্রয়োগ এখনও সে শিক্ষা করে নাই। গ্রামার শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক এজন্য যত্ন লইতেছেন। শ্রীমান্ নবীনচন্দ্র গুঁই ইংরাজি আর্টিক্‌লের ব্যবহারে বালকসুলভ ভ্রম প্রদর্শন করা সত্ত্বেও তাহার গ্রামারের জ্ঞান উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। নবম শ্রেণীর অঙ্কের ফল এবৎসর আশাতীত ভাল। শ্রীমান্ গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় নব্বুই নম্বর পাইয়া অঙ্কে ক্লাসের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। আমি এই বালকের গত বৎসরের অঙ্কপরীক্ষার ফলের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি— বিগত বৎসরের ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষায় শ্রীমান্ গোপাল বীজগণিত ও জ্যামিতিতে যথাক্রমে আটচল্লিশ ও বত্রিশ নম্বর মাত্র পায়—এক বৎসরের মধ্যে সেই বালকের এই উন্নতি শুধু কেবল অঙ্কশিক্ষকের কৃতিত্বের পরিচায়ক, তাহা নহে, বালকের নিজের অধ্যবসায় ও আগ্রহেরও নিদর্শন বটে। আমি এজন্য তাহাকে একটি স্বাক্ষরিত প্রশংসাপত্র দিব স্থির করিলাম। শ্রীমান্ লালগোপাল ধর ইতিহাসে এবৎসর......" ইত্যাদি।

অভিভাবকদের কাছে এই ধরণের রিপোর্ট পাঠ কোনো স্কুলেই হয় না—কিন্তু সাহেবের বিশ্বাস, ইহাতে অভিভাবকেরা সন্তুষ্ট থাকে, স্কুলের ছাত্রসংখ্যা বাড়ে। এই ধরণের রিপোর্ট পাঠ নাকি ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুলের একটি বৈশিষ্ট্য। কৃতী বালকদিগের স্বাক্ষরিত প্রশংসাপত্র দান আর একটি বৈশিষ্ট্য—যদিও ছেলেরা আড়ালে বলাবলি করে, রৌপ্যপদক দিতে

অর্থব্যয় আছে, প্রশংসাপত্র দিতে খরচ শুধু কাগজের। মাষ্টারেরা বেলা ন'টার মধ্যে আসিয়া গেল। কাল সার্কুলার দেওয়া হইয়াছিল—বিভিন্ন মাষ্টারের বিভিন্ন কাজ। কেহ, প্রমোশনপ্রাপ্ত ছেলেদের নাম, ক্লাস ও সারি তালিকা করিতেছে, কেহ ভাল ছেলেদের পরীক্ষার খাতাগুলি আলাদা করিয়া রাখিতেছে, কেহ নতুন ক্লাসের বইয়ের লিষ্টগুলি তৈরি করিতেছে।—দু'জনে মিলিয়া একখানি বিজ্ঞাপন লিখো করিতেছে [ এই স্কুলে আধুনিকতম শিক্ষাবিজ্ঞান অনুমোদিত পদ্ধতিতে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হয়, হেড্‌মাষ্টার মিঃ জি. বি. ক্লার্কওয়েল এম. এ. ( লিড্‌স্ ) বি.এড্ ( লণ্ডন ) এল. টি. (কর্ক) এস. সি. এম. এস. ( অমুক ), স্বয়ং নবম ও দশম শ্রেণীতে ইংরাজি পড়ান এবং শিশুশ্রেণীতে কথ্য ইংরাজি শিক্ষা দেন, আমরা স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি—]।

বিজ্ঞাপন ছাপাইবার পয়সা নাই—তাই লিখো করা। অভিভাবকদের হাতে বিলি করা হইবে। হেড্‌মাষ্টারের নানা ফাইফরমাশ খাটিতে খাটিতে মাষ্টারেরা হিম্‌সিম্ খাইয়া গেল।

বেলা দশটা বাজিল। এ কয়দিন ছেলেরা তেমন নাই—কারণ, পরীক্ষার পর একরকম ছুটিই ছিল। আজ প্রমোশনের দিন, অন্য অন্য বছর বেলা সাড়ে ন'টার সময় হইতে ছেলেদের ভিড় হয়—এবার জনপ্রাণীর দেখা নাই। বেলা এগারোটা বাজিল, কেহই নাই। সাড়ে এগারোটার সময় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন মাত্র ছাত্র আসিল—তিন শো সাড়ে তিন শো ছেলের মধ্যে। দুইজন মাত্র অভিভাবক দেখা দিলেন প্রায় বারোটার সময়। আর কেহই আসিল না। হেড্‌মাষ্টার রীতিমত নিরাশ হইলেন—অত কষ্ট করিয়া লেখা রিপোর্ট কাহার সামনে পাঠ করিবেন? তবুও তিনি ছাড়িবার পাত্র নহেন—নিজের ঘর হইতে গাউন ঝুলান ও শ্লেটের মত দেখিতে হ্যাট মাথায় দিয়া সাজিয়া গুজিয়া মাষ্টারদের লইয়া ক্লাসে ক্লাসে প্রমোশন দিতে গেলেন।

মিঃ আলম বলিলেন—স্যার, নীচের তলায় কোনো ক্লাসে ছেলে নেই—ছোট ছোট ছেলেদের ক্লাস একেবারে ফাঁকা। সেখানে কি যেতে হবে?

সাহেব হাইকোর্টের জজের মত গম্ভীর স্বরে বলিলেন—নিয়ম যা, তার

এতটুকু ব্যতিক্রম হবার যো নেই আমার স্কুলে। শূন্য ক্লাসের সামনেই প্রমোশনের লিষ্ট্ পড়া হবে।

সুতরাং উপরের ক্লাসের প্রমোশনের লিষ্ট্ পড়া শেষ করিয়া হেড্‌মাষ্টার দলবল লইয়া নীচেকার শূন্য ক্লাসগুলিতে অবতীর্ণ হইলেন।

হেড্‌মাষ্টার ডাকিলেন—রমেন্দ্রনাথ বোস প্রোমোটেড্ টু নেক্‌স্‌ট্ হাইয়ার ক্লাস—অমুক প্রোমোটেড্ টু নেক্‌স্‌ট্ হাইয়ার ক্লাস—ইত্যাদি।

ফাঁকা হাওয়া এ-জানালায় ও-জানালায় হা হা করিতেছে। কড়িকাঠে টিকটিকি টিক্‌টিক্ করিয়া উঠিল। হাসি পাইলেও কোনো মাষ্টারের হাসিবার যো নাই। শ্রীশবাবু গেম্ মাষ্টার বিনোদবাবুর পাঁজরায় আঙুলের গুঁতা মারিল।

যদুবাবু ক্ষেত্রবাবুকে চিম্‌টি কাটিলেন।

উপরে আসিয়া রিপোর্ট পড়িবার সময় দেখা গেল, সেই দুইজন অভিভাবক আপিসে বসিয়া আছে, তাহারা সাহেবের বার্ষিক প্রোগ্রেস রিপোর্ট শুনিতে আসে নাই—আসিয়াছে তাহাদের ছেলেদের ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিতে।

সাহেবের ইঙ্গিতে মিঃ আলম তাহাদের আড়ালে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনারা এ স্কুল থেকে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন কেন? ওদের এ-বছরের ফল বেশ ভালোই, হেড্ মাষ্টারের রিপোর্টটা শুনুন না—

একজন বলিল—রিপোর্ট শুনে কি করবো মশাই, আমাদের ফ্যামিলি সব এখান থেকে চলে গিয়েছে কাটোয়ায়, আজ আট দশ দিন হোল। সেখানে এখন সবাই থাকবে—এখানে বাড়ি চাবিবন্ধ, ছেলে থাকবে কার কাছে? —সেখানেই ভর্ত্তি করে দেবো।

অন্য লোকটি বলিল—আমাদের দেশ মশাই বর্দ্ধমানে। আমাদের দোকান ছিল, উঠিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছি—দেশের স্কুলে ভর্ত্তি করবো। আপনি সাহেবকে বলুন—ট্রান্সফার আজই দিতে হবে। আমাদের পাড়ায় লোক নেই—থাকবো কি ভরসায়?

—রিপোর্টটা শুনুন না?

—না মশাই—মন ভালো না। ওসব শোনবার সময় নেই—আমার ব্যবস্থাটা করে দিন তাড়াতাড়ি—

মিঃ আলম ফিরিয়া আসিলে সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হোল ?

—স্যার, ওরা শোনে না। ট্রান্সফার না নিয়ে ছাড়বে না মনে হচ্ছে—

—ছেলে এলো না কেন আজ ?

রামেন্দুবাবু বলিলেন—ছেলে কোথায় যে আসবে স্যার ? সব ভেগেছে।

নমো নমো করিয়া মিটিং শেষ হইল। রিপোর্ট পাঠ হইল স্কুলের মাষ্টারদের সামনে। মিটিং অন্তে হেড্ মাষ্টারের নানারকম সার্কুলার বাহির হইল—এ মাষ্টারকে এ করিতে হইবে, ও মাষ্টারকে ও করিতে হইবে। ছুটির সার্কুলার বাহির হইল—দোসরা জানুয়ারী স্কুল খুলিবে। হেড্ মাষ্টারের নিকট মাষ্টারেরা বিদায় লইলেন। অত সাধের লিথো-করা বিজ্ঞাপন কাহাদের মধ্যে বিলি করা হইবে ? স্কুলের বোর্ডে খানকতক আঠা দিয়া জুড়িয়া দেওয়া হইল।

চায়ের দোকানে যদুবাবু আর শ্রীশবাবু হাসিয়া বাঁচেন না।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—সাহেবের কি কাণ্ড। কোনো ত্রুটি হবার যো নেই—

যদুবাবু বলিলেন—নাঃ, হেসে আর বাঁচিনে—হাসতে হাসতে পেট ফুলে উঠলো—হাসতেও পারিনে সাহেবের সামনে—

এই সময় জ্যোতির্ব্বিনোদ একটা পুঁটলি হাতে ঘরে ঢুকিয়া বলিল—আজ শেষ দিনটা, একটু ভাল করে খাওয়া দাওয়া যাক যদুদা—

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—হাতে পোঁটলা কিসের হে ?

—আজ বাড়ী যাচ্ছি রাত্রের গাড়ীতে।

—এ ক'দিনের জন্যে ?

—না দাদা—বাড়ী থেকে চিঠি এসেছে। যাই চলে, যা হয় হবে। এখন কলকাতা আসা বোধ হবে না।

—সাহেব কি ছুটি দেবে ?

—না হয় চাকরী ছেড়ে দেবো। দেশে ঘর আছে, ভিক্ষে করে খাবো। বামুনের ছেলে, তাতে লজ্জা নেই।

যদুবাবুর বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। এই জ্যোতির্ব্বিনোদের মত সামান্ত দরের লোকে যদি চাকুরী ছাড়িয়া দিবার মত মরিয়া হইয়া উঠিতে পারে, তবে বিপদ্ কত বেশি।

কে একজন বলিল—ক্ষেত্রদা'র হোমিওপ্যাথিকটা যা হোক চলছিল—

—আর হোমিওপ্যাথি ভায়া। পাড়ায় নেই লোক, ডাক্তারী করতাম একটু আধটু অবসরমত, তাও গেল—পাড়া খালি।

যদুবাবু হঠাৎ যেন শীতকালেও ঘামিয়া উঠিতে লাগিলেন। শ্রীশবাবু, শরৎবাবু, গেম্ মাষ্টার বিনোদবাবু, হেড্‌পণ্ডিত, সবাই আজ উপস্থিত। বড়দিনের ছুটি হইয়া যাইতেছে—তাহার উপর এই গোমামাল। কি হইবে কে জানে? একটু ভাল করিয়া খাওয়া দাওয়া করিয়া লওয়া যাক। ইহাদের ভাল খাওয়ার দৌড়—চার পয়সা হইতে ছ'পয়সা বা আট পয়সা। একখানা টোষ্টের জায়গায় তুখানা টোষ্ট্। তাহাই সকলে আমোদ করিয়া খাইলেন। ইহারা অল্পেই সন্তুষ্ট, অভাবের মধ্যে সারাজীবন এবং যৌবনের প্রথম অংশ অতিবাহিত করিয়া সংযম ও মিতব্যয়ে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

ইহাদের মধ্যে জগদীশ জ্যোতির্ব্বিনোদ অমিতব্যয়িতার প্রথম উদাহরণ দেখাইয়া বলিলেন—ওহে দোকানদার, যদুবাবুকে আরও একখানা কেক্ দাও, শ্রীশবাবুকে একখানা টোষ্ট্ দাও—বিনোদকে—

যদুবাবু একগাল হাসিয়া বলিলেন—আমাদের জ্যোতির্ব্বিনোদের হার্টটা যাই বলো বেশ ভালো—

—আর দাদা হার্ট! এবার কলকাতা থেকে চলে যাচ্ছি—বোধ হয় এই শেষ দেখা—চাকুরী আর করবো না—

—কেন, কেন?

—বাড়ীর সকলে বলেছে, প্রাণ বাঁচলে অনেক চাকরী মিলবে—চলে এসো বাড়ী।

যদুবাবু কথাটা এই কিছুক্ষণ আগেই একবার শুনিয়াছেন ইহার মুখ হইতে, তবুও আর একবার জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিয়া বিপদের গুরুত্বটা ভাল করিয়া যেন বুঝিতে চাহিলেন।

ক্ষেত্রবাবুকে বলিলেন—তারপর ক্ষেত্র ভায়া, ব্যাপার কি দাঁড়ালো বলো তো ? সত্যি কি কলকাতা ছেড়ে যেতে হবে ?

ক্ষেত্রবাবুই ঠিক এই কথাই ভাবিতেছেন। চা খাইতে খাইতে এই মাত্র ভাবিতেছিলেন –আস্‌সিংড়ি যাওয়া ভালো, না ডিহিরি-অন-শোনে শ্বশুর-বাড়ীতে ? যদুবাবুর কথায় যেন একটু বিস্মিত হইলেন। ভয়ানক বিপদ্ নিশ্চয় সম্মুখে, নতুবা যদুদার মনেও ঠিক একই সময়ে সেই একই কথা উঠিল কেন।

বলিলেন—তা যেতে হবে বই কি। সবাই যখন পালালো—

গেম্ মাষ্টার বলিলেন—আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে রেডিও আছে। টোকিও থেকে নাকি বলেছে, সাতাশে তারিখে কলকাতায় নিশ্চয়ই বোমা ফেলবে—

যদুবাবু সভয়ে বলিয়া উঠিলেন—অ্যাঁ !

ক্ষেত্রবাবুর নিজের স্নায়ুসমূহের উপর কর্ত্তৃত্ব আরও দৃঢ়তর। তিনি বলিলেন—কোন্ সাতাশে ? এই সাতাশে ?

—এই সামনের সাতাশে দাদা। আজ হোল সতেরো—

যদুবাবুর সামনে এইবার দোকানী জ্যোতির্ব্বিনোদের অর্ডারি সেই কেক্‌খানা দিয়া গেল। যদুবাবুর তখন আর কেক খাইবার রুচি নাই—অন্ত সময়ে হইলে পরের দেওয়া চার পয়সা দামের ভাল কেক্‌খানা কি তৃপ্তির সঙ্গেই একটু একটু করিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া চায়ের সঙ্গে খাইয়া শেষ করিতে অন্ততঃ দশ পনেরো মিনিট করিতেন—পাছে তাড়াতাড়ি ফুরাইয়া যায়। আজ কিন্তু যদুবাবুর মনে হইল, তিনি মিউনিসিপ্যালিটির জবাইখানার মধ্যে বসিয়া আছেন, চারি ধারে গরুর বদলে মানুষের কাটা হাত পা, ঘিলু বার হওয়া শূন্যগর্ভ নরমুণ্ড, চাপ চাপ রক্ত, থেঁতলানো ধড়, ছট্‌কিয়া পড়া দন্তপাটি—শবের উপরে শব, রক্তমাখা চুলের বোঝা, উগ্র কর্ডাইটের গন্ধ, মৃত্যু, আর্ত্তনাদ !...

যদুবাবু নিজের অজানিতে শিহরিয়া উঠিলেন।

কোথায় যাইবেন তিনি ? যাইবার কোনো জায়গা নাই। বেড়াবাড়ী গিয়া উঠিবেন অবনীর খোশামোদ করিয়া, হাতে পায়ে ধরিয়া ? এ বিপদ্-

সঙ্কুল স্থানে মরণের ফাঁদের মধ্যে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকার চেয়ে তাও যে ভালো। ভাগ্যে আজ রামেন্দুবাবুকে ধরিয়া কহিয়া গোটাকতক টাকা সাহেবের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইয়াছেন।

সম্মুখের টেবিলস্থ পাত্রের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, ইতিমধ্যে কখন্ কেক্‌খানা খাইয়া ফেলিয়াছেন অন্যমনস্ক অবস্থায়। টেবিল হইতে উঠিয়া বলিলেন—তোমরা তা হোলে বসো, আমি আসি—

জ্যোতির্ব্বিনোদ বলিলেন—আরে বসুন যদুবাবু—আর এক পেয়ালা চা দেবে? আর একখানা কেক্?

—আরে না হে না। আমার সময় নেই সত্যি। একটা জরুরী কাজ আছে—আমি চলি—

অপরের চা ও খাবার যদুবাবু বোধ হয় জীবনে এই সর্ব্বপ্রথম প্রত্যাখ্যান করিলেন।

বেলা সাড়ে পাঁচটা। শীতের বেলা, সন্ধ্যার বেশি দেরি নাই। ব্ল্যাক-আউটের কলিকাতায় বেশি ঘোরাঘুরি করা চলিবে না, তবুও যদুবাবু শ্যামবাজারে তাঁহার এক জানা-শোনা লোকের আড়তে গিয়া কিছু টাকা ধারের চেষ্টা একবার দেখিলেন। যদি কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতে হয়, বেশি কিছু রেস্ত থাকা দরকার হাতে।

টালার পুলের পাশ দিয়া গলিটা নামিয়া গেল। যদুবাবু দুরু দুরু বক্ষে আড়তের নিকটবর্ত্তী হইলেন, কি জানি কি ঘটে! কত টাকা চাহিবেন? দশ, না ত্রিশ? পাওয়া যাইবে কি এ বাজারে? বিশেষতঃ এ স্থলে আলাপ পরিচয় তেমন ঘনিষ্ঠ নয়। লোকটি তাঁহার শালার সহপাঠী, শালার সঙ্গে কয়েকবার ইতিপূর্ব্বে এখানে আসিয়াছেন, একসময়ে যাতায়াত ছিল, এখন কমিয়া গিয়াছে।

আড়তের টিনের চালা নজরে পড়িতেই যদুবাবুর বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল, জিভ শুকাইয়া আসিল।

পথের ধারে খালের জলে একটা হাঁড়ি বোঝাই ভড় হইতে লোকজন হাঁড়ি [illegible]। যদুবাবু লক্ষ্য করিলেন, অনেকগুলি মাটির ভোলো

হাঁড়ি ভাঙায় সাজাইয়া এক পাশে রাখিয়া দিয়াছে। এক পাশে স্তূপাকার কলিকা। লুঙিপরা একজন মাঝি আরও কলিকা নামাইতেছে।

যদুবাবু ভাবিলেন—এ হাঁড়িতে আর কি কেউ ভাত রেঁধে খাবে? কলকাতা শহর তো ফাঁকা—এত কল্কেতেই বা তামাক খাবে কে?

তখন একেবারে আড়তের সামনে তিনি পৌছিয়া গিয়াছেন।

সামনেই একজন ভদ্রলোক বসিয়া আছেন, বছর পঞ্চাশেক বয়স, মাথায় টাক, রং খুব গৌরবর্ণ, গায়ে হাতকাটা বেনিয়ান। লোকটি গুড়গুড়িতে তামাক খাইতেছিলেন।

যদুবাবু পৈঠা দিয়া উঠিতে উঠিতে হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন—এই যে সীতানাথবাবু, ভাল আছেন?

—এই যে যদুবাবু, আসুন—বসুন। তারপর কোথা থেকে? রামনাথ কোথায়?

রামনাথ যদুবাবুর শ্যালক, আজ বছর কয়েক যদুবাবু তাহার কোনো খবর জানেন না···সেও ভগ্নীপতির খবরাখবর রাখে না। কিন্তু এ কথা এ স্থলে বলা ঠিক হইবে না। যাহার সুবাদে আড়তের মালিকের সঙ্গে পরিচয়, সে-ই যদি খোঁজখবর না রাখে, তবে ইহার নিকটও যদুবাবুকে কিঞ্চিৎ খেলো হইতে হয় বৈ কি।

সুতরাং তিনি বলিলেন—রামু সেইখানেই আছে—মধ্যে আসবে লিখেছিল, ছুটি পাচ্ছে না···

—সেই জব্বলপুরেই আছে? আছে ভাল?

—হ্যাঁ তা ভাল আছে।

—আপনাদের স্কুল ছুটি হয়ে যায়নি? আপনি এখনও স্কুলে আছেন তো?

—আছি বই কি। নয় তো কি আর করবো বলুন···আপনাদের মতন তো ব্যবসা বাণিজ্য শিখিনি···

আড়তের মালিক হাসিয়া বলিলেন—আপনাদের তো ভাল, বিছানা বাক্স বাঁধলেন, কলকাতা থেকে পালালেন, আমাদের কি হয় বলুন তো? গুদামভরা মাল নিয়ে এখন যাই কোথায়? বোমা পড়ে, এখানেই

যা হয় হোক। বসুন, চা খাবেন। ওরে, দু পেয়ালা চা করতে বল ঠাকুরকে—

চা খাইয়া একথা ওকথার পরে যদুবাবু আসল কথাটি উত্থাপন করিবার পূর্ব্বে যথেষ্ট সৎসাহস সঞ্চয় করিয়া লইলেন। তাহার পর শুষ্কমুখে বার দুই তিন ঢোক গিলিয়া বলিলেন—আপনার কাছে এসেছিলাম সীতানাথবাবু, হাতে বিশেষ কিছু নেই, একেবারে খালি। কলকাতার বাইরে যেতে হোলে কিছু হাতে রাখা দরকার। গোটা কুড়ি টাকা যদি আমাকে ধার দেন এ সময়, তবে বড়ই উপকার করা হয়, আমি অবিশ্যি যত সত্বর হয়, আপনার ধার শোধ করবো, জানুয়ারী মাসের মাইনে থেকে—

চাহিবার ভাষা অবশ্য ইহাই। আড়তদার সীতানাথবাবু স্কুল মাষ্টার নহেন, লোক চরাইয়া খান—টাকা ধার লইলে কেহ স্বেচ্ছায় শোধ দিয়া যায় বাড়ী বহিয়া, ইহা বিশ্বাস করেন না। যদুবাবুর সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠতাও তাঁহার নাই, এ অবস্থায় যদুবাবু একবারে কুড়ি টাকা ধার চাওয়াতে কিঞ্চিৎ বিস্মিতও হইয়াছিলেন।

বেশ অমায়িকভাবে হাসিয়া, কথার সঙ্গে কিছুমাত্র ডালপালা না জুড়িয়া যথেষ্ট ভদ্রতা ও বিনয়ের সহিত বলিলেন—টাকা হবে না। এ সময় নয়—

যদুবাবু আর কোনো কথা বলিতে পারিলেন না। সীতানাথবাবুর গলার সুরে হৃদ্যতা বা আত্মীয়তার লেশমাত্র নাই। চাঁচাছোলা কেতাদুরস্ত ভাবের ভদ্রতার সুর। শুনিলে ভয় হয়, দ্বিতীয় বার আর যাচ্ঞা করা চলে না। তবুও প্রাণের দায় বড় দায়—কাল সকালে তিনি কলিকাতা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবেনই, যে দিকে দুই চোখ যায়—এখানে লজ্জা করিলে চলিবে না।

সুতরাং আবার বলিলেন—তা দেখুন সীতানাথবাবু, একটু দেখুন। হয়ে যাবে এখন। আমার বড্ড দরকার। কলকাতা থেকে চলে যাবার উপায় নেই—আমাকে একটু সাহায্য করুন—

—হবে না। পারবো না। মাপ করুন—

সীতানাথবাবু হাতজোড় করিলেন এমন ভঙ্গিতে, যেন তিনি বিশেষ কোনো অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছেন যদুবাবুর কাছে।

তবুও যদুবাবু আবার বলিলেন—তবে না হয় আমায় পনেরোটা কি দশটা টাকা দিন—যা পারেন—আমি যে বড় টানাটানিতে পড়েছি কিনা—জানুয়ারী মাসের মাইনে পেলেই—

সীতানাথবাবু কি ভাবিয়া বলিলেন—পাঁচটা টাকা নিয়ে যান, এসেছেন যখন। ও গোপাল, ক্যাশ থেকে পাঁচটা টাকা দাও তো।

ওদিকে একজন বৃদ্ধ লোক বসিয়া খাতাপত্র লিখিতেছিল, সে বলিল—খাতায় কি লিখবো বাবু?

—আমার নিজ নামে হাওলাত লিখে রাখো। এই নিন্—আসুন।

যদুবাবু নমস্কার করিয়া সীতানাথবাবুর আড়ত হইতে নিক্রান্ত হইলেন। শ্যামবাজারের মোড় পর্য্যন্ত আর আসিতে পারেন না, রাস্তা পার হইতে পারেন না, ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার। ওখানা কি আসে, রিক্‌সা না মোটর?

আলো চলিয়া আসিতেছে অন্ধকারের মধ্যে, কত জোরে আসিতেছে বোঝা যায় না, ঘাড়ে পড়িবে নাকি?

বাড়ী আসিলেন তখন দশটা রাত্রি।

যদুবাবুর স্ত্রী বলিল—এলে? আমি ভেবে মরি, এত রাত পর্য্যন্ত এই অন্ধকারে—

—শোনো, বিছানা বাক্স গুছিয়ে নাও—কাল সকালের ট্রেনেই বেরুতে হবে। আর নয় এখানে—

যদুবাবুর স্ত্রী অবাক্ হইয়া যদুবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—সে কি গো! যাবে কোথায় একটা ঠিক করো আগে—

—অত ঠিক করার সময় নেই। চলো বেড়াবাড়ী যাই—

যদুবাবুর স্ত্রী শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—ওগো, তুমি মাপ করো। সেখানে আমি যাবো না।

যদুবাবু মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন—তবে মরো গে যাও—যাবে কোথায়? দাঁড়াবার জায়গা আছে কোথায় জিগ্যেস্ করি? এখানে মরো বোমা খেয়ে।

—তা সেও ভালো। অবনী ঠাকুরপোর বউ আর মায়ের খিটিং খিটিং দাঁতের বাদ্যি আমার সহ্য হবে না। তার চেয়ে মরি বোমা খেয়েই মরি।

—তবে মরো, যা হয় করো। আমি কিছু জানিনে—

—তুমি যাও না নিজে? রেখে যাও আমায় এখানে—

আহারাদি করিয়া যদুবাবু মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলেন। বেড়াবাড়ী যদি না যাওয়া যায়, তবে কোথায় গিয়া উঠিবেন এখন? দিদির বাড়ী? হুগলী জেলার যে পল্লীগ্রামে তাঁহার দিদির বাড়ী, ভগ্নীপতির মৃত্যুর পরে বহুদিন কেন, বহুকাল সেখানে যাওয়া হয় নাই। বাড়ীঘরের কি আছে না আছে, তিনি জানেনও না। সেইখানেই অগত্যা যাইতে হয়। মোটের উপর যেখানে হয়, কাল সকালেই পালাইতে হয়। ভাবিবার সময় নাই।

একবার কি একটা শব্দ হইল, যদুবাবু চমকিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। এরোপ্লেনের শব্দ, সাইরেন বাজিল নাকি?

পোঁ—ও—ও—ও

ক্রমশঃ শব্দটা মাথার উপরে আসিতেছে। যদুবাবুর প্লীহা চম্‌কাইয়া গেল। জাপানী প্লেন যে নয়, তাহা কে বলিল? যদুবাবুর স্ত্রী বলিল—এই ভাখো, একখানা উড়ো-জাহাজ আলো জ্বালিয়ে মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে—

যদুবাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন—চুপ, চুপ—হ্যারিকেনটা ঘরের মধ্যে নিয়ে যাও—ঘরের মধ্যে নিয়ে যাও—বোমা! বোমা! জাপানী বোমা!

আবার সেই রক্তাক্ত জবাইখানার দৃশ্য তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। রক্ত, চুল, অস্থি, মাংস···স্ত্রীকে বলিলেন—বেঁধে নাও, বিছানা টিছানা বেঁধে ফেল—ক'টা বেজেছে ভাখো তো? দেশেই যাবো ঠিক করলাম। নিজের দেশে।

আজ রাতটা কি কোনো রকমে কাটিবে না?

সকাল হইতে না হইতে যদুবাবু ঘোড়ার গাড়ীর আড্ডায় গাড়ী ভাড়া করিতে গেলেন। হাওড়া ষ্টেশনে যাইতে কেহ হাঁকিল তিন টাকা, কেহ হাঁকিল সাড়ে তিন টাকা। একজন বলিল—হাওড়া পুল বন্ধ হয়ে গিয়েছে বাবু—কোন গাড়ী যেতে দিচ্ছে না—

যদুবাবু চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন—কে বল্লে?

—হামরা সব জানি বাবু।

দুখানা রিক্সা ঠুন্ ঠুন্ করিয়া যাইতেছিল। তাহাদের থামাইয়া, বারো আনায় রিক্সা ঠিক করিয়া তাহাদের বাসার সামনে আনিলেন। তখনও ভাল করিয়া ভোর হয় নাই। যদি হাওড়ার পুল বন্ধ থাকে, বালি ব্রিজ হইয়া রিক্সা ঘুরাইয়া লইবেন—যত টাকা লাগে। কলিকাতা হইতে বাহির হইতেই হইবে। এ মৃত্যুর ফাঁদ হইতে বাহির হইতে পারিবেন, না কি কোনো রকমে? জাপানী বোমা !!!

জিনিসপত্র রিক্সায় বোঝাই দিয়া মলঙ্গা লেন হইতে সেণ্ট্রাল এভেনিউতে পড়িয়া বৌবাজার দিয়া হাওড়ার পুলের দিকে চলিলেন। একটু একটু ফর্সা হইয়াছে। পুল নির্ব্বিঘ্নে পার হইয়া গেল, অত ভোরেও দলে দলে ছ্যাকরা গাড়ী, মোটর, রিক্সা, ঠ্যালাগাড়ী, মোট মাথায় মুটে, পথচারীদল চলিয়াছে পুল বাহিয়া। যদুবাবু নিজের চোখকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না—তবে কি পুল পার হইতে পারিয়াছেন সত্যই? বোধ হয় এ যাত্রা তবে রক্ষা পাইয়া গেলেন।

ষ্টেশনে লোকে লোকারণ্য অত সকালেও। বৌ-ঝি, ছেলে-মেয়ে, লট-বহরে, মুটে, বিছানা, ধামা-ট্রাঙ্ক, গুড়ের ভাঁড়, তেলের টিন, ছাতালাঠির বাণ্ডিল, চ্যাঁ ভ্যাঁ, হৈ চৈ। টিকিট কাটিতে গিয়া দেখিলেন, টিকিটের জানালা খোলে নাই। অথচ সেখানে সার বাঁধিয়া লোক দাঁড়াইয়া। গেটে ঢুকিবার উপায় নাই, পিষিয়া তালগোল পাকাইয়া কোনো রকমে প্ল্যাটফর্ম্মে ঢুকিলেন। গাড়ীর দরজায় চাবি—লোকজন জানালা দিয়া লাফাইয়া ডিঙাইয়া কামরার মধ্যে ঢুকিতেছে। যদুবাবু এক ভদ্রলোককে বলিলেন—মশায়, একটু দয়া করে যদি সাহায্য করেন মেয়েদের।

যদুবাবুর স্ত্রী বসিবার জায়গা পাইলেন, কিন্তু তিনি নিজে অতি কষ্টে দাঁড়াইবার স্থানটুকু পাইলেন। এই সময় যদুবাবুর স্ত্রী বলিলেন, ওগো, সেই ছোট বালতিটা? সেটা সেই টিকিটঘরের সামনে—সেখানেই পড়ে আছে—

সর্ব্বনাশ! যদুবাবু অমনি ছুটিলেন। আছে, ঠিক আছে। বালতিটা

কেহই লয় নাই। ভিড়ের মধ্যে জিনিসপত্র চুরি যায় না। কাছে কাছে সর্ব্বদাই লোক, সকলেই ভাবে—তাহার মধ্যে কাহারও জিনিস।

গেটে পুনরায় ঢুকিবার সময় বেজায় ভিড়। সারি সারি মুটে মোট ঘাট মাথায় দাঁড়াইয়া, পিছনে বৌ-ঝি, ছেলে মেয়ে, পুরুষ। গেট্ আবার বন্ধ করিয়া দিয়াছে। একটু পরে কেন যেন হঠাৎ গেট্ খুলিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না। নরনারীর দল ধীর মন্থর গতিতে গেটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। একটি অল্পবয়সী বধূ দু হাতে দুই ভারী পোঁটলা ঝুলাইয়া ভিড়ে পিষিয়া যাইতেছে। যদুবাবুর মনে সেবাপ্রবৃত্তি জাগিল। আহা, কতটুকু মেয়ে, এই ভিড় সহ্য করা কি ওদের কাজ?

যদুবাবু আগাইয়া গিয়া বলিলেন—মা, আপনার পুঁটুলি দিন আমার হাতে—

বৌটিকে সামনে গিয়া হাত দিয়া প্রায় বেড়িয়া ভিড়ের সংস্পর্শ হইতে বাঁচাইয়া তাহাকে গেট্ পার করিয়া দিলেন। বৌটির সঙ্গে উনিশ কুড়ি বছরের ছোকরা, তাহার দুই হাতে দুটি ভারী ট্রাঙ্ক—সে যদুবাবুকে বলিল—স্যার—আপনি কোন্ গাড়ীতে যাবেন? শেওড়াফুলি? তা হলে এক গাড়ীতেই—

যদুবাবু বধূটিকে অনেক কষ্টে স্ত্রীর পাশে একটু জায়গা করিয়া বসাইয়া দিলেন। ট্রেণ ছাড়িল।

পুনর্জ্জন্ম।

যদুবাবু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। জাপানী বোমার পাল্লা হুগলী জেলা পর্য্যন্ত পৌঁছিবে না।

ক্ষেত্রবাবু শেষ পর্য্যন্ত আসসিংড়ি গ্রামেই যাওয়া স্থির করিলেন। প্রায় আজ দশ বছর পরে যাওয়া। বহু কষ্টে ভিড়, অসুবিধা, অতিরিক্ত খরচ, ধাক্কাধুক্কি সহ্য করিয়া গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলেন সন্ধ্যার কিছু আগে। গিয়া দেখিলেন, পৈতৃক বাড়ীর পশ্চিম দিকের কুঠুরিতে গ্রামের এক গরীব গৃহস্থ আশ্রয় লইয়াছে, তাহারা জাতিতে কৈবর্ত্ত। তাহারা মনের আনন্দে গাছের ডাব, ইঁচড় ইত্যাদি পাড়িয়া খাইতেছে, বাঁশঝাড়ের বাঁশ কাটাইতেছে, উঠানে

প্রকাণ্ড তরিতরকারির ক্ষেত করিয়াছে। কোনো কালে কেহ আসিয়া এ-সব কাজের কৈফিয়ৎ চাহিবে, তাহারা কোন দিনও ভাবে নাই। হঠাৎ সন্ধ্যাবেলা বাড়ীর মালিকদের আকস্মিক আবির্ভাবে তাহারা সন্ত্রস্ত, তটস্থ হইয়া পড়িল।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—কে হে! ও, পাঁচু না? তোমরাই আছ?

পাঁচু হাত কচ্‌লাইয়া বলিল—আজ্ঞে, আমরাই। বাড়ীঘর সে বার পড়ে গেল ঝড়ে, তা বলি বাবুর বাড়ী পড়ে রয়েছে—তাই আমরা—

—আছ, ভালই। বাপের ভিটেতে সন্দে পড়ছে। তা ওদিকে এত জঙ্গল করে রেখেছ কেন? নিজেরাই থাকো, একটু ভাল করে রাখলেই পারো। ওদিকের ঘরগুলো ভাল আছে?

—না বাবু। এই একখানা ঘর ভাল ছিল, আমরাই থাকি। ওদিকের ঘরের ছাদ দিয়ে জল পড়ে।

—যাই হোক, এখন রাত্তিরটা থাকার ব্যবস্থা কি করা যায়?

—ওদিকের ঘর ছুটো পরিষ্কার করে দিই বাবুকে। এখন আসুন—

সেই ভাঙা ঘরের স্যাঁতসেতে মেজেতে জিনিসপত্র, স্ত্রীপুত্র লইয়া ক্ষেত্রবাবু সেই সন্ধ্যা হইতে অধিষ্ঠিত হইলেন। অনিলার আদৌ ইচ্ছা ছিল না এখানে আসিবার। শুধু টাকা-পয়সার অভাবে গ্রামে আসিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে।

অনিলা বুলে—সাপখোপ কামড়াবে নাকি? মেজের ওপর শোয়া। তোমার এখানে খাটপোষ নেই?

—ছিল সবই। আজ দশ বছর আসিনি—লোকে চুরিই করুক বা উইয়েই খাক—

পাঁচ ছ'দিন কাটিয়া গেল।

গ্রামে আসিয়া নতুন জীবন সুরু হইয়াছে ক্ষেত্রবাবুর। সকালে উঠিয়া জেলেপাড়া হইতে মাছ সংগ্রহ করিয়া আনেন, বন বাগান হইতে এঁচড়, ডুমুর পাড়িয়া আনেন, কয়লা পাওয়া যায় না, সুতরাং কাঠ কুড়াইয়া আনেন। সকালে সাড়ে ন'টায় খাওয়ার পরিবর্ত্তে বেলা বারোটায় খান।

অনিলা বলে—প্রাণ গেল বাপু, একটু কথা বলি কার সঙ্গে, এমন লোক খুঁজে মেলা দুর্ঘট।

—কেন, কাকাদের বাড়ী যাও, দত্তদের বাড়ী যাও—

—কি যাবো? কেউ কথা বলতে পারে না। শুধু গেঁয়ো কথা—কি রাঁধলে ভাই? কতক্ষণ রান্নার কথা বলা যায় বল তো? এর চেয়ে ডিহরি গেলে খুব ভাল হোত। শুনলে না আমার কথা—

শীঘ্রই কিন্তু এ অভাব দূর হইল।

গ্রামের একটা বাড়ীতে কলিকাতা হইতে একঘর গৃহস্থ আসিল ক্ষেত্রবাবুর মত তাহারও এক গ্রামের বাসিন্দা, কলিকাতায় বাড়ী আছে, বড়-বাজারে মসলার ব্যবসা করিয়া বেশ সঙ্গতিপন্ন অবস্থা। তাহারা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে আরও দুই ঘর বোমা-ভীত পরিবার। শেষোক্ত দলের একটি পরিবারের থাকিবার স্থান নাই—পূর্ব্বোক্ত গৃহস্থের প্রাচীন ঠাকুরদালানে দরমার বেড়া দিয়া আবরু সৃষ্টি করিয়া একঘর সেখানে রহিল—অপর পরি-বারের জন্য গ্রামে ঘর খুঁজিয়া মিলিল না। সকলেই গরীব, কোঠাবাড়ী বেশি নাই—যাহা দু একখানা আছে, তাহাতে মালিকদের নিজেদেরই কুলায় না।

ক্ষেত্রবাবুর কাছে লোক আসিয়া বলিল—আপনার একখানা ঘর ভাড়া দেবেন?

ক্ষেত্রবাবু অবাক্ হইলেন। গ্রামের ভাঙা কুঠুরি ভাড়া কেহ লইবে, এ কথা কে কবে শুনিয়াছে? ভরসা করিয়া বলিলেন—তা দিতে পারি।

—কি নেবেন?

ক্ষেত্রবাবু ভাবিয়া বলিলেন—তিন টাকা—

লোকটি এই গ্রামেরই লোক।

বলিল—তিন টাকা কেন? পনেরো টাকা হাঁকুন না? তাই দেবে।

ক্ষেত্রবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন—পনেরো টাকা বাড়ীভাড়া কে দেবে? এই ভাঙা বাড়ীর একখানা ঘরের ভাড়া তিন টাকা, তাই বেশি। পাগল!

—আপনি জানেন না। ওরা টাকার আণ্ডিল, কারে না পড়লে কি

করতে এসেছে এই পাড়াগাঁয়ে? ঠিক দেবে। নইলে বাড়ী পাচ্ছে কোথায়?

ক্ষেত্রবাবু হাজার হোক স্কুল মাষ্টার, অত ব্যবসাবুদ্ধি মাথায় খেলিলে আজ সতেরো আঠারো বছর ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুলে পঁয়ত্রিশ টাকা বেতনে মাষ্টারি করিবেন কেন। তিনি স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করিতে গেলেন। অনিলা বলিল—সে কি গো, ওই ঘর আবার ভাড়া। ওর আছে কি যে ভাড়া দেবে? তারা বিপদে পড়ে এসেছে, ওই ভাঙা তুটো ঘরে থাকতে চাইছে, এতেই বোঝো। এমনি থাকতে দাও, কথা বলবার মানুষ পাওয়া যাচ্ছে একঘর, এই না কত!

ক্ষেত্রবাবু ক্ষীণ স্বরে বলিলেন—তিনটে টাকা দিতে চাচ্ছে—আর বাড়াচ্ছি নে অবিশ্যি। দিক তিনটে টাকা। নিই—

—নাও গে যাও, কিন্তু আর এক পয়সা বেশি বলো না।

পরদিন ক্ষেত্রবাবুর ভাঙ্গা ঘরে ভাড়াটেরা আসিয়া গেল, একটি বধূ, তিন ছেলেমেয়ে, প্রৌঢ়া ননদ। শোনা গেল, বধূটির স্বামী কাজ করে ইছাপুরে বন্দুকের কারখানায়। ছুটি পাইলেই একবার আসিয়া দেখিয়া যাইবে। অনিলা বৌটির সঙ্গে খুব ভাব করিয়া ফেলিল, তার নাম কুসুমকুমারী, বাপের বাড়ী বাগবাজার, বৃন্দাবন মল্লিকের গলি। কলিকাতা ছাড়িয়া বাহিরে আসা এই প্রথম, বিশেষ করিয়া আস্‌সিংড়ির মত অজ পল্লীগ্রামে। প্রত্যেক কাজেই অসুবিধা, না আছে কল টিপিলেই আলো, কল টিপিলেই জল, না আছে ভাল রাস্তাঘাট, না আছে একটা টকি বায়স্কোপ।

তবুও দিন যায় কায়ক্লেশে। মেয়েমানুষ, কেহ নিজের বাপের বাড়ী শ্বশুরবাড়ীকে অপর মেয়ের কাছে ছোট হইতে দিতে চায় না। কুসুম বাগবাজারের গল্প করে তো অনিলা ডিহিরি-অন-শোনের গল্পে তাহাকে ছাড়াইয়া যাইতে চায়।

শীত কাটিয়া বসন্ত পড়িল। ক্ষেত্রবাবুর মনে পড়িল, আমের বউলের গন্ধ কতদিন এমন পান নাই, বাঁশবনে, মাঠে ঘেঁটুফুল ফোটার দৃশ্য কতকাল দেখেন নাই। বহুদিন পূর্ব্বের বিস্মৃত শৈশব কালের শত স্মৃতি অতীত মাধুর্য্যে

মণ্ডিত হইয়া শৈশবের মাতাপিতার কত হাসি ও কথার টুকরা লইয়া তুলিয়া যাওয়া স্নেহস্বর লইয়া মনের মধ্যে উঁকি মারে।

হাতের পয়সা ফুরাইয়া গেল। অনিলা পিতৃগৃহ হইতে আসিবার সময় লুকাইয়া সামান্য কিছু অর্থ আনিয়াছিল, তাহা দিয়াই এতদিন চলিল—নতুবা ক্ষেত্রবাবু স্কুল হইতে বিশেষ কিছু আনেন নাই। ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুল আর খোলে নাই, আঠারোই ডিসেম্বরের পরে কলিকাতার কোন স্কুলই খুলে নাই—ক্ষেত্রবাবু স্কুল হইতে পত্র পাইয়া জানিয়াছেন, খবরের কাগজেও দেখিয়াছেন।

স্কুল কি উঠিয়া গেল। হেড্মাষ্টারের নামে দু'তিনখানা পত্র দিয়াও উত্তর না পাওয়াতে বৈশাখ মাসের প্রথমে ক্ষেত্রবাবু নিজেই কলিকাতা গেলেন। সে কলিকাতা আর নাই, রাস্তা দিয়া কত কম লোকজন চলিতেছে, তেল বন্ধ হওয়ার দরুণ মোটর গাড়ীর সংখ্যা বহু কমিয়া গিয়াছে, রাত আটটার পর ঘুটঘুটে অন্ধকার।

পিটার লেনের মোড়ে ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুল বাড়ীটার আর সে শ্রীছাঁদ নাই। গেট ভিতর হইতে ভেজানো ছিল, ঢুকিয়া ক্ষেত্রবাবু ডাকিলেন, ও মথুরা, মথুরা!

নীচের তালার ঘর হইতে কেবলরাম বাহির হইয়া আসিল। ক্ষেত্রবাবুকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি দুই হাত জোড় করিয়া মাথা নীচু করিয়া বলিল—কেমন আছেন বাবু?

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—ও কেবলরাম, সাহেব কোথায়?

কেবলরাম হতাশার সুরে দুই হাত তুলিয়া বলিল—তিনি কলকাতায় নেই। নাগপুরে গেছেন। আমার মাইনে চুকিয়ে দিয়ে গেলেন যাবার সময়।

—স্কুল!

—উঠে গিয়েছে বাবু।

—তবে তোকে মাইনে দিচ্ছে কে এখানে?

—হেড্মাষ্টার বল্লেন, তুই এখানে থাক,—চিঠিপত্র এলে তাঁর নামে

পাঠাতি বলে দিয়েছেন। যদি এর পরে স্কুল চলে—কিন্তু তা চলবে না বাবু, বাড়ীওয়ালার পাঁচ মাসের ভাড়া বাকি, শুনছি না কি নোটিশ দিয়েছে।

—ছেলেপিলে কেউ আসে না?

—কে আসবে বাবু, কে আছে কলকাতায়? ওই পাশের গলির কেষ্ট আসে, আর আসে শিবরাম, ওই কুণ্ডু লেনের বাবুদের বাড়ীর সেই দুষ্ট ছেলেটা। ওরা এসে খোঁজ নেয় কবে স্কুল খুলবে, আমি বলি—যাও ছেলেরা, স্কুল যদি খোলে, খবর পাবে।

—মাষ্টারেরা?

—কেবল হেড্ পণ্ডিত এসেছিলেন সাহেবের ঠিকানা নিতে। আর শ্রীশ-বাবু এসেছিলেন টাকার কি হোল জানতে। আর কেউ আসে না। শ্রীশবাবু ঢাকায় চাকরী পেয়েছেন, জ্যোতির্ব্বিনোদ মশাই দেশের স্কুলে চাকরী নিয়েছেন।

—নাগপুরে সাহেব কি করছেন জানো? তাঁর ঠিকানা কি?

—তিনি কি করছেন তা জানিনে। ঠিকানা নিয়ে যান, আমার কাছে সে দিনও চিঠি দিয়েছেন।

ক্ষেত্রবাবু ঠিকানা লইয়া বিষণ্ণমনে স্কুল হইতে বাহির হইলেন। আজ সতেরো বৎসরের কত সুখদুঃখের লীলাভূমি, কত ছেলে এই দীর্ঘ সতেরো বছরে আসিয়াছে গিয়াছে, কত অস্পষ্ট কাঁচা উৎসুক মুখ মনে পড়ে এখানকার মাটিতে আসিয়া দাঁড়াইলে, মুখই মনে পড়ে, মুখের অধিকারীর নাম মনে পড়ে না। ক্লার্কওয়েল সাহেব, যদুবাবু, জ্যোতির্ব্বিনোদ, মিঃ আলম—আজ সকলের সাথেই আর একবার দেখা করিতে ইচ্ছা হয়—কিন্তু কে কোথায় আজ ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে।

পুরানো চায়ের দোকানটিতে ঢুকিয়া ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—ওহে, চা দাও এক পেয়ালা—

দোকানী দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া—মাষ্টার-বাবু যে! আসুন, আসুন, ভাল সব?

—ভাল। তোমাদের সব ভাল?

—আর কি করে ভাল হবে বাবু। আপনারা সব চলে গেলেন, তিন তিনটে স্কুল কাছে, সব বন্ধ। বিক্রি-সিক্রি নেই, দোকান চলে কি করে বলুন।

ক্ষেত্রবাবু বসিয়া বসিয়া আপন মনে চা খাইতে লাগিলেন। কোথায় গেল সে সব পুরানো দিন। ওইখানটাতে বসিত জ্যোতির্ব্বিনোদ, এখানটাতে রামেন্দুবাবু, ক্ষেত্রবাবুর পাশে সব সময়েই বসিত যদুদা, আর ওই হাতলহীন চেয়ারটা ছিল নারাণদার! (আহা বেচারী! ভালই হইয়াছে স্বর্গে গিয়াছে, স্কুলের এ দুর্দ্দশায় বেচারীর প্রাণে বড়ই কষ্ট হইত।) বাঁধা ধরা আসন। এখানে বসিয়া দুঃখের মধ্যেও কত আনন্দ, কত মজলিস করা গিয়াছে গত দশ, বারো, চৌদ্দ বছর। আজ কেউ নাই কোন দিকে। সব ছত্রভঙ্গ।

স্কুল আর বসিবে না। কলিকাতার সব স্কুল যদিও দু'পাঁচ মাস পরে খোলে, তাঁহাদের স্কুল আর বসিবে না। বসিতে পারে না—আর্থিক অবস্থা খারাপ। বাড়ীওয়ালা আর মাসখানেক দেখিয়া 'টু লেট' ঝুলাইয়া দিবে। মাষ্টারেরা পেটের ধাঁধায় যে যেখানে পারিয়াছে, চাকুরীতে ঢুকিয়া পড়িয়াছে—নয় তো তাঁর মত সুদূর পল্লীগ্রামে আত্মগোপন করিয়াছে।

ক্লার্কওয়েল সাহেবের মত একনিষ্ঠ শিক্ষাব্রতীর আজ কি দুরবস্থা, তাহার খবর কে রাখে?

—ক'পয়সা?

—মাষ্টারবাবু, আপনাদের খেয়েই মানুষ। এতদিন পরে পায়ের ধুলো দিলেন—এক পেয়ালা চা খেয়েছেন, ওর আর কি দাম নেবো? না মাষ্টার-বাবু, মাপ করবেন।

—আচ্ছা, আর কোনো আমাদের স্কুলের মাষ্টার যদি এখানে চা খেতে আসে—তবে আমার কথা বোলো তাকে—কেমন তো? মনে থাকবে? আমার নাম ক্ষেত্রবাবু। বোলো—আমি তাদের কথা ভুলিনি। কেমন তো?

চায়ের দোকান হইতে বাহির হইয়া দু'একটি টুইশানির ছাত্রের বাড়ী

গেলেন। বাড়ী তালাবন্ধ। মেয়েছেলে নাই, ভাবে মনে হইল। পুরুষেরা যদি বা থাকে, কর্ম্মস্থল হইতে সকাল সকাল ফিরিবার তাগিদ নাই। ক্ষেত্রবাবু অন্যমনস্কভাবে পথ চলিতে লাগিলেন। ধর্ম্মতলার কাছাকাছি আসিলে একটি তরুণ যুবক আসিয়া খপ্ করিয়া তাঁহার পায়ের উপর পড়িয়া ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া হাসিমুখে বলিল—স্যার, ভাল আছেন? চিনতে পারেন?

—হ্যাঁ, রাজেন দেখছি যে। তা আর চিনতে পারবো না। তুই কাদের সঙ্গে যেন পাশ করিস্—কোন্ বছর—

—বছর পাঁচ ছয় হয়ে গেল স্যার। মনে রেখেছেন, এই যথেষ্ট। আমি শিবুদের ব্যাচে পাশ করি। শিবুকে মনে আছে? শিবনাথ ভট্টচাজ্জি, ক্ষীরোদ ডাক্তারের ছেলে—

ক্ষেত্রবাবু ভাল মনে করিতে পারিলেন না, কিন্তু বলিলেন—হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কি করছিস্?

—এ. আর. পি-তে ঢুকেছি স্যার। বেকার বসে ছিলাম আজ অনেকদিন। এবার—

—বেশ, বেশ। আচ্ছা, চলি—

সন্ধ্যার দেরি নাই। আবার সেই ব্ল্যাক্-আউটের কলিকাতা। আর কলিকাতায় থাকিয়া লাভ নাই। রাত সাড়ে আটটায় গাড়ী আছে শিয়ালদহে। ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু সস্তার বিস্কুট ও লেবেঞ্চুস কিনিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ক্ষেত্রবাবু ষ্টেশনে আসিয়া জমিলেন।

যদুবাবু আজ মাস দুই শয্যাগত।

হাওড়া জেলার যে পল্লীগ্রামে তিনি গিয়াছিলেন, সেখানে গিয়া দেখিলেন, জ্ঞাপত্তির ঘরবাড়ীর অবস্থা যা, তাতে সেখানে মানুষের বাস করা চলে না। তবুও থাকিতে হইল, কি করিবেন—অভাব। কিন্তু মাসখানেক পরে যদুবাবুর ম্যালেরিয়া ধরিল। অর্থের অভাব, তদুপরি থাকিবার কষ্ট—এ গ্রামে আত্মীয় বন্ধু কেহ নাই, হাতেও নাই পয়সা।

গ্রামের নাম কমলাপুর, তারকেশ্বর লাইন হইয়া যাইতে হয়—শেওড়াফুলি হইতে পাঁচ ছ' ক্রোশ দূরে। গ্রামের ভদ্রলোকেরা সকলেই ডেলি-প্যাসেঞ্জার, সকালে কেহ আটটা চল্লিশ, কেহ ন'টা দশের ট্রেণ ধরিয়া কলিকাতায় ছোটে —আবার ঝাড়নে বাজারহাট বাঁধিয়া বাড়ী ফেরে। যেটুকু গল্পগুজব করে— হয় আফিস, নয়তো ফুটবল, আজকাল অবশ্য যুদ্ধের গল্প।

পাশেই অবিনাশ বাঁড়ুর্য্যের বাড়ী। কলিকাতা হইতে রাত ন'টার সময় প্রৌঢ় ভদ্রলোক বাড়ী ফিরিলে যদুবাবু উদ্বেগের সুরে জিজ্ঞাসা করেন—আজ যুদ্ধের খবর কি অবিনাশবাবু?

অবিনাশবাবু যুদ্ধের আলোচনা করিতে বসেন। তোজো বা ওয়াভেল বা চার্চ্চিল যাহা না ভাবিয়াছেন, অবিনাশবাবু তাহা ভাবিয়া, বুঝিয়া বিজ্ঞ হইয়া বসিয়া আছেন। সিঙ্গাপুর বা ব্রহ্মদেশ কি করিলে রক্ষা হইতে পারিত, ব্রিটিশের কি ভুল হইল, কোন্ পথ ধরিয়া কি ভাবে যুদ্ধ করিলে আপার বর্ম্মা এখনও রক্ষা হয়—এসব কথা অবিনাশবাবু খুবই ভালই জানেন। কলিকাতায় দিন পনেরোর মধ্যে বোমা পড়িবে, এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। বোমারু বিমানের আক্রমণের চিত্র তাঁহার মত কেহ আঁকিতে পারে না।

শুনিয়া শুনিয়া যদুবাবুর কি হইয়াছে, আজকাল তিনি যেন সর্ব্বদাই সশঙ্ক।

একদিন রাত্রে আহার করিতে বসিয়া হঠাৎ উৎকর্ণ হইয়া শুনিলেন, এরোপ্লেনের শব্দের মত একটা শব্দ না?

স্ত্রীকে বলিলেন—দাঁড়াও, ও কিসের শব্দ গো?

—কই?

—ওই যে শোনো না—আলো সরাও, আলো ঘরে নিয়ে যাও, ঘরে নিয়ে যাও—জাপানী প্লেন হতে পারে—

তোমার হোল কি? ও তো গুবরে পোকা উড়ছে জানালার বাইরে—

—না না, গুবরে পোকা কে বল্লে? দেখে এসো আগে—দুধ দিতে হবে না, আগে দেখে এসো—

যদুবাবুর স্ত্রী ঝাঁটার আগায় পোকাটাকে উঠানে ফেলিয়া দিয়া বলিল—জাপানী এরোপ্লেন ঝাঁট দিয়ে তফাৎ করে রেখে এলাম

গো—এখন নিশ্চিন্দি হয়ে বসে দুধ দিয়ে ভাত দুটি খাও—এক চাক্‌লা আম দিই—

সংসারের বড কষ্ট, অথচ ভয়ে যদুবাবু কলিকাতায় গিয়া স্কুলের প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের টাকার খোঁজখবর করিতে পারেন না। স্কুলে চিঠি লিখিয়াও জবাব পাইলেন না। ম্যালেরিয়া-প্রধান স্থান, শরীরের মধ্যে অসুখ ঢুকিল—প্রায়ই অসুখে ভোগেন। অথচ ঔষধ নাই, পথ্য নাই। থাকিবারও খুব কষ্ট।

যদুবাবু বলেন—এর চেয়ে বেড়াবাড়ী ছিল ভাল।

যদুবাবুর স্ত্রী বলে—সেখানেও যে সুখ, তা নয়—তবে তুমি সঙ্গে থাকলে আমি বনেও থাকতে পারি। সে বার তুমি আমায় ফেলে রেখে এলে একা—কি করে থাকি বল তো?

যদুবাবু বলেন—তুমি অবনীর মাকে একখানা চিঠি লেখো। আম-কাঁটালের সময় আসছে, চলো যাই। কতকাল বেড়াবাড়ী বাস করিনি। আসল কথা কি জান, কলকাতা ছাড়া কোনো জায়গায় মন টেঁকে না। কথা বলবার মানুষ নেই—আমার যে সব বন্ধু ছিল কলকাতায়, তাদের কেউ পোষ্ট মাষ্টার, কেউ মার্চেণ্ট আপিসের বড় কেরাণী, দু শো টাকার কম মাইনে নয়—স্কুল মাষ্টারকে সবাই খাতির করতো। শিক্ষিত লোক শিক্ষিত লোকের মর্ম্ম বোঝে—

—কেন ওই অবিনাশবাবু, উনিও তো ভাল চাকরী করেন—

—ওই অবিনাশটা? আরে রামোঃ, রেল আপিসে কাজ করে, সে কালের এনট্রান্স পাশ—ওর দরের লোকের সঙ্গে কি আমাদের বনে? ওই দেখো না কেন, দুটো ছেলে রয়েছে, আমি তোর বাড়ীর পাশে একজন কলকাতার বড় স্কুলের মাষ্টার, পড়া না কেন দুইশানি? দে না দশটা টাকা মাসে? এমন পাবি কোথায় তোদের এই পাড়াগাঁয়ে? পেটে বিদ্যে থাকলে তবে তো! রেল আপিসের কেরাণী আর কত ভাল হবে?

অবনীর মাকে চিঠি লেখা হইল, কিন্তু কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। ইতিমধ্যে যদুবাবু একদিন হঠাৎ জ্বর হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। যদুবাবুর স্ত্রী গিয়া অবিনাশবাবুর স্ত্রীর কাছে কাঁদিয়া পড়িলেন। অবিনাশবাবু তখনও

আপিস হইতে ফেরেন নাই, তাঁহার চাকর পাঠাইয়া পাশের গ্রামের ভূষণ ডাক্তারকে ডাকাইয়া আনিলেন। ভূষণ ডাক্তার আসিয়া রোগী দেখিয়া বলিলেন, মাথায় হঠাৎ রক্ত উঠিয়া এমন হইয়াছে। খুব সাবধানে থাকা দরকার। চিকিৎসাপত্র করিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ করিতে যদুবাবুর স্ত্রীকে শেষ সম্বল হাতের রুলি বিক্রয় করিতে হইল।

এই সময় হঠাৎ একদিন অবনী আসিয়া হাজির। সে একটা পুঁটুলি হইতে গোটাকতক কমলা নেবু ও পোয়াটাক মিছরি যদুবাবুর বিছানার এক পাশে রাখিয়া একগাল হাসিয়া বলিল—নিতে এসেছি দাদা. চলুন। বৌদিদি মাকে পত্র লিখেছিলেন আপনার অসুখের খবর দিয়ে। মা বল্লেন, যাও—ওদের গিয়ে এখানে নিয়ে এসো।

যদুবাবু মিনতির স্বরে বলিলেন—তাই নিয়ে চলো ভায়া, এখানে আমার মন টেঁকে না।

—বৌদিদি কই?

বোধ হয় ঘাটে গিয়েছে। বোসো, আসছে এখুনি।

অবনীকে দেখিয়া যদুবাবু যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। নির্বান্ধব স্থানে তবুও একজন দেশের লোক, জ্ঞাতির সান্নিধ্যলাভ কম কথা নয়।

অবনী ইহাদের সঙ্গে করিয়া বেড়াবাড়ী আনিয়া ফেলিল। যে ঘরে পূর্ব্বে যদুবাবুর স্ত্রীর স্থান হইয়াছিল, সেই ঘরখানাতেই এবারও যদুবাবুরা আসিয়া উঠিলেন। ঘরখানা সেই রকমই আছে, বরং আরও খারাপ, আরও স্যাঁৎসেঁতে দেওয়ালে নোনা লাগার ছোপ আরও পরিস্ফুট হইয়াছে।

গ্রামে ডাক্তার নাই, আশপাশের ষোল আনা গ্রামের মধ্যে কুত্রাপি ডাক্তার নাই, দু'একজন হাতুড়ে বদ্যি ছাড়া। তাহাদেরই একজন আসিয়া যদুবাবুকে দেখিল। পুরাতন জ্বরে ভাত খাওয়ার পরামর্শও দিল। বলিল—নাড়ি খাড়ি সেরে যাবে অখন, ও গরম হয়েছে, গরমের দরুণ অসুখডা সারছে না।

রুলি বিক্রয়ের টাকা ফুরাইয়া আসিতেছে দেখিয়া যদুবাবুর স্ত্রী স্বামীকে বলিল—হ্যাঁ গো, কাল তো খুড়ীমা বলছিলেন, বৌমা, এক মণ চাল কিনতে হবে, অবনীর হাতে এখন টাকা নেই—তা তোমার ইয়েকে একবার বল।

আমি তোমাকে আর কি বলবো, সব বিস্তে তো জানি। এক মণ চালের দাম দিতে গেলে তোমার ওষুধপথ্যির পয়সা থাকে না। অথচ ওদের হাঁড়িতে খাওয়া দাওয়া, না দিলেও তো মান থাকে না। কি করি?

যদুবাবু বিরক্তির সুরে বলিলেন—তোমাদের কেবল পয়সা আর পয়সা, একটা লোক শুষছে বিছানায়—জানিনে ও সব, যাও এখান থেকে—

যদুবাবুর স্ত্রীর আর কোনো গহনাপত্র নাই, স্বামী বিশেষ কিছু দেন নাই, বরং বাপের বাড়ী হইতে আনীত যাহা কিছু ধূলোগুঁড়ো ছিল, তাহাও স্বামী ফুঁকিয়া দিয়াছেন অনেকদিন পুর্ব্বে।

এখন উপায়?...ভাবিয়া চিন্তিয়া বিবাহের সময় শ্বশুরের দেওয়া বেনারসী শাড়ীখানা লুকাইয়া গ্রামের মধ্যে অবস্থাপন্ন রায়বাড়ীর গিন্নির কাছে লইয়া গেল।

রায় বাড়ীর গিন্নি বলিলেন—এসো এসো ভাই। কবে এলে? শুনলাম নাকি ঠাকুরপোর বড্ড অসুখ?

যদুবাবুর স্ত্রী কাঁদিয়া বলিল—সেই জন্যেই আসা। কলকাতার স্কুল উঠে গিয়েছে, হাতে এক পয়সা নেই—অথচ ওঁর অসুখ। আমার এই ফুলশয্যের বেনারসীখানা বিক্রি করে দিন। নইলে উপায় নেই—এই দেখুন, ভাল কাপড়, এখনও নষ্ট হয়নি—এক জায়গায় কেবল একটু পোকায় কেটেছে—

রায়গিন্নির অবস্থা ভাল। দুই ছেলে চাকরী করে, জমিজমাও আছে। বাড়ীর কর্ত্তা আগে কোর্টের নাজির ছিলেন, সে কালের নাজির, দু'পয়সা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। একটি মেয়ে বিধবা, বাপের বাড়ী থাকে—কিন্তু তাহার শ্বশুরবাড়ীর অবস্থা ভালই—স্ত্রীধন হিসাবে কিছু কোম্পানীর কাগজও আছে।

রায়গিন্নি বলিলেন—ফুলশয্যের বেনারসী কেন বিক্রি করবে ভাই? দু পাঁচ টাকা দরকার থাকে, নিয়ে যাও—আবার যখন তোমার হাতে আসবে, দিয়ে যেও।

যদুবাবুর স্ত্রী বলিল—না, আপনি একেবারে বিক্রি করিয়েই দিন। ধার করলে একদিন শোধ দিতে হবে, তখন কোথায় পাবো?

স্ত্রীর মুখে এ কথা শুনিয়া যদুবাবু চটিয়া গেলেন। বলিলেন—ধার দিতে চাচ্ছিল, নিলেই হোত। কাপড়খানা থাক্‌তো, টাকাও চার পাঁচটা আসতো। কাপড়খানা ঘুচিয়ে দিয়ে এলে? এমন পাথুরে বোকা নিয়ে কি সংসার করা চলে?

যদুবাবুর স্ত্রী কোনো প্রতিবাদ করিল না। অবুঝ স্বামী, রোগ হইয়া আরও অবুঝ হইয়া গিয়াছে। তাহাকে মিষ্টি কথায় ভুলাইয়া রাখিতে হইবে, ছেলেমানুষকে যেমন লোকে ভোলায়। টাকাকড়ি বিষয়ে মানুষের সঙ্গে সোজাসুজি ব্যবহার ভাল। ফাঁকি দিয়া, ঠকাইয়া কতদিন চলে? স্বামীকে সে কথা বোঝান শক্ত।

এদিকে অবনীদের ধারণা, যদুবাবু প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের মোটা টাকা আনিয়াছেন সঙ্গে। স্বামী স্ত্রী লইয়া সংসার, এতদিন কলিকাতায় চাক্‌রী করিয়াও দু পাঁচ হাজার বা ব্যাঙ্কে কোন্ না জমাইয়া থাকিবেন? বাইরের লোকের সামনে অবনী বলে—দাদার হাতে পয়সা আছে। গভীর জলের মাছ, এ কি আর তুমি আমি?

যদুবাবুকে বলে—দাদা, টাকা ব্যাঙ্কে রাখা ভাল না, যে বাজার।

যদুবাবু বলেন—তা তো বটেই।

—তা আপনি যদি রেখে এসে থাকেন ব্যাঙ্কে, একদিন না হয় আমিই যাই, চেক লিখে দিন, টাকাটা উঠিয়ে আনি।

যদুবাবু ভাঙেন তো মচকান না। ব্যাঙ্কের ত্রিসীমানা দিয়া যে তিনি কস্মিন্‌কালে হাঁটেন নাই, অবনীকে এই সোজা কথাটা বলিলেই হাঙ্গামা চুকিয়া যায়, কিন্তু তা তিনি বলিলেন না। এমন ভাবের কথা বলিলেন, যাহাতে অবনীর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, দাদার অনেক টাকা কলিকাতার ব্যাঙ্কে মজুত।

সেইদিন হইতে উহাদের দিক্ হইতে নানা ধরণের তাগিদ আসিতে লাগিল। আজ অবনীর মেয়ে উমার কাপড় নাই, কাল কাছারীর খাজনা না দিলে মান থাকে না, পরশু অবনীর নিজের জুতা এমন ছিঁড়িয়াছে যে, একজোড়া নতুন জুতা ভিন্ন ভদ্রসমাজে সে মুখ দেখাইতে পারিতেছে না। তা ছাড়া, সংসারের বাজার খরচের প্রায় সমুদয় ভার পড়িল যদুবাবুদের অর্থাৎ যদুবাবুর

স্ত্রীর উপর। ফলে বেনারসী শাড়ী বিক্রির পঁচিশটি টাকা, দিন কুড়ির মধ্যেই কয়েক আনা পয়সায় আসিয়া দাঁড়াইল।

যদুবাবুর স্ত্রী জানেন, স্বামীর কাছে কিছু চাওয়া ভুল। তোরঙ্গের তলায় একটা সিঁদুরের কৌটার মধ্যে বহুকালের দুল ভাঙ্গা, নথের টুকরো, এক কুচি চুড়ির গুঁড়ো, দু চারটা সিঁদুরমাখানো লক্ষ্মীর টাকা ইত্যাদি ছিল। সব গৃহিণীই এগুলি লুকাইয়া কুড়াইয়া রাখিয়া দেন, যদুবাবুর স্ত্রীও তাহা করিয়াছিলেন। কত কালের স্মৃতিজড়ানো এই অতিপ্রিয় দ্রব্যগুলির দিকে চাহিয়া তাঁহার চোখে জল আসিল। শেষ সম্বল সোনার কুচি, লোকে কথায় বলে। সত্যিই সেই শেষ সম্বলটুকুও কি হাতছাড়া করিতে হইবে, অবস্থা এত মন্দ হইয়া আসিয়াছে?

অবনী একদিন যদুবাবুর কাছে ভূমিকা ফাঁদিয়া বলিল—দাদা, একটা কথা বলি। এ মাসে আমায় কিছু টাকা দিন। একটা গরু বিক্রি আছে আদাড়ি জেলেনীর, বাইশ টাকা দাম চায়, এবেলা এক সের ওবেলা এক সের দুধ দিচ্ছে। আপনার অসুখের জন্যে দুধের তো দরকার। গরুটা কিনে রাখি, সব হাঙ্গামা মিটে যায়।

যদুবাবু স্বভাবসিদ্ধভাবে উত্তর দিলেন—তা—তা—বেশ। মন্দ কি? হ্যাঁ, সে ভালই।

অবনী উৎসাহ পাইয়া বলিল—কবে দিচ্ছেন টাকাটা? আজ না হয় পাঁচটা টাকা দিন, বায়না করে আসি—হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে—

আসলে সে দিন আড়ংঘাটার বাজারে অবনীর পাঁচ টাকা ধার শোধ দেওয়ার ওয়াদা ছিল, কুণ্ডুদের দোকানে। অনেক দিনের দেনা, নতুবা তাহারা নালিশ রুজু করিবে বলিয়া শাসাইয়াছে।

যদুবাবু বলিলেন—তা এখন তো হয় না। তোমার বৌদিদির কাছে চাবি। সে ঘাটে গিয়েছে—

যদুবাবুর উপর হইতে চাপ গিয়া পড়িল এবার তাঁহার বেচারী স্ত্রীর উপর। বৌদিদি কেন দিবেন না, দাদা যখন বলিয়া দিয়াছেন? আসল কথা, দাদা তো কঞ্জুস্ আছেনই, বৌদিদি হাড় কঞ্জুস্। হাত দিয়া জল গলে না।

করট ও ফিঙে পাখী গ্রীষ্মের দীর্ঘ দিন ধরিয়া বাঁশঝাড়ে ডাকে, প্রস্ফুটিত তুঁত পুষ্পের ঘন সুবাসে যদুবাবুর জানালার বাহিরের বাতাস ভরপুর, রোগগ্রস্ত যদুবাবু নিজের বিছানায় বালিস ঠেসান দিয়া বসিয়া বসিয়া শোনেন। সামনের নারিকেলগাছের গায়ে একটা গিরগিটি, যখনই যদুবাবু চাহিয়া দেখেন, সেই গিরগিটি ওই গাছের গায়ে একই জায়গায়। দেখিয়া দেখিয়া রুগ্ন, উদ্‌ভ্রান্ত যদুবাবুর মনে হয়, ওই গিরগিটিটা তাঁহার এই বর্ত্তমান শয্যাশায়ী অবস্থার প্রতীক। ওটাও যেমন নারিকেলগাছের গায়ে অচল, অনড়—তিনিও তেমনি এই আলো-আনন্দহীন কক্ষে, পুরানো ভাঙা কোঠার কেমন একপ্রকার নোনাধরা গন্ধের মধ্যে শয্যাগত, উত্থানশক্তিরহিত।

কবে শরীর সারিবে কে জানে? যেদিন ওই গিরগিটিটা ওখান হইতে সরিয়া যাইবে?

অবনীর বড় ছেলে কালীকে ডাকিয়া বলিলেন—এই শোন্, ওই গিরগিটি-টাকে ওখান থেকে তাড়াতে পারবি?

বালক অবাক্ হইয়া তাঁর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—কেন জ্যাঠামশায়?

—দে না, দরকার আছে।

—একটা কঞ্চি নিয়ে আসি জ্যাঠামশায়। খোঁচা দিয়ে তাড়াই। আপনি উঠবেন না, শুয়ে শুয়ে দেখুন। তাড়ানো হইল বটে, কিন্তু আবার পরদিন সকালে উঠিয়া যদুবাবু সভয়ে চাহিয়া দেখিলেন, গিরগিটিটা আবার সেই নারিকেলগাছের গায়ে স্বস্থানে জাঁকিয়া বসিয়া আছে।

যদুবাবু হতাশ হইয়া বালিসের গায়ে ঠেস্ দিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

অসুখ সারে না। দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া আসিতেছে দেহ, পাড়াগাঁয়ের হাতুড়ে ডাক্তারের ওষুধে ফল হয় না। জ্যৈষ্ঠ মাস গিয়া আষাঢ় মাস পড়িল। বর্ষার জলের সঙ্গে সঙ্গে হু হু করিয়া মশককুল দেখা দিল, ফুটা ছাদ দিয়া জল পড়িতে লাগিল রোগীর বিছানায়, এক একদিন রাত্রে বিছানা গুটাইয়া ঘরের কোণে জড়সড় হইয়া স্বামী স্ত্রীতে রাত কাটাইতে হয়।

যদুবাবুর স্ত্রী বলে—কপালে এতও ছিল?

যদুবাবু চটিয়া বলেন—তুমি ওরকম নাকে কেঁদো না বলে দিচ্ছি। কথায় বলে, পুরুষের দশ দশা। রেখেছিলাম তো কলকাতায় বাসা করে এতাবৎ কাল। জাপানীদের তো আমি ডেকে আনিনি। পড়ে গিয়েছি বিপদে, তা এখন কি করি বল। সুদিন আসে, কলকাতায় গিয়ে উঠবো আবার—তা বলে নাকে কেঁদে কি হবে?

যদুবাবুর স্ত্রী বলিল—আমার জন্যে কিছু বলিনি, তোমার জন্যেই বলি। তোমার কি এত কষ্ট করা অভ্যেস আছে কখনো? চিরকাল টুইশানি করে এসেছ, শীতকালে গরম জল করে দিইছি হাত পা ধুতে, তোমার ঠাণ্ডা সহ্যি হয় না কোনো কালে—

—আচ্ছা, থাক্ থাক্—তার জন্যে নাকে কেঁদে কি হবে? আবার হবে সব—কেবল ওই অবনীটার জ্বালায়—

কিন্তু লক্ষণ ক্রমশঃ খারাপ দেখা দিল। আষাঢ় মাস পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই যদুবাবু যেন আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। জ্বর রোজ আসে, কোনো দিন ছাড়ে, কোনো দিন ছাড়ে না।

সে দিন জগন্নাথের স্নানযাত্রা। সকালের দিকে বৃষ্টি হইয়া দুপুরের পর বৃষ্টিধৌত সুনীল আকাশে ঝলমলে সোনালী রোদ উঠিল। আতাগাছটাতে, ফুটন্ত ফুলে ভরা আকন্দগাছটাতে, বাঁশ ঝাড়ের মাথায় অদ্ভুত রংয়ের রোদ মাখানো। আতা ফুলের কুঁড়ির মৃদু সুবাস শৈশবের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

অবনীর মেয়ে টুনি বলিতেছে—মা, আমি পঞ্চমীর পালুনি করে পান্তা ভাত খেতে পারবো না কিন্তু বলে দিচ্ছি, চিঁড়ে খাবো—

যদুবাবুর মনে পড়িল, তাঁহার মা যদুবাবুর বাল্যদিনে মনসার পালুনি করিয়া পাতে যে চিঁড়ের ফলার রাখিয়া উঠিতেন, তাহা খাইবার জন্য তাঁহাদের দুই ভাইবোনে কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত। কোথায় সে বাল্যকালের মা, কোথায় বা সেই ছোট বোন মঙ্গলা! চল্লিশ বছরের ঘন কুয়াসায় তাদের মুখ মনের দর্পণে আজ অস্পষ্ট।...

তারপর কত কাল গ্রামছাড়া। ১৯০০ সালের পর আর গ্রামে এভাবে

বাস করা হয় নাই। সেই সালেই যদুবাবু এণ্ট্রান্স পাশ করেন বোয়ালমারি হাই স্কুল হইতে, দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ রামকিঙ্কর বসু ছিলেন হেড্ মাষ্টার। যেমন পাণ্ডিত্য, তেমনি বেতের বহর ছিল তাঁর। রামকিঙ্কর বোসের বেত খাইয়া অনেক ডেপুটি মুন্সেফ পয়দা হইয়া গিয়াছে সে কালে।

যদুবাবুকে বলিয়াছিলেন—যদু, তুমি বড় ফাঁকিবাজ, টেষ্ট্ পরীক্ষায় টুকে পাশ করলে, চিরকালই পরের টুকে পাশ করলে, জীবনের পরীক্ষায় যেন এরকম ফাঁকি দিও না, বড্ড ফাঁকে পড়ে যাবে।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। কি সুন্দর অপরাহ্নের নীল আকাশ। কি সুন্দর সোনার রংয়ের সূর্য্যালোক। ছোট গোয়াল-লতার ঝোপে একজোড়া বনটিয়া আসিয়া বসিল। ছেলেবেলা যদুবাবু পাখী বড ভালবাসিতেন। পদ্ম বুনো নামে তাঁদের এক পৈতৃক প্রজা ছিল, তার সঙ্গে মিশিয়া ফাঁদ পাতিয়া জলচর পক্ষী ধরিতেন, সরাল, পানকৌড়ি, বক, শামকুড়···কত কাল এসব দেখেন নাই! গানের তাল কবে কাটিয়াছিল, স্মরণ নাই। বর্ত্তমানের সঙ্গে অতীতের অনতিক্রমণীয় ব্যবধান।

যেন তাঁর নবদৃষ্টি জাগ্রত হইয়াছে এই রোগশয্যায়। টুইশানির ছুটাছুটি নাই, সারাদিন ঠেসান দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকা। কত কাল এত দীর্ঘ অবকাশ ভোগ করেন নাই। ভগবানের কথা কখনো ভাবেন নাই, আজ মনে হইল—তিনি আছেন। না থাকিলে এই সুন্দর রোদ, বনটিয়া, তাঁর মনের এই অকারণ আনন্দ, শত অভাবের মধ্যেও মায়ের স্নেহময়ী স্মৃতির বাস্তবতা কোথা হইতে আসিল? ভগবান না থাকিলে ওই অনাথা নিঃসম্বল বিধবাকে কে দেখিবে? তাঁর দিন ফুরাইয়াছে, তিনি জানেন।

জীবনে কি ফাঁকি দিয়া কাটাইলেন।

সুদীর্ঘ জীবনের বহু কথা আজ যেন মনে পড়িতেছে···গত ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসরের কর্ম্মজীবনের ইতিহাস···না, ফাঁকি কেন দিবেন? ফাঁকি দেন নাই। নারাণদা সাধুপুরুষ ছিলেন—স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন—নারাণদা বলিতেন, জীবনকে সার্থক করিতে হইলে তাকে মানুষের কোনো না কোনো কাজে, সমাজের কোনো না কোনো উপকারে লাগানো চাই।

তিনিও জীবনকে বৃথা যাইতে দেন নাই। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কত ছাত্র লেখাপড়া শিখিয়া তাঁহার হাতে মানুষ হইয়াছে। হয় নাই কি? নিশ্চয়ই হইয়াছে। সেই সব ছেলেরাই সাক্ষী আছে আজ, পরকালে মৃত্যুপারের দেশের বড় দরবারে তাহারা সে সাক্ষ্য দিবে একদিন, যদুবাবু আশা করেন।

দু একটা অন্যায় কাজ, দু একটা চুরি ঠিক বলা যায় না, চুরি নয়, তবে হাঁ, একটু আধটু খারাপ কাজ যে না করিয়াছেন, এমন নয়। তিনি তাহা স্বীকারই করিতেছেন। ভগবান্ গরীব মানুষের অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

বেলা গেল।···

গিরগিটিটা নারিকেলগাছের গুঁড়িতে ঠায় বসিয়া আছে।···

ভগবান্ দয়াময়, গরীবের অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

যদুবাবুর স্ত্রী একবাটি বার্লি লইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল—নেবু দিয়ে বার্লি দেবো, না মিছরী দেবো? পরে থামিয়া বলিল—আজ গুণে দেখলাম, এগারোখানা আমসত্ত্ব হয়েছে, বুঝলে? কলকাতার বাসায় নিয়ে যাবো হাঙ্গামা মিটে গেলে। তুমি দুধ দিয়ে খেতে ভালবাসো বলে আমসত্ত্ব দিলাম মরেকুটে—সেরে ওঠো তুমি।

স্ত্রীকে হঠাৎ বিস্মিত করিয়া দিয়া তিনি তাহাকে পুরানো আমলের আদরের সুরে অনেকদিন পরে বলিলেন—বিছানায় এসে কাছে একটুখানি বোসো না!···এসো···

ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুল দিন পাঁচ ছয় খুলিয়াছে। দুই তিন জন ব্যতীত অন্য সব শিক্ষক আসিয়াছেন। আসেন নাই কেবল জ্যোতির্ব্বিনোদ আর শ্রীশবাবু। তাঁহারা দেশের স্কুলে চাকরী পাইয়াছেন। ছেলেরাও বেশি নাই, এ ক্লাসে পাঁচ জন ও ক্লাসে দশ জন। অনেকে বলিতেছে—স্কুল টিকিবে না।

আর আসেন নাই যদুবাবু। সাহেবের সার্কুলার-বই লইয়া কেবলরাম ক্লাসে ক্লাসে ফিরিতেছে—স্কুলের সুযোগ্য প্রবীণ শিক্ষক যদুগোপাল মুখুয্যের

পরলোকগমনে স্কুল দুই দিন বন্ধ রহিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয় একাদিক্রমে ঊনিশ বৎসর এই স্কুলে শিক্ষকতা করিয়া ছাত্র ও শিক্ষক সকলেরই শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে স্কুলের যে অপরিসীম ক্ষতি হইল…ইত্যাদি ইত্যাদি।

সমাপ্ত